এই গ্রহের ক্রন্দন

দীপক চৌধুরী

এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা-১২

প্রকাশক : শ্রীসুপ্রিয় সরকার
এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ : অগ্রহায়ণ, ১৩৬৪

ছয় টাকা

প্রচ্ছদ : শ্রীপূর্ণেন্দু পত্রী
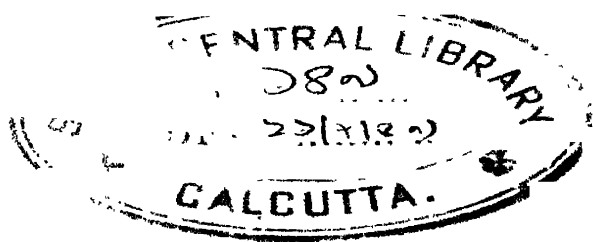
মুদ্রক : শ্রীগোপালচন্দ্র রায়
নাভানা প্রিন্টিং ওআর্কস প্রাইভেট লিমিটেড
৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা ১৩

পেড্রো আর স্টেলা
দু'জনকেই-

লেখকের অন্যান্য উপন্যাস

শঙ্খবিষ

কুমারী কন্যা

ঝড় এলো

এই উপন্যাসের প্রতিটি চরিত্র ও ঘটনা কাল্পনিক

"Why is there Something
rather than Nothing?"

—Encounter with Nothingness

॥ প্রথম রাত্রি ॥
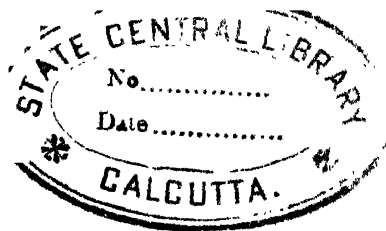
"রত্না, আজই কার্শিয়ংয়ের নতুন বাড়িতে এসে উঠলুম। কোন কিছুই গোছানো হয় নি। শোবার ঘরটা কোন রকমে সাজিয়ে নিয়েছি। নিশীথ আগেই আমায় খবর দিয়েছিল যে, পাঁচ হাজার ফুট উঁচুতে বাড়িটা কেনা হয়েছে ব'লে কোন জিনিসই ছুটে গিয়ে চট ক'রে সংগ্রহ ক'রে আনা যাবে না। সংসারের জন্যে কি কি জিনিস দরকার কাল একটা তার লিস্ট তৈরি করা হবে। আজকের মত আমি নিশ্চিন্ত। জগতের যাবতীয় আঘাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে দেহটাকে এবার আমি সুরক্ষিত ক'রে রাখলুম।...

শয়ন-কামরার জানলা-দরজা সব বন্ধ।

আমি অসুস্থ। অসুস্থ না হ'লে জীবনের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমার সন্দেহ জাগত। কেবল বেঁচে থাকবার দিক থেকে বিচার করলে, দেহটার মত নিশ্চিত-বাস্তব আমার অনুভব-রাজ্যে আর কিছু ধরা পড়ে নি। মানুষের দেহটা যখন মরে, বুদ্ধিও মরে সেই সঙ্গে। এইটুকু জানবার স্বাধীনতা ধ'রে রাখতে গিয়ে আমার জীবনের বিশটা বছর গ'লে গেল অতি নিঃশব্দে। কুমারী জয়া বসু তার আবদ্ধ শয়ন-কামরার বাইরে জগৎটাকে দাঁড় করিয়ে রেখেছিল কেন জানিস? আজ আমার স্বীকার করতে লজ্জা নেই যে, আমি চেয়েছিলুম আমার ব্যক্তিত্বের মুক্তি। গলা-মোমের মত আমার ব্যক্তিত্বকে মিশে যেতে দিই নি বাইরের জগৎ-সত্তায়। আমার নিজের জীবনের অস্তিত্ব কেবল আমারই কাজে লাগাতে চেয়েছিলুম। ভাই রত্না, তুই টের পেয়েছিলি কি না জানি না, আমি কোন দিনই প্রামাণিক জীবনযাপনের বাইরে সত্য আবিষ্কারের চেষ্টা করি নি—অথেনটিক লিভিং ছিল আমার জীবনজিজ্ঞাসার শুরু ও শেষ। কিন্তু···কিন্তু কি যেন হয়ে গেল!

রাত এখন ক'টা হবে? বোধ হয় ছুটোর কম নয়। কার্শিয়ংয়ের নতুন বাড়িতে এই আমার প্রথম রাত্রি।

পাঁচ হাজার ফুট উচ্চতায় পাহাড়টা যেন শিবের মত ধ্যানমগ্ন হয়ে আছে। রাত এখন অনেক। কোন পার্বতীরই নূপুর-নিক্বণ শোনা যাচ্ছে না। বাঙালী পার্বতীর পক্ষে এত উঁচুতে উঠে নৃত্য করা সম্ভব নয়। কলকাতার নিউ এম্পায়ারের পাদপ্রদীপের সামনে শীততাপ-নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে যা টিকিট কেটে দেখা যায় তা কেউ পাঁচ হাজার ফুট উঁচুতে বিনা টিকিটেও দেখতে চাইবে না।

আমার বাড়িটা সেণ্ট মেরী পাহাড়ের নৃত্য-গীতবর্জিত ব্রতচারিণীদের তপস্যার মন্দির-সংলগ্ন চার কাঠা জমির ওপর অবস্থিত। একটু আগেই কাচের জানলার ফাঁক দিয়ে সেণ্ট মেরী পাহাড়টাকে দেখবার চেষ্টা করেছিলুম। কলকাতার ক্রোড়ে যারা আজীবন লালিত পালিত, তাদের চোখে কার্শিয়ং কেবল হাওয়া-পরিবর্তনের পাহাড় ছাড়া আর কিছু নয়। আমি কিন্তু জানলার ফাঁক দিয়ে দেখে এলুম, কালো-কাপড়-পরা সেণ্ট মেরী ধ্যানমগ্না—প্রশান্ত এই পুণ্যপ্রহরটুকু আমি তাই নিজের কাছে ধ'রে রাখলুম। হৃদয়ের ধ্যানমন্থন অনুভব-অমৃতের রঙ ছাড়া শিল্পের সত্যরূপ প্রকাশ করা যায় কি? বিন্দু পরিমাণ অমৃতের খোঁজ করতে গিয়ে সারা জীবনটাই তো আমার ভেসে গিয়েছিল হলাহলের মহাসমুদ্রে! কলকাতা থেকে কাল যখন কাউকে না জানিয়ে পালিয়ে এলুম, তখন কি মনে ক'রে একবার আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলুম। নীলকণ্ঠের কথা স্মরণ ক'রে তাঁর পায়ে মাথা নত করতে গিয়ে দেখলুম যে, আমার সমস্ত জীবনের বিষ এসে ছড়িয়ে পড়েছে সারা অস্তিত্বের ওপর। নিশীথ পাশের ঘরে হোল্ডঅল বাঁধছিল। দু ঘরের মাঝখানের দরজাটা বন্ধ করবার সময় মনে হ'ল, নিশীথের গলার ত্বকটা আর সাদা নেই, সবটাই নীল। নিশীথ কেবল সুপুরুষ নয়, শক্তপুরুষও বটে। নিশীথ আমার ভৃত্য। ভৃত্য ব'লেই ওকে

আমি কলকাতার সাতাশ নম্বর ওয়ার্ডে ফেলে আসতে পারলুম না। আদমের পাপ যদি মানবজাতির স্বাভাবিক পাপ হয়, তা হ'লে নিশীথের পাপ আমি মাথায় ক'রে তুলে নিয়ে এলুম কার্শিয়ংয়ের পাহাড়ে। ওকে তোরা ক্ষমা করিস।

রাত এখন অনেক। চোখের সামনে ঘড়ি নেই। সময়ের হিসেব রাখবার প্রয়োজন আমার ফুরিয়েছে। কলেজের চাকরি ছেড়ে দিয়েই আমি চলে এলুম। প্রায় দশ বছর তো কলেজে লজিক আর দর্শনশাস্ত্র পড়িয়ে এলুম—আর কেন? ঘড়ি মিলিয়ে কলেজে গেছি। কেউ কোনদিনও অনুযোগ করতে পারে নি যে, আমি দশ বছরের মধ্যে দশটা মিনিটও চুরি করেছি। ঘণ্টা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্লাশে গিয়ে ঢুকতুম বলে তুই নিজেই তো আমার পাঙ্কচুয়ালিটিকে মনেপ্রাণে অবজ্ঞা করতিস! তখন তুই আমার ছাত্রী ছিলি ভাবতে গিয়ে বুকের তলার বালিশটা সহসা পেরেকের মত ছুঁচলো হয়ে উঠল। বোধ হচ্ছে, পেরেকটা যেন অত্যন্ত চেনা। মধ্যপ্রাচ্যের কোন্ এক বধ্যভূমি থেকে প্রায় হাজার দুই বছর আগের সেই পুরনো পেরেকটাই লম্বা হয়ে আমার বুক পর্যন্ত এগিয়ে এসেছে। সর্বকালের মানবভাগ্য আজও দেখলুম পেরেকের মুখে নিষ্ঠুরতার রক্তে বিন্দুমাত্র ম্লান হয় নি। আমার গায়েও পেরেকের খোঁচা লাগছে। তা লাগুক। রক্ষণশীল ত্বকটাকে কলকাতার জন্তুগুলো স্পর্শ করতে পারে নি বলে ছুঁচলো বালিশের মুখে বুকটাকে ঠেকিয়ে রাখতে ভালই লাগছে। রক্ষণশীলতার মূল্য না দিলে কিছুই হয়তো রক্ষা করতে পারতুম না। রোদে-পোড়া ছেঁড়া কলা-পাতার মত বুকের ত্বক আমার কেবল তামাটে হয় নি। ছিঁড়েও গেছে।......

সেণ্ট মেরী পাহাড়ের পশ্চিম দিক থেকে মোরগ ডাকার শব্দ পাচ্ছি। নতুন প্রহর শুরু হ'ল। যে মোরগটার গলা থেকে নতুন প্রহরের ঘোষণা আমি শুনতে পাচ্ছি, কে জানে কাল সকালেই হয়তো

নিশীথ গিয়ে বাজার থেকে তাকে কিনে নিয়ে আসবে। বাবুর্চিখানার বড় ডেকচিতে মুরগীটাকে সেদ্ধ করবে নিশীথ। নিশীথ—নিশীথ—"

শেষের নামটা জয়া বসু চিঠিতে লিখতে পারলেন না। থেমে থেমে আরও বার তিনেক নাম ধ'রে ডাকলেন তিনি। প্রথম ডাকের পরে গলার শক্তি তাঁর শিথিল হয়ে আসতে লাগল। হাতের কলমটা প'ড়ে রইল আলগাভাবে আঙুলের মাঝখানে। দেহটা কেমন অবশ হয়ে গেছে, মুখটা নেতিয়ে পড়ল চিঠির ওপর। রয়েল ব্লু কালি দিয়ে লেখা অক্ষরগুলোর সঙ্গে লাল রঙের সংমিশ্রণ ঘটল। মুখ দিয়ে রক্ত পড়েছে দু ফোঁটা। জয়া বসু জ্ঞান হারিয়েছেন।

দুখানা পাশাপাশি ঘর পার হ'লেই একটু ফাঁকা জায়গা—করিডোর। তারই ঈষৎ পুবদিকে যে-ঘরখানা আছে সেটা নিশীথের। নিশীথকে নিজের শয়ন-কামরা থেকে একটু দূরে সরিয়ে রাখবার ব্যবস্থা করেছেন জয়া বসু নিজেই।

কি কারণে নিশীথ আজ এত রাত অবধি জেগে ব'সে ছিল তা সে জানে না। চিঠি লেখবার প্রয়োজন নিশীথের নেই, থাকলেও সে লিখতে পারত না। নিশীথ লিখতে পড়তে জানে না।

সে নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে এল। জয়াদির গলার আওয়াজ সে শুনতে পেয়েছে। নিরক্ষর নিশীথের বিদ্যা নেই বটে, কিন্তু কান আছে। জয়াদির ডাক সে শুনতে পেয়েছে। করিডোরের ফাঁকা আয়তনের মধ্যে এসে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল জয়া বসুর প্রিয়তম ভৃত্য শ্রীনিশীথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রায় আট-ন' বছর ধ'রে সে চাকরি করছে। মাঝরাত্রে জয়াদিদির ঘরে সে কোনদিনই যায় নি। দরজায় খিল লাগাতে ভুল করেন নি তিনি। কলকাতার লেক প্লেসের ফ্ল্যাটে তিন-চারটে মানুষকে নিয়ে কত বড় ইতিহাসই না রচিত হয়েছে, কিন্তু মাঝরাত্রে সে কখনও তাঁর শয়ন-কামরায় ঢুকতে পারে নি।

ঢোকবার সুযোগ ওর এসেছিল। এক দিন নয়, অনেক দিন। তখন সবেমাত্র ও চাকরি নিয়ে এসেছে। লেক প্লেসের ফ্ল্যাটে সে কোন কোন দিন মাঝরাতে হঠাৎ ঘুম থেকে উঠে পড়ত। মনে হ'ত, জয়াদিদি ওকে ডাকছেন। তাঁর ঘরের বাঁ দিকে একটু আড়াল মত জায়গা ছিল। নিশীথ ঘুমের চোখে এসে দাঁড়াত সে জায়গাটায়। খোলা জানলার ফাঁক দিয়ে সে দেখত, জয়াদি অস্থিরভাবে পায়চারি করছেন। লম্বা আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়ে মাথার চুলগুলোকে টেনে টেনে খুলে ফেলছেন, না ছিঁড়ে ফেলবার চেষ্টা করছেন, নিশীথ তা কয়েক বছর পর্যন্ত সঠিকভাবে বুঝতে পারে নি। আজ সে অনেক কথাই বুঝতে পারে। বুঝতে পারে ব'লেই জয়াদির কাজে সে আজও ইস্তফা দেয় নি।

আজ আবার সে এসে দাঁড়াল ফাঁকা জায়গাটায়। কাচের জানলাটা বন্ধ ব'লে এখানে সে কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না। ভেতরের আলো থেকে নিশীথ অনুমান করল, জয়াদিদি জেগে রয়েছেন। কি কষ্ট তাঁর? কেন কষ্ট? নিশীথ বুঝতে পেরেছে যে, জয়াদিদির দেহ এবং মনের মধ্যে কষ্টের নুড়িগুলো আজ বোধ হয় পাহাড়ের মত উঁচু হয়ে উঠেছে। সে নিজে পাহাড়টাকে ভেঙে দিতে পারে না—পারে না তাঁর কষ্টের ছোট্ট নুড়িটাকেও টান মেরে ফেলে দিতে। কি মনে ক'রে নিশীথ করিডোরের দক্ষিণ দিকের জানলাটা খুলে দিল।

ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে। কার্শিয়ং পাহাড়ের কোথাও কোনও শব্দ নেই। জানলা থেকে হাত পাঁচেক দূরে একটা বিলিতী ঝাউগাছ আছে। গাছের পাতা থেকে টুপটুপ ক'রে জল পড়ছে—ফোঁটা ফোঁটা হিম।

হঠাৎ একটা গোঙানির আওয়াজ এল নিশীথের কানে। আওয়াজটা যেন পাহাড়ের দিক থেকেই উঠেছে ব'লে মনে হ'ল ওর। আওয়াজটার মধ্যে একটা কান্নার সূক্ষ্ম সুর ছিল। মিহি রেশমী সুতোর মত সেই সুরটা যেন পাহাড়ের অন্ধকার-অবয়বের ওপর দিয়ে পিছলে প'ড়ে

গেল নীচের দিকে। নিশীথ খোলা জানলার ওপর দিয়ে ঝুঁকে দাঁড়াল। মাথাটা নীচু ক'রে ঝাউ গাছের তলায় দৃষ্টি ফেলে দাঁড়িয়ে রইল দু-এক মিনিট। না, সেখানে কোন সুর নেই। হিম পড়ার শব্দ আছে।

নিশীথ দ্বিতীয়বার গোঙানির আওয়াজ শুনতে পেল। এবার আর ওর দিক্‌নির্ণয়ে ভুল হ'ল না। জয়াদির ঘর থেকেই আওয়াজটা আসছে। সে এসে দাঁড়াল দরজার বাইরে। কাচের দরজা। বাইরে থেকে কিছুই দেখা যায় না। কাচের ওপর চোখ রেখে সে দেখবার চেষ্টা করল বার কয়েক। কি করবে নিশীথ? মধ্যরাত্রে জয়াদির ঘরে ঢুকবে কি ক'রে? ভেতর থেকে দরজা নিশ্চয়ই বন্ধ আছে। বন্ধ আছে কি না পরীক্ষা করতে গিয়ে দরজাটা একটু ফাঁক হয়ে গেল। নিশীথ দেখলে, জয়াদির মাথাটা মচকানো ডালের মত নুয়ে পড়েছে চিঠির ওপর। ঘাড়টা ধনুকের মত বাঁকানো। ঘাড়ের নীচে থেকে গোটা দেহটাই তাঁর বড্ড এলোমেলো। এমন খোলাখুলিভাবে জয়াদিকে নিশীথ কখনও দেখে নি। ফাঁক-করা দরজাটা সে সহসা বাইরে থেকে বন্ধ ক'রে দিল। পশমের পুলওভারের তলায় হাত চালিয়ে দিয়ে নিশীথ বুঝতে পারলে, কোথায় কি যেন একটা নড়চড় হয়ে গেছে।

নড়চড় হ'ত না নিশীথ যদি সঠিকভাবে জানতে পারত, জয়া বসুর দেহটা মৃতদেহ। বাইরে দাঁড়িয়ে সে মনের বাঁধন শক্ত করতে লাগল। চোখের সামনে ভাসিয়ে তুলল একটা মৃতদেহ। জয়াদির দেহটাকে মৃতদেহ ভাবতে ভাবতে নিশীথ ঢুকে পড়ল ঘরে। দেহ-থেকে-স'রে-যাওয়া লেপটা টান দিয়ে তুলে নিয়ে এল জয়াদির ঘাড় অবধি। পায়ের গোড়ালিটা পর্যন্ত তাঁর লেপ দিয়ে ঢেকে দিতে ভুল করল না নিশীথ।

জয়া বসুর দেহটা মৃতদেহ নয়। নিশ্বাস বন্ধ হয় নি। নিশীথ তাড়াতাড়ি নিজের হাত দুটো জয়া বসুর গলা এবং পেটের দিকে ঢুকিয়ে দিয়ে লেপে-ঢাকা দেহটাকে চিৎ ক'রে শুইয়ে দিল। কুঁজো থেকে জল

গড়িয়ে নিয়ে সে তাঁর চোখ এবং কপালের ওপর জলের ছিটে দিতে লাগল। একটু পরে চোখ খুললেন জয়াদি।

"মূর্ছা গিয়েছিলুম, না রে নিশীথ ?"

"হ্যাঁ।" নিশীথ আলনা থেকে একটা ছোট্ট টার্কিস তোয়ালে এনে জয়া বসুর কপালের জল মুছিয়ে দিতে দিতে তোয়ালে-সুদ্ধ হাতটা নামিয়ে নিয়ে এল তাঁর ঠোঁট পর্যন্ত। তোয়ালের পেছনে দুটো আঙুল আলাদা ক'রে নিশীথ যতদূর সম্ভব আঙুলের মাংসটুকুকে মোলায়েম এবং মসৃণ করবার চেষ্টা করতে করতে বললে, "কস বেয়ে একটু রক্ত পড়েছে, দেখি, মুছিয়ে দি।"

"দে, আজ আর আমি আপত্তি করব না। নিশীথ—"

"দিদিমণি।"

"তোর বয়স কত রে ?"

"আমি যখন তোমার কাছে কাজ করতে আসি, তুমি আমার হাত দেখে বলেছিলে আটাশ।"

"না, ভুল বলেছিলুম। আমার চেয়ে তোকে বড় করবার জন্যেই আমি ভুল হিসেব করেছিলুম। তুই আমার চেয়ে বছর দুয়েকের ছোট।"

"সেই জন্যেই তো তোমায় আমি প্রথম দিন থেকেই 'দিদি' ব'লে ডাকি।"

জয়া বসু উঠে বসলেন। চিঠির দিকে চেয়ে তাঁর মনে পড়ল, রত্নাকে তিনি তাঁর আত্মজীবনী লিখছিলেন। আজ রাত থেকেই তিনি লিখতে শুরু করেছেন। আত্মজীবনী লেখবার প্রথম রাতটাতে তাঁর মূর্ছা যাওয়া উচিত হয় নি। রয়েল ব্লু কালির সঙ্গে বুকের রক্ত মিশে সাদা কাগজটার ওপর একটা ছবি ফুটে বেরিয়েছে। কার ছবি এটা ? সীমা-বদ্ধ পৃথিবীর মধ্যে যেন লাঞ্ছিত মানুষের মিছিল চলেছে, লোকারণ্য, ভিড়—ভিড় আর ভিড়। একান্ন নম্বর পার্কারের মুখে রয়েল ব্লু কালি

এঁকে এঁকে চলেছিল কতকগুলো বিকৃত অক্ষর। ভিড়ের কাছ থেকে সহানুভূতি আদায় করবার স্বার্থান্বেষী প্রতীক্ষা ছিল প্রতিটি আঁচড়ের মধ্যে। বুকের রক্ত দিয়ে এবার তিনি সত্যের আলেখ্য ফুটিয়ে তুলবেন। নিশীথের সামনে আর তাঁর লজ্জা নেই। লুকিয়ে রাখবার মত আর তাঁর কি আছে? আজ তাঁর কাছে রাত্রিটা বড় ভাল লাগছে। কুমারী-জীবনের সবচেয়ে উত্তপ্ত আকাঙ্ক্ষাটা নিশীথের দু বাহুর মধ্য দিয়ে মুক্তি পেল আজ। সেণ্ট মেরী পাহাড়ের ধ্যানমগ্ন পুণ্যপ্রহরের মধ্যে লোপ পেল জয়া বসুর দৈহিক চঞ্চলতা। ট্রেণের ভাড়া যুগিয়ে পাহাড়ের উচ্চতায় এসে না উঠলেও মানব-জীবনের উচ্চতা তিনি দেখতে পেয়েছেন। দেখিয়েছে নিশীথ, ভবতোষ নয়।

"দিদিমণি, এমন দুর্বল শরীর নিয়ে কলকাতা থেকে হঠাৎ না চ'লে এলেই পারতে। ভবতোষবাবুকে কাল একটা তার পাঠিয়ে দিই এখানে আসবার জন্যে?"

"না, নিশীথ। ভবতোষ আমাদের কেউ না।···একটু ব্র্যাণ্ডি দে তো।"

"এক পেয়ালা গরম কফি এনে দিই?"

"না। রাত্রির দুর্বলতা আমার বড্ড সাংঘাতিক রোগ। নিশীথ, তুই বোধ হয় জানিস না, গত দশ বছরের মধ্যে আমি রাত্রিবেলা ঘুমুই নি? রাত্রে আমার ঘুম আসে না রে।"

"আমি জানি। সেই জন্যে তুমি দিনের বেলা ঘুমোতে। ঘুম থেকে উঠেই এক রকম সোজা চ'লে যেতে কলেজে। তোমার সঙ্গে সঙ্গে আমিও রাত জেগেছি। অবিশ্যি, সাবিত্রীর জন্যেও আমায় রাত জাগতে হ'ত। কফি আনব?"

"না। বোতলটা এখানে নিয়ে আয়।"

ব্র্যাণ্ডি খাওয়ার পরে জয়া বসু একটু সুস্থ বোধ করলেন। নিশীথ দাঁড়িয়ে ছিল সামনেই।

"দিদিমণি, লেখাটা কি জরুরী? কাল লিখলে হয় না। আজ না হয় একটু ঘুমোবার চেষ্টা কর।"

"আর পাঁচ মিনিট আমায় সময় দে। তারপরে···আজ আমার ঘুম আসবে। প্রথম রাত্রির ঘুম আমার সমস্ত অনুভূতি ছেয়ে উড়ে আসছে কোন্ এক অজানা আকাশ থেকে। প্রতি রোমকূপে আমার ঘুমের নেশা লেগেছে। নিশীথ, যাচ্ছিস?"

"তুমি এবার ঘুমিয়ে পড়। দরজাটা খোলাই থাক্।"

"যদি চোর আসে?"—এই ব'লে জয়া বসু ঘরের উত্তর দিকে দৃষ্টি ফেললেন। একটা ষোল ইঞ্চি মাপের স্যুটকেস ছিল সেখানে। সেদিকে চেয়েই তিনি পুনরায় বলতে লাগলেন, "আমি আর বেশিদিন বাঁচব না। মরণের ডাক আমি শুনতে পেয়েছি।···কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ইত্যাদি সবই আমার ছিল। কোন কিছু কাজে লাগল না। নিশীথ—"

"দিদিমণি।"

স্যুটকেসের দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে জয়া বসু জিজ্ঞাসা করলেন, "মরণের পরে মানুষ আবার জন্মায় নাকি রে?"

"শুনেছি পাপ করলে জন্মাতে হয়।"

"আমার তবে কি হবে নিশীথ? স্যুটকেসটা কোথায় রেখে যাব? ফিরে এসে স্যুটকেসটা কি পাব?"

"গাদা গাদা বই প'ড়ে তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। আমি বরং কাল ভবতোষবাবুকে এখানে আসবার জন্যে একটা তার পাঠিয়ে দিই?"

"দিস, আমি যখন আর থাকব না। তার পেলে ভবতোষ আসবে আমি জানি। নিশীথ, একটা কথা আমার মনে পড়ল, শুনবি?"

"বল।" নিশীথ এগিয়ে এল খাটের দিকে। কার্শিয়ংয়ের প্রথম রাত্রিটা সবচেয়ে কালো নয় বটে, কিন্তু সবচেয়ে বেশি রহস্যাবৃত ব'লে মনে হ'ল ওর। দশ বছর পরে, জয়াদিদিকে যেন সে নতুন ক'রে

দেখছে। কলকাতার মানুষরা সবাই তো তাঁকে অপবাদ দিত, কুৎসা রটাত দিন-দুপুরেও। সেই জন্যেই তাঁকে কলেজের চাকরিতে ইস্তফা দিতে হয়েছে। কিন্তু নিশীথ কখনও জয়াদিকে পাপ করতে দেখে নি, মদ খেতে দেখেছে। মদ খেলে পাপ হয় ব'লে সে বিশ্বাস করে না। নিরক্ষর লোকের পক্ষে এমন বিশ্বাসটাকে এতকাল টিকিয়ে রাখা সোজা কথা নয়! জয়াদি যে পাপ করেন নি, তাও তো সত্যি নয়। নিশীথের ধারণা, উপযুক্ত সময়ে বিয়ে না করাটাই হচ্ছে আসল পাপ। কিন্তু কলকাতার সমাজ তাই বা হতে দিল কই? তাঁর বসবার ঘরে সুপুরুষের অভাব ছিল না। অভাব ছিল কেবল বীরপুরুষের। ভবতোষবাবুই বা কি? বিলেত-ফেরত শিক্ষিত লোকটা নাকি জয়াদিকে ভালবাসতেন! তারপর যে কি সব গণ্ডগোল বেধে গেল, নিশীথ তার খবর রাখে না। দেখতে জয়াদি কোনদিনই সুশ্রী ছিলেন না। কুৎসিত বললেই বরং সত্য বলা হবে। গায়ের রঙ কালোই বলা চলে। কিন্তু গায়ের রঙটাই তো মানুষের সবটুকু সৌন্দর্য নয়। তা ছাড়া সত্যিকারের ভালবাসা থাকলে কে কবে গায়ের রঙ দেখতে যায়? বিয়ে না করার জন্যে জয়াদির যদি পাপ হয়ে থাকে, তবে সে পাপের জন্যে দায়ী ভবতোষবাবু।

আরও একটু ব্র্যাণ্ডি খেয়ে জয়া বসু বললেন, "আমি আবার জন্মাতে চাই নিশীথ।"

"তা বেশ। কিন্তু এবার বাপু জন্মাবার সময় স্বামী-পুত্র সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসো। বোতলটা দাও দিকি, সরিয়ে রাখি। দুর্বল ব'লে একটু-আধটু ব্র্যাণ্ডি খাওয়া ভাল, কিন্তু বেশি খাওয়া ভাল নয়। বাড়াবাড়ি করলে আমি রত্নাদিকে কলকাতা থেকে ডেকে নিয়ে আসব।" নিশীথ ব্র্যাণ্ডির বোতলটা সরিয়ে রেখে এল আলমারিতে। জয়া বসুর হাতের গেলাসের দিকে চেয়ে সে বললে, "তাড়াতাড়ি শেষ ক'রে ফেলো। গলা দিয়ে রক্ত পড়েছে।"

"তা পড়ুক। আমি আবার জন্মাতে চাই নিশীথ। গেলাসটা এবার

ধর্। হ্যাঁ, কি যেন বলছিলাম? ও, হ্যাঁ, আমার নতুন জন্মের কথা। শোন্, পাখী হয়ে জন্মাতে গেলে কি কি পুণ্য করতে হয় রে? কি মজাই না হবে! অন্ধকার গাছের ডালে ব'সে ইচ্ছেমত আমি তাঁকে ভালবাসতে পারব। আঃ, ভালবাসা! সমাজ নেই, সংসার নেই—ভবতোষরা উঁকি দিতে আসবে না, কলেজের প্রিন্সিপ্যাল মিসেস সুজাতা রায় কৈফিয়ং চাইবেন না···বড্ড শীত করছে নিশীথ, লেপটা একটু পিঠের দিকে তুলে দে তো।"

নিঃশব্দে নিশীথ আদেশ পালন করল। পুরনো আদেশগুলোর সঙ্গে আজকের আদেশগুলো একেবারেই মিলছে না। তবু ভাল লাগছে আদেশ পালন করতে। কার্শিয়ংয়ের প্রথম রাত্রিটা ক্রমশই সুন্দর হয়ে উঠছে।

জয়া বসু নিশীথের দিকে হাত বাড়িয়ে পুনরায় বললেন, "দুশ্চিন্তার আর কারণ নেই নিশীথ, আমার মরণ ঘনিয়ে এসেছে। আর একটু ব্র্যাণ্ডি দিবি? দুর্বল বোধ করলেই ডাক্তার আমায় ব্র্যাণ্ডি খেতে বলেছেন।"

"না, মদ আর তুমি খেতে পাবে না। মদ খাওয়া তোমায় কে শেখাল দিদিমণি?"—আলোটা নিবিয়ে দেবার জন্যে সুইচের দিকে হাত বাড়িয়ে প্রশ্ন করলে নিশীথ।

"কেউ না, কেউ না। বোধ হয় ভবতোষ শিখিয়েছে।"—এই ব'লে জয়া বসু লেপের তলায় ঢুকে পড়লেন। শুয়ে পড়লেন লম্বা হয়ে।

নিশীথ আলোটা এবার নিবিয়ে দিল।

"তুই চললি নিশীথ?"—লেপের অন্ধকার থেকেই প্রশ্ন করলেন জয়া বসু।

দরজার কাছে গিয়ে নিশীথ বললে, "যাচ্ছি। অনেক রাত হয়েছে।"

"পা দুটো তোর একটু এগিয়ে নিয়ে আয় না রে।"

"কেন?"

"ধুলো নেব। তোর সৌন্দর্য তো শরীরে নেই, আছে পায়ে। তুই যে ব্রাহ্মণ।"

"আমি চাকর।"

"তুই আমার ঠাকুর।"

"তুমি আমার দিদি—জয়াদিদি।"

দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে নিশীথ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

॥ দ্বিতীয় রাত্রি ॥

"রত্না, উনিশ শো আটত্রিশ খ্রীষ্টাব্দের কথা মনে পড়ে? আমি সেবার দর্শনশাস্ত্র নিয়ে এম. এ. পাস করলুম। বছরের শেষের দিকে চাকরি পেলুম তোদের কলেজে। পরীক্ষায় সেকেণ্ড ক্লাস পাওয়ার জন্মেই সম্ভবত সরকারী কলেজে আমার চাকরি জুটল না। তুই কিন্তু সব সময়ে আমায় স্মরণ করিয়ে দিতিস যে, সরকারী কলেজে চাকরি না পাওয়ার প্রধান কারণ ছিল, আমার কুৎসিত চেহারা। তোর ধারণা ছিল যে, কলেজে মেয়েরা কেবল বই ঘাঁটতে আসে না, চেহারা দেখতেও আসে। মাইনে দিয়ে যারা কলেজে পড়তে আসে তারা কেন দাঁত-উঁচু অধ্যাপিকার মুখের দিকে চেয়ে থাকবে? প্রথম দিন থেকেই তুই আমার ক্লাসে তাই সবচেয়ে বেশি গোলমাল শুরু ক'রে দিলি। আমার রূপ নেই ব'লেই যে আমার লেকচার তোর ভাল লাগত না, তা নয়। তোর নিজের রূপ খুব বেশি ছিল ব'লেই আমাকে অপমান করতে তোর ভাল লাগত। ক্লাসে গিয়ে লেকচারটা আমি তোতাপাখির মত মুখস্থ ব'লে যেতাম, কিন্তু দৃষ্টি এবং মনোযোগ থাকত তোর ওপর। তুই কোনদিনও আমার লেকচার শুনিস নি। শোনা সম্ভব ছিল না। কারণ, তোর মন এবং মুখের মধ্যে তখন সাদনরতির তখমা পরা রয়েছে। আমার নিজের স্বাস্থ্য ভাল নয় ব'লে পেছনের বেঞ্চিতে ব'সে পঁয়তাল্লিশটা মিনিট তুই নিজের দেহটাকে নিয়ে খেলা করতিস। হাত দুটো উঁচু ক'রে কনুই দুটো ফেলে রাখতিস বেঞ্চির ওপরে। দূর থেকে স্বাস্থ্যের জয়পতাকা তোর আমি দেখতুম। গলার স্বর আমার কর্কশ হয়ে উঠত। দম-ফুরিয়ে-যাওয়া গ্রামোফোনের মত আমার লেকচারের শেষ বাক্যটি কখন যে শেষ হয়ে যেত, আমি তা টের পেতুম না। স্টাফ-রুমে তাড়াতাড়ি এসে ব'সে পড়তুম। বড্ড অসহায় বোধ করতুম। নিজের প্রতি শ্রদ্ধা হারালে আমার আর থাকবে কি?

জীবিকার প্রয়োজনে আমায় পড়াতে হয় ব'লে কেবল লেকচার দেওয়াই আমার কাজ নয়। প্যাস্টিল খেয়ে খেয়ে গলার কর্কশ আওয়াজটাকে মসৃণ করতে হ'ত ব'লে তুই আমায় শুনিয়ে শুনিয়ে গুন গুন ক'রে গান করতিস। আমি স্টাফ-রুমে ব'সে প্রায়ই শুনতে পেতুম যে, তুই গান করতে করতে করিডোর দিয়ে যাওয়া-আসা করছিস। তোর নিষ্ঠুরতা ক্রমশই অসহ্য হয়ে উঠতে লাগল। তোকে দেখলেই আমার গলা আরও বেশি কর্কশ হয়ে উঠত, বুকের স্বাস্থ্য যেন ভেঙেচুরে সমতল হয়ে যেত। স্টাফ-রুমে ব'সে কাঁদতে ইচ্ছা করত। তোকে আমি জানাতে চাইতুম যে, আমি কেবল অধ্যাপিকা নই, আমি যুবতী। আমার বয়স মাত্র বাইশ। তোর তখন কত? কুড়ি।

কুড়ি বছর বয়সেই তিনবার পরীক্ষায় তুই ফেল করেছিস। খবরটা আমি সংগ্রহ করেছিলুম প্রিন্সিপ্যাল সুজাতাদির কাছ থেকে। তোকে আক্রমণ করবার অস্ত্র খুঁজছিলাম আমি। কিন্তু সুজাতাদির কথা শুনে মনে হ'ল, তুই ফেল করেছিস ব'লে কলেজের খুব উপকার হয়েছে। পাস ক'রে বেরিয়ে গেলে কলেজের ক্ষতি হ'ত। তাঁর কাছেই আমি প্রথম শুনলুম যে, বাংলা খবরের কাগজে তোর ছবি এবং নাম বেরোয়। নাচ এবং গানে তোর নাকি দেশজোড়া নাম। কলকাতার বড়লোক বাঙালী আর মারওয়াড়ীরা পয়সা দিয়ে টিকিট কেটে তোর নাচ দেখতে যায় নিউ এম্পায়ারে। তোর আকর্ষণে কলেজে প্রতি বছরই কিছু কিছু ছাত্রীসংখ্যা বাড়ে। শিক্ষার চেয়ে তাই ছাত্রীসংখ্যার দিকে সুজাতাদিকে বেশি ক'রে নজর রাখতে হয়। নজর রাখবার জন্যেই তিনি নিউ এম্পায়ারে যান তোর নাচ দেখতে। আজ পর্যন্ত একটা সুযোগও তিনি নষ্ট করেন নি। কেন করবেন? সামনের সারিতে বসবার জন্যে তুই তাঁকে প্রতিবারই পাস এনে দিতিস। তিনি বলতেন যে, শিবের ধ্যান ভাঙাবার কি একটা বিশেষ নাচ নাকি তোর সবচেয়ে ভাল। সেই নাচটা দেখতে দেখতে তিনিও নাকি চেয়ারে ব'সে পা

দোলাতেন। অপূর্ব, অপূর্ব তোর নৃত্যশিল্প। ভোলা মহেশ্বরের ধ্যান ভেঙেছে। ভাঙিয়েছে রম্ভা। মারওয়াড়ীবাবুরা ত্রিশ টাকার আসনে ব'সে হাততালি দিচ্ছেন। বিনা টিকিটে এসে সুজাতাদিও মারওয়াড়ী-বাবুদের সঙ্গে সঙ্গে হাততালি দিলেন। ড্রপ পড়ল। প্রেক্ষাগারের চারদিকে আলো জ্ব'লে উঠল। সুজাতাদি দেখলেন, চেয়ারগুলো সব খালি প'ড়ে রইল। প্রাইভেট কলেজের আর্থিক সংকটের কথা ভেবে তাঁর নিজের মনটাও কেমন শূন্য বোধ হতে লাগল। নতমস্তকে ধীরে ধীরে তিনি প্রেক্ষাগার থেকে বেরিয়ে এলেন সবার শেষে।

রম্ভা, উনিশ শো আটত্রিশ খ্রীষ্টাব্দের ক'টা মাস আমার জীবনের সঙ্গে এমন ভাবে লেপ্টে রয়েছে যে, হাজার চেষ্টা ক'রেও সেই সময়-টুকুকে জীবন থেকে মুছে ফেলতে পারলুম না। ফেলে দিতে পারলে তোর ওপর আমি প্রতিশোধ নিতে পারতুম। প্রতিশোধ নেবার আমি চেষ্টা করেছি। তোর দৈহিক সৌন্দর্যের খোলসটাকে গলা মোমের মত গলিয়ে দিতে চেয়েছি আমার মনের প্রতিশোধ-উত্তাপ দিয়ে। কিন্তু পারি নি···

সেদিনটা আমার স্পষ্ট মনে পড়ে। কলেজের বারান্দায় দাঁড়িয়ে তুই রাস্তার দিকে চেয়ে ছিলি। অন্য কেউ সেখানে ছিল না। স্টাফ-রুমে ব'সে আমি তখন বাঁশীর সুর শুনতে পাচ্ছিলুম। দুপুরবেলা কে যেন বড্ড করুণ সুরে বাঁশী বাজাচ্ছিল। সুরটা আমায় ঘর থেকে বাইরে টেনে নিয়ে এল। করিডোরের কোণা থেকে দেখলুম, তন্ময় হয়ে তুই চেয়ে আছিস রাস্তার দিকে। ফুটপাথের ওপাশে একটি ছেলে দাঁড়িয়ে ছিল তোর দিকে চেয়ে।

তক্ষুনি চ'লে গেলুম সুজাতাদির ঘরে। তাঁকে ডেকে নিয়ে এসে বললুম, 'ওই দেখুন, ছেলেটা রাস্তায় দাঁড়িয়ে শিস দিচ্ছে। এটা প্রেক্ষাগার নয়, কলেজ। কেবল রম্ভার জন্যে শিক্ষা-মন্দিরের পবিত্রতা নষ্ট হতে পারে না। তা ছাড়া, নীতির প্রশ্নও আছে।'

সুজাতাদি তোকে ডেকে বললেন, 'আজ থেকে কেউ আর বারান্দায় দাঁড়াতে পারবে না, আমি নোটিশ টাঙিয়ে দিচ্ছি।' তুই কোন জবাব দিলি না। সুজাতাদি বোধ হয় নোটিশ লেখবার জন্যে চ'লে গেলেন তাঁর কামরার দিকে, আমিও যাবার জন্যে পা বাড়াচ্ছিলুম। তোকে আমি আঘাত করতে পারলুম ব'লে খুবই আরাম পাচ্ছিলুম মনে মনে। ভাবলুম, কলেজ থেকে যেদিন তোকে তাড়িয়ে দিতে পারব সেদিন আমার মনের জ্বালা মিটবে।

রাস্তার দিক থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে তুই আমার সঙ্গে প্রথম কথা বললি, 'আপনি আমায় অপমান করলেন।'

মনটা যেন আমার আনন্দের উত্তাপে ঘেমে উঠল। বললুম, 'জনৈকা ছাত্রীর অপমানের কথা শুনতে গেলে কলেজ চলে না। তা ছাড়া, এখানে সবাই পড়তে আসে, রাস্তার দিকে চেয়ে থাকতে আসে না।'

'আমি রাস্তার দিকে চেয়েছিলুম কি ক'রে বুঝলেন?'

'কি ক'রে বুঝলুম? যুবকটি শিস দিচ্ছিল না?'

'শুনি নি।'

'তবে এখানে কি করছিলে মাই ডিয়ার রত্না?'

'বাঁশী শুনছিলুম।'

'বাঁশী? প্লীজ, ক্লাসে যাও।'

কমনরুমের বেয়ারা কালিপদ এসে উপস্থিত হ'ল সেই সময়। সে বললে, 'প্রিন্সিপ্যাল আপনাকে একবার ডাকছেন।'

'যাচ্ছি।' আমি লক্ষ্য করলুম, কালিপদ তবু দাঁড়িয়ে রইল। কেন দাঁড়িয়ে রইল তা আমি বুঝতে পেরেই ওকে একটু কর্কশ গলায় আদেশ দিলুম, 'দাঁড়িয়ে রইলে কেন? কাজ করতে যাও।'

লজ্জা পেয়ে কালিপদ দ্রুতপায়ে করিডোরের মধ্যে মিশে গেল। তোকে আমি নরম গলায় এবার জিজ্ঞাসা করলুম, 'দুনিয়ার পুরুষমানুষেরা সব তোমার দিকে অমন ক'রে চেয়ে থাকে কেন?'

'আমি দেখতে খুব সুন্দরী, তাই।'

'রিয়েলি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, মিস বোস। ফুলভারাবনত গাছই মানুষ দেখতে চায়। প্যাঁকাটির প্রতি ওরা নজর দিতে চায় না। চোখের ধর্মই হচ্ছে সৌন্দর্য খুঁজে বেড়ানো, কানের ধর্ম যেমন সুরের পেছনে ছোটা।'

প্রতিশোধ নেবার আরামটুকু তখন আমার উবে গেছে। তোর সঙ্গে আমি কথা বলছিলাম বটে, কিন্তু আমি চেয়েছিলাম রাস্তার সেই সুন্দর ছেলেটির দিকে। আমি নিজেকে দেখাবার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করছিলাম। গলার ঘাম মুছবার অজুহাতে শাড়ির আঁচলটাকে একটু টেনে নামিয়ে দিয়েছিলাম কণ্ঠাস্থির তিন ইঞ্চি তলায়। তুই সে সব লক্ষ্য করেছিলি কি না জানি না। ছেলেটি করল না আমি দেখলুম। সে চেয়ে রইল তোর মেরুদণ্ডের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে। আমি বুঝতে পারলুম, তোর কাছে আমি হেরে যাচ্ছি। বুঝতে আমার কষ্ট হ'ল না যে, পুরুষমানুষের চোখে আমার নারীত্ব এখনও ধরা পড়ে নি। আমি জয়া বসু নই। আমি কেবল একজন অধ্যাপিকা।

বারান্দা থেকে চ'লে যাওয়ার আগে তুই আমাকে একটা উপদেশ দিয়েছিলি—মা গো, কথাটা আমি আজো ভুলি নি! কথাটা মনে পড়লে কেমন অসহায় বোধ করি। এই বয়সেও একটা জবাব দিতে ইচ্ছে করে।

রত্না, সেদিনের কথাটা তোকে দশ বছর পরে আজ আবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। কল্পনার উর্বশীর চেয়েও তোকে সুন্দরী ব'লে মনে হ'ত। অনেকের মতে তুই ছিলি শিল্পী-ভগবানের সবচেয়ে বড় শিল্প। সৃষ্টিকর্তার পক্ষপাতিত্বের জন্যে আমি নিজে কখনও শিল্পী এবং ভগবান প্রভৃতি বিষয়গুলো নিয়ে মাথা ঘামাই নি।

তোর অমন মুখখানা আগুনে পুড়ে গিয়েছিল ব'লে তুই আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলি। আমি তোকে সেদিন রক্ষা করেছিলুম। কেন

করেছিলুম জানিস? কেবল প্রমাণ করবার জন্যে যে, তোদের সৃষ্টিকর্তার হাতের চেয়ে জয়া বসুর হাত কোন অংশেও দুর্বলতর নয়। আজ তো তোর ভুরু নেই। বাঁশীর মত নাকটা আধ-পোড়া হয়ে আছে। দুধে-আলতায় মেশানো রঙের বাহার নেই, গালের চামড়া কুঁচকে রয়েছে একতাল ভেজা নেকড়ার মত। আর ঠোঁট? নিউ এম্পায়ারের পার্বতীর ঠোঁটে আজ মাছি বসতে পর্যন্ত ঘেন্না বোধ করে। তামাটে রঙের সেলোফেন কাগজের মত পাতলা দুটো চামড়া ফাঁক হয়ে রয়েছে। ঠোঁট ব'লে আর বোঝাই যায় না। চামড়ার গায়ে এক চিমটে মাংস নেই। আঁচল দিয়ে মুখটা ঢেকে না রাখলে দু পাটি দাঁতের একটি দাঁতও লুকিয়ে রাখতে পারিস না। বিগত দিনের মত প্রলুব্ধ ঠোঁটে চুম্বনের প্রতীক্ষা থাকলেও নপুংসক মাছি পর্যন্ত আজ আর আসে না খাদ্যের বুভুক্ষা নিয়ে। ঠোঁটে আজ তোর বিরাট মন্বন্তর। ও মা, আমি যে এরই মধ্যে আগুনের কাহিনী শুরু ক'রে দিয়েছি! না, সে কাহিনীতে আমি পরে ফিরে যাব। এখন আবার আমি ফিরে যাচ্ছি উনিশ শো আটত্রিশ খ্রীষ্টাব্দে, কলেজের বারান্দায়।

দেহের ওপরের অংশটাকে নাচের ছন্দে খানিকটা নাড়াচাড়া দিয়ে তুই বললি, 'দেখুন মিস বোস, জ্ঞান-সমুদ্রের তীরে হাজার হাজার নুড়ি না কুড়িয়ে, একজন নরের সন্ধান করুন।'

তোর কথা শুনে কয়েক মিনিট পর্যন্ত আমি চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলুম। উত্তেজনায় আমার দম বন্ধ হয়ে আসছিল। এত বেশি সাহস তোর এল কোত্থেকে? একটু পরেই তোকে আমি বললুম, 'জান, তোমায় আমি কলেজ থেকে তাড়িয়ে দিতে পারি?'

'সেই চেষ্টাই তো করছেন। আমাকে তাড়িয়ে দিতে পারলে আপনার খুব সুবিধে হয়।'

'আমার কি সুবিধে হয়?'

'যে শিসটা আমার প্রাপ্য ছিল, সেটা আপনি কেড়ে নিতে পারেন। একচেটিয়া বাণিজ্য করবার সনদ না পেলে আপনি কোনদিনও বাণিজ্য করতে পারবেন না।'

'রত্না—!' গলার স্বর আমার কাঁপতে লাগল।

'মিস বোস, আমি কচি খুকী নই। তিনবার ফেল করেছি। বয়স আমার কুড়ি। দোসরা ডিসেম্বর একুশে পড়ব। বছর খানেক আগে আমাদের দুজনের বিয়ে হ'লে আমি মা হতুম আপনার আগেই। মা কি ক'রে হয় তাও আমি জানি। আর এও আমি জানি যে, ওই ছেলেটার দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্যে আপনি নিজে করিডোর থেকে উঁকি দিচ্ছিলেন। কিন্তু ছেলেটা এসেছে আমাকে দেখতে, আপনাকে নয়।'

'ছি ছি, রত্না! না না, এ কিছুতেই হতে পারে না। আমাকে দেখে ছেলেটা শিস দেওয়ার সাহস পাবে না। রত্না—'

'ছেলেটা শিস দেয় নি। আপনি ভাবছেন, শিস দিলে ভাল হ'ত।'

সেদিন বাড়ি ফিরে পরের দিনের লেকচার তৈরি করবার জন্যে বই খুলে বসতে পারলুম না। চোখ ভেঙে জল আসতে লাগল। তোর কাছে হেরে যাওয়ার লজ্জা আমায় বিঁধতে লাগল প্রতি মুহূর্তে। আঘাত করতে গিয়ে প্রতিঘাত পেলুম। লজিক আর দর্শনশাস্ত্রের বই-গুলো সত্যি সত্যি রসকসহীন নুড়ির মত মনে হতে লাগল। ভবতোষ ছাড়া এ লজ্জা থেকে কেউ আমায় মুক্তি দিতে পারবে না। তুই জানতিস না যে, ভবতোষ ব'লে একটি ছেলে আমায় ভালবাসে।

এখন আমি কি করব? কলেজের বারান্দায় দাঁড়িয়ে তুই যে আমায় আঘাত করলি, তা থেকে মুক্তি পাই কি ক'রে? ভবতোষ তো বিলেতে। তার গায়ের সঙ্গে ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আমাদের ভালবাসার উত্তাপ তোকে দেখাই কি ক'রে? মিডিয়াম কিংবা মডেলের সাহায্যে তোর অহঙ্কার আমি ভাঙতে পারব না। শেষ পর্যন্ত যেন এক রকম

নিরুপায় হয়েই ভবতোষকে চিঠি লিখতে বসলুম। বড় চিঠি নয়। বড় চিঠি লেখবার উদ্দেশ্য ছিল না আমার। এমন কি, বিলেতে পাঠাবার জন্যে ডাক-বাক্সে গিয়ে চিঠিখানা ফেলবারও উৎসাহ ছিল না। সেদিন চিঠিখানা ভবতোষকে লিখেছিলুম কেবল তোকে দেখাবার জন্যে। সবটা চিঠিও তোকে দেখাতে চাই নি। একেবারে শেষের লাইনটা তোকে পড়িয়ে আমার পরাজয়ের গ্লানি দূর করব ভেবেছিলুম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাও হয় নি। সমস্তটা রাত জেগে বোধ হয় একটা লাইনই লিখেছিলুম, শেষ লাইনটা। লিখেছিলুম— ভবতোষ, তুমি আমার ভালবাসা ও চুমু নিও। ইতি তোমার জয়া।—"

এই পর্যন্ত লেখবার পরে মিস জয়া বসু মোরগ ডাকার শব্দ পেলেন। বোধ হয় গত রাত্রের মোরগটাই আজও নূতন প্রহরের ঘোষণা করছে। প্রহর ঘোষণা করা মোরগের স্বভাবধর্ম। গত রাত্রের মোরগটা যদি কাশিয়াডের বাজারে বিক্রি হয়ে গিয়েও থাকে, তাতেও প্রহর-ঘোষণায় বাধা জন্মায় নি। একজন গেল ব'লে অন্যজন তার কর্তব্য থেকে বিরত থাকবে কেন? মিস জয়া বসু কলমটা রেখে দিয়ে সোজা হয়ে উঠে বসলেন। গেলাস ধরতে হবে। সামনেই ছোট টী-পয়ের ওপর গেলাস রয়েছে। তার পাশেই রয়েছে ব্র্যাণ্ডির বোতল। কলকাতার বিলিতী ডিগ্রীওয়ালা ডাক্তারের নির্দেশমতই তিনি ব্র্যাণ্ডি খান। অনেক দিন ধ'রেই তাঁরা চিকিৎসা করছিলেন। অসুখ কিছুই ধরা যায় নি। মিস বসু তবু দুর্বল বোধ করতেন। খেতে ইচ্ছে করত না, খেলেও হজম করতে পারতেন না। একেই রোগা, তার ওপরে হজম না হ'লে শরীরে আর থাকবে কি? ডাক্তার সেন শেষ পর্যন্ত মিস বসুর শরীরে কিছু রাখবার জন্যেই অল্পমাত্রায় ব্র্যাণ্ডির ব্যবস্থা করলেন। জয়া বসু রাত্রিবেলা ঘুমোন না। এক চামচে ব্র্যাণ্ডি নিয়মিতভাবে বেশি দিন খাওয়াও যায় না, অতএব মাত্রা বাড়ল। শরীরে যখন কিছুই নেই, তখন লিভারটাকে সুস্থ রেখে লাভ কি? কলকাতায়

লেক প্লেসের ফ্ল্যাটে তিনি ডাক্তার সেনকে একদিন বলেছিলেন, "আগের চেয়ে আমি ভালই আছি। আপনাদের আবিষ্কৃত সংখ্যাতীত ভাইটামিন যা পারল না, ব্র্যাণ্ডি তা পেরেছে। লিভারটা বোধ হয় শুকিয়ে আমসির মত হয়ে গেছে—তা হোক, আমি সুস্থ বোধ করছি।"

ডাক্তার সেন স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের কথা উল্লেখ ক'রে বললেন, "বিয়ে করলে আপনার অসুখবিসুখ সব সেরে যেত। অত টাকা ভিজিট দিয়ে আমাকে আর বার-বার ক'রে ডাকতে হ'ত না।"

"আপনার ছেলেটি তো শুনেছি দিল্লীর স্বাস্থ্য-মন্ত্রী অমৃত কাউরের দপ্তরে ভাল চাকরি পেয়েছে। সেখানে সে কত টাকা মাইনে পায় ডাক্তার সেন?"

"হাজার টাকা।"

"আর কিছু উপরি পায় না?"

"বোধ হয় না।"

"পেলেও তা হিসেবের মধ্যে আসবে না। স্বাস্থ্য-মন্ত্রীর লিভারও বোধ হয় আমার চেয়ে শক্তিশালী নয়। ডাক্তার সেন, ছেলে তো আপনার বিয়ে করে নি?"

"না।"

"কত বয়স হ'ল?"

"প্রায় ত্রিশ।"

"আমার চেয়ে বছর তিন ছোট। তা হোক ছোট···আপনি আমার শ্বশুর হবেন ডাক্তার সেন?"

শশাঙ্ক সেন তাড়াতাড়ি হাতঘড়িতে সময় দেখলেন। একটু ব্যস্ত হয়েই বললেন তিনি, "এক আউন্স ব্র্যাণ্ডির সঙ্গে একটা মুরগীর ডিম মিশিয়ে নেবেন। আপনার চাকরটাকে—"

বাধা দিয়ে মিস বসু বললেন, "নিশীথ আমার চাকর নয়, ঠাকুর। কলকাতার সমাজে ওর খুব নাম।"

ডাক্তার সেন স্টেথেস্‌কোপটা গলা থেকে নামিয়ে ভাঁজ ক'রে পকেটে ঢুকিয়ে রাখলেন। মিস বস্থর বুকে কিছু নেই। এখন মুখটাকে বন্ধ করতে পারলে তিনি বেঁচে যান। আপাতত মুখ বন্ধ করবার ওষুধের নাম তাঁর মনে পড়ল না। তিনি তাই হাত বাড়িয়ে বললেন, "এবার আমি যাই। ভিজিটটা—"

"দেব, দেব। এত তাড়া কেন?"

"পেশেন্টের কাছে যেতে হবে। ডিউটি, মানে কর্তব্য কাজে অবহেলা করি কি ক'রে? আমরা ডাক্তার, আমাদের কর্তব্যই হচ্ছে চব্বিশ ঘণ্টার ধ্যান-ধারণা মিস বোস।"

"আপনার পশার খুব বেড়েছে জানি। নাওয়া-খাওয়া বন্ধ ক'রে এত ভিজিট কুড়িয়ে কি লাভ হবে ডাক্তার সেন? এমন সুন্দর লাল টুকটুকে বুর্জোয়া আঙুলগুলো দিয়ে চব্বিশ ঘণ্টাই যদি স্টেথেস্‌কোপটা নাড়াচাড়া করেন, তা হ'লে সংসারের অন্যান্য আরও দু-চারটে কর্তব্যকাজ নাড়াচাড়া করবার সময় পাবেন কখন? মানুষের কি আর কোন কর্তব্য নেই?" খাটের গায়ে হেলান দিয়ে বসলেন মিস জয়া বসু।

ডাক্তার সেন চ'লে যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন দেখে জয়া বসু বললেন, "পালাচ্ছেন কেন? ডাক্তার সেন, আপনাকে যদি শ্বশুর ব'লে ভাবি তা হ'লে আপনার আপত্তি কি? বয়স না হয় আমার আটাশ ব'লেই প্রমাণ করব? ছেলেকে ডেকে নিয়ে আসুন। স্বাস্থ্য-মন্ত্রীর দপ্তরে হাজার টাকা ছাড়া আর কিছু তো নেই। আমার এখানে টাকা আছে, আমি আছি। ছেলে যদি আসে, তা হ'লে একটা সুস্থ সংসারও থাকবে। আজ আপনি আমায় সত্যিকারের ওষুধ দিয়েছেন-- বিয়ের ওষুধ। ডাক্তার সেন, বত্রিশটা টাকা ভিজিট দিয়ে আপনাকে আর অপমান করতে চাই নে। আমাকে আপনি নিন, মানে ছেলের বউ ক'রে ঘরে তুলে নিন। ও কি, কিছুই না নিয়ে চ'লে যাচ্ছেন যে?"

"আজ আর ভিজিট নেব না। স্টেথেস্‌কোপটা আপনার গায়ে লাগাই নি, ভিজিট নেব কেন ?"

"স্টেথেস্‌কোপ ?"—একটু হেসে মিস জয়া বসু জিজ্ঞাসা করলেন, "কোথায় লাগাবেন ? চ'লে যাচ্ছেন ?"

"হ্যাঁ।"

"প্রস্তাবটা আপনার পছন্দ হ'ল না, না ?"

"না।"

"দেখুন, প্রস্তাবটা কিন্তু আমার দর্শন-পড়া মাথা থেকে আসে নি, এসেছে এক যুবতী নারীর স্বভাবের সত্য থেকে। ডাক্তার সেন, চ'লে যাওয়ার জন্যে আপনি ছটফট করছেন, ভিজিটটা নিয়ে যান।"—মিস জয়া বসু বিছানার তলা থেকে বত্রিশটা টাকা বার ক'রে শশাঙ্ক সেনের হাতে দিয়ে বললেন, "গত এক বছর থেকে আপনার নির্দেশিত কোন ওষুধই আমি খাই নি।"

"বলেন কি ! ওষুধগুলো তবে গেল কোথায় ?"

"বেড-প্যানে গেল।"—জবাব দিলেন মিস বসু।

বিলিতী কায়দায় ঘাড়ের মাংস তুলিয়ে নিয়ে ডাক্তার সেন বললেন, "নিজের সর্বনাশ নিজেই করেছেন।"

লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লেন জয়া বসু। শুয়ে প'ড়ে বললেন, "আমার ভয় কি, ডাক্তার সেন ? আমি এবার থেকে নিশীথের ওষুধ খাব।"

হাবা লোকের মত গলার স্বরে জড়তা মিশিয়ে শশাঙ্ক সেন জিজ্ঞাসা করলেন, "নিশীথ ? মানে আপনার চাকর নিশীথ ?"

"আমার ঠাকুর নিশীথ।"—জয়া বসু একটু ঝুঁকে ব'সে বলতে লাগলেন, "নিশীথ যে কতবড় ডাক্তার আমি তা আগে বুঝি নি। গৌরী-শঙ্করের চেয়েও উঁচু শঙ্কর নিশীথ। ডাক্তার সেন, আপনি কি রামা-নুজের নাম শুনেছেন ?"

"আজ্ঞে না, আমার মাদ্রাজী পেশেণ্ট নেই।"

"সেণ্ট অগাস্টিনের কনফেশন পড়েছেন ?"

"আপনি কি আমায় পরীক্ষা ক'রে দেখছেন যে, আমি কতটা লেখাপড়া করেছি ? তা যদি হয়, তবে বলব, আমি কোন উপন্যাস পড়ি নি। সময় পেলুম কই ?"

"তা হ'লে নিশীথকে আপনার প্রতিদিনই একবার এসে দেখে যাওয়া উচিত। দেখা উচিত যে, সাবিত্রীর টি. বি. রোগ সে সারিয়ে দিয়েছে। এক্স-রে প্লেটে ওর প্যাচ কিংবা স্পট নেই।"

"বলেন কি ! কি ক'রে আরোগ্য করল ? তুকতাক জানে নাকি ?"

"তা তো বলতে পারব না। ভাল ক'রে তুলেছে সে কথা সত্যি।"

"তা হ'লে আমার ওসুধগুলো বেড-প্যানে ফেলে দিয়ে ভালই করেছেন।"—ডাক্তার সেনের কণ্ঠস্বরে হতাশার ধ্বনি।

জয়া বসু বিছানায় ব'সেই বললেন, "সব চেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপারটাই আপনাকে বলা হয় নি।"

"এর পরে আরও আশ্চর্যের ব্যাপার আছে নাকি ? যাক, সবগুলো পেশেণ্টই আমার গোল্লায় যাক। আপনি বলুন, আর তো আমায় এখানে আসতে হবে না, সবগুলো আশ্চর্য ব্যাপার আমি শুনে যেতে চাই। নিশীথকে ডাকুন না একবার, দেখি।"

"দেখে কিছু বুঝতে পারবেন না। দশ বছর ধ'রে তো আমিও দেখছিলুম, কিন্তু কি হ'ল ?"

"কি হ'ল"—পালটা প্রশ্ন করলেন ডাক্তার সেন, "মানে, আশ্চর্য ব্যাপারটার কি হ'ল ?"

"নিশীথ যে এত বড় একজন ডাক্তার তা সে নিজে জানে না।—" এই ব'লে জয়া বসু বিছানা থেকে নেমে এলেন। ডাক্তার সেন একটু ব্যস্তভাবে হাত বাড়ালেন জয়া বসুর দিকে। ধ'রে ফেলবার আগেই তিনি বললেন, "উঠছেন কেন ? আপনি অসুস্থ। না না, নিশীথ যত বড় ডাক্তারই হোক···আপনার অবস্থা খুবই খারাপ।"

মিস জয়া বসু তবু বিছানা থেকে উঠে পড়লেন। হাঁটতে হাঁটতে চ'লে এলেন ভেতর দিকের জানলার কাছে। এ জানলা থেকে জয়া বসুর ভেতরের অন্য দুখানা ঘর দেখা যায়। জানলার পর্দাটা হাত দিয়ে সরিয়ে দিয়ে তিনি চেয়ে রইলেন বাইরের দিকে। ডাক্তার সেনের বিস্ময় বাড়ছে প্রতি পলে পলে। তিনি এসে দাঁড়ালেন জয়া বসুর পাশে। জিজ্ঞাসা করলেন, "কি দেখছেন, মিস বোস ?"

"নিশীথকে। আপনি কি দেখলেন ডাক্তার সেন ?"

জয়া বসুর মাথার ওপর দিয়ে শশাঙ্ক সেন তাঁর নিজের মাথাটা ঝুঁকিয়ে দিয়ে বললেন, "হ্যাঁ, ওই তো নিশীথকে দেখতে পাচ্ছি।"

"কেবল নিশীথকেই দেখতে পাচ্ছেন ? আর কিছু নয় ?"

"হ্যাঁ, মানে আপনি আর কি দেখছেন মিস বোস? মানে, নিশীথ এবং সাবিত্রীকে ছাড়া আপনি আরও কিছু দেখছেন নাকি ?"

"হ্যাঁ। ডাক্তার সাহেব, আমার সারা জীবনের বিশ্বাস নিশীথ ভুল প্রমাণ ক'রে দিয়েছে। বোধ হয় দিয়েছে।" কথাটা শেষ ক'রে জয়া বসু চোখের জল ফেলতে শুরু করলেন। পরিতাপের আর অন্ত নেই। ডাক্তার সেনের মনটাও ভিজে এল। কিন্তু তিনিই বা কি করবেন? এক চামচে ব্রাণ্ডির বদলে অধ্যাপিকা এক গেলাস ক'রে ব্রাণ্ডি খেতে লাগলেন। এখন তাঁর পচা লিভার কেমন ক'রে আরোগ্য করবেন তিনি ? বিয়ের সম্ভাবনা থাকলেও স্বাস্থ্য ফেরবার সম্ভাবনা থাকত, কিন্তু সে কথা বলতে গেলেও, অধ্যাপিকা এক্ষুনি তাঁর ছেলের বউ হতে চাইবেন।

ডাক্তার সেন সহানুভূতির সুরে অনুরোধ করলেন, "কাঁদলে আরও বেশি দুর্বল বোধ করবেন। চলুন, শুয়ে পড়বেন।"

জয়া বসু নিজেই এবার ডাক্তার সেনের হাতটা টেনে নিলেন নিজের হাতের মধ্যে। দুর্বল পায়ের ওপর নির্ভর ক'রে বিছানা পর্যন্ত যেতে পারতেন না তিনি। মেঝের মাঝামাঝি জায়গায় এসে জয়া বসু সহসা

থেমে গেলেন। ভেজা চোখ দুটো ডাক্তার সেনের দিকে তুলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "আচ্ছা, আমার চোখ দুটোও কি সুন্দর নয়?"

"ভগবানের নামে শপথ ক'রে বলতে পারি, এমন সুন্দর চোখ আমার নিজের স্ত্রীরও ছিল না।"

ডাক্তার সেনের হাত দিয়ে নিজের চোখের জল মুছতে মুছতে জয়া বসু বললেন, "তবুও আমার বিয়ে হ'ল না!"

"সাহস ক'রে বিয়ের অনুষ্ঠানটা শেষ ক'রে ফেলুন না মিস বোস?"

"ও মা, সে কি, তার যে বিয়ে হয়ে গেছে!"

"কার?"

"ভবতোষের।"

নিঃশব্দে ডাক্তার সেন বাকি পথটুকু জয়া বসুকে ধ'রে এনে বিছানার ওপর শুইয়ে দিলেন। নিঃশব্দেই তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন। অধ্যাপিকা ডাকলেন, "শুনুন।"

"আবার কি হ'ল?"

"সাবিত্রীর এক্স-রে প্লেটটা একটু দেখবেন? ডাক্তার চ্যাটার্জি বলেছেন যে, ওতে কোন স্পট কিংবা প্যাচ নেই। আপনি না বললে যেন আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। দেখবেন?"

"দেখব।"

"ওই সুটকেসটা দয়া ক'রে আমার কাছে নিয়ে আসুন।"

ডাক্তার সেন সুটকেসটা নিয়ে এলেন জয়া বসুর কাছে। এনে বললেন, "বড্ড ধুলো জমেছে। নিশীথ কি ঘরদোর ঝাঁট দেয় না? রোগীর ঘর ঠাকুর-ঘরের চেয়েও পরিষ্কার থাকা উচিত।"

"নিশীথ এযাবৎকাল আমার ঘরের ধুলোই সাফ করছিল, এবার থেকে সে সাফ করছে আমার মনের ধুলো। ডাক্তার সেন, আমার আর সাবিত্রীর দুটো এক্স-রে প্লেটই এতে আছে। চেম্বারে গিয়ে দুটো প্লেটই ভাল ক'রে দেখবেন। ডাক্তার চ্যাটার্জি বলেন যে, সাবিত্রীর টি. বি.

একেবারে সেরে গেছে। আপনি না বললে আমার বিশ্বাস হয় না।”

কি মনে ক'রে ডাক্তার শশাঙ্ক সেন জিজ্ঞাসা করলেন, “ছুটো প্লেট অদলবদল হয় নি তো?”

“হওয়া সম্ভব—খুবই সম্ভব। কাল একটা ওর নতুন প্লেট নিন। আপনি এই গোটা সুটকেসটাই নিয়ে যান, ডাক্তার সেন।” এই ব'লে মিস জয়া সুটকেসের ডালাটা খুলে ফেললেন। ডাক্তার সেন সহসা সাপ দেখার মত চমকে গিয়ে পেছন দিকে স'রে গেলেন ছু পা। স'রে এলেন ঘর থেকে। তরতর ক'রে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলেন রাস্তায়। লেক প্লেসের রাস্তা থেকে বেরিয়ে যেতে তাঁর ছ মিনিটও লাগল না।

কার্শিয়ংয়ে আজ তাঁর দ্বিতীয় রাত্রি কাটছে। চিঠি লেখা বন্ধ করে জয়া বসু বিশ্রাম করছিলেন। অবসাদের মেঘ তাঁর মনের আকাশকে ছেয়ে ফেলেছে। এ কেবল অসুস্থ শরীরের অবসাদ নয়। মৃত্যুর শূন্যতায় মিশে যাওয়ার অবসাদ। জীবনের শেষ রাত্রিটা দেখতে পাচ্ছেন ব'লেই কার্শিয়ংয়ের প্রতিটি রাত্রি যেন তিনি হিসেব ক'রে খরচ করছেন। দীর্ঘ দিন পথ চলার পর জয়া বসু আজ তাঁর গন্তব্যের সন্নিকটে এসে পৌঁছেছেন। খানিকটা নিশ্চিন্ত বোধ করার পরে তিনি হাত ছুটো ছড়িয়ে দিলেন ছু দিকে। বিছানার ছু দিকেও সীমাহীন শূন্যতা! আজ যদি ভবতোষ এসে দাঁড়ায় এখানে, তবুও দেয়াল আর বিছানার মাঝখানের শূন্যতা কিছুতেই ভরাট হবে না।

বাইরে থেকে নিশীথ ডাকল, “দিদিমণি—”

“নিশীথ? আয়, ভেতরে আয়।”—জয়া বসু সোজা হয়ে উঠে বসলেন।

নিশীথ ভেতরে এসে বললে, “রাত প্রায় শেষ হয়ে এল, কখন ঘুমবে?”

"ঘুম যে আসে না।"

"একবার চেষ্টা ক'রে দেখ না।"

"নাঃ, ঘুম আমার আসবে না। ভবতোষ আমার ঘুম কেড়ে নিয়েছে। তোকে তো সব কথা বলা যায় না নিশীথ।"

"তা যায় না। আর বললেও আমি শুনতুম না। কিন্তু তোমার নিজের শরীরের দিকে দৃষ্টি না দিলেই বা চলবে কি ক'রে?"

"দৃষ্টি দেওয়ার মত আমার শরীরে আছেই বা কি বল্? ওরা আমার সবই নিয়ে গেল—মান সম্মান স্বাস্থ্য এবং ভবিষ্যৎ। পচা লিভারটা কেবল প'ড়ে রইল আমার কাছে।"

নিশীথ এবার চিঠিলেখার কাগজগুলো বিছানা থেকে তুলে নিয়ে রেখে দিয়ে এল টেবিলের ওপর। ব্র্যাণ্ডির বোতলটাও সরিয়ে রাখল। বিছানার চাদরটা খাটের চারদিকে গুঁজে দিতে দিতে বললে, "এবার শুয়ে পড়, আলো নিবিয়ে দেব।"

"শুয়ে পড়ব, কিন্তু ঘুম পাড়াবে কে? ভবতোষ যদি কাছে থাকত!"

"পরের স্বামীকে নিয়ে অমন ক'রে কথা বলতে নেই, দিদিমণি।"

"ভবতোষকে আমি কোনদিনই পরের স্বামী হতে দিই নি। ভবতোষকে নিয়ে মনে মনে আমি কী-ই না কল্পনা করি! ও কি, চ'লে যাচ্ছিস? এখানে একটু ব'স্ না, কটা রাত্রি আর বাঁচব বল্! আলোটা নিবিয়ে দিলি? অকৃতজ্ঞ জানোয়ার! তোকে যে আমি এতকাল নিষ্কলঙ্ক রেখে দিলুম, তার ঋণ বুঝি তুই এমনি ক'রে চুকিয়ে দিলি? ভোগের কলঙ্ক যেন তোকে স্পর্শ করতে না পারে, সেই জন্যে তোর বিয়ে দিয়েছিলুম সাবিত্রীর সঙ্গে। গণ্ডমূর্খ জানোয়ার, দরজাটা বন্ধ ক'রে দিলি?"—এই ব'লে মিস জয়া বসু বিছানা থেকে নেমে এলেন। সুইচটা খুঁজতে গিয়ে টেবিলের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে প'ড়ে গেলেন মেঝেতে। সেই সঙ্গে ব্র্যাণ্ডির বোতলটাও প'ড়ে গেল টেবিল থেকে। শব্দ শুনে নিশীথ তাড়াতাড়ি দরজাটা খুলে ফেলল। ঘরের

মধ্যে না ঢুকেই সে জিজ্ঞাসা করল, "কি হ'ল দিদিমণি? প'ড়ে গেলে না কি?"

"হ্যাঁ। আলো জ্বালাবার দরকার নেই।"

"কেন?"

"লজ্জা পাবি।"

কথা শুনে নিশীথ অন্ধকারের মধ্যেই সুইচের কাছ থেকে হাতটা সহসা সরিয়ে নিয়ে এল। তারপর জিজ্ঞাসা করল, "উঠেছিলে কেন?"

"তোকে বলতে চেয়েছিলুম যে, সাবিত্রীর যক্ষ্মারোগ আছে জেনেই আমি ওর সঙ্গে তোর বিয়ে দিয়েছিলুম।" জয়া বসু বুঝলেন, নিশীথ চ'লে গেল। দরজাটা ভেজিয়ে দেওয়ার আওয়াজ পেলেন তিনি।

বিছানায় উঠে এলেন জয়া বসু। শুনতে পেলেন, ফোঁটা ফোঁটা ব্র্যাণ্ডি টেবিলটার কোণা থেকে টুপ টুপ ক'রে মেঝেতে পড়ছে। ঘরের বাতাসে মদের নেশা। নরক? লেপটা মাথার ওপর পর্যন্ত টেনে দিয়ে মিস জয়া বসু ঘুমবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

॥ তৃতীয় রাত্রি ॥

"আজ তিন দিন হ'ল কার্শিয়ংয়ে এসেছি। একদিনের জন্যও ডাক্তার ডাকবার দরকার হয় নি। নিশীথ তো প্রতি মুহূর্তে দরজায় পা বাড়িয়ে থাকে ছুটে গিয়ে একজন ডাক্তার ডেকে আনবার জন্যে। সে এরই মধ্যে এখানকার একজন ডাক্তারের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় ক'রে এসেছে। বিলেত ফেরৎ। টি-বি রোগে অভিজ্ঞ। স্টেশনের কাছাকাছি কোন্ এক রাস্তার পাশেই ডাক্তার প্রধানের বাড়ি। আমার যে কি ধরনের অসুখ, তার একটা বিস্তৃত ইতিহাস সে ডাক্তার প্রধানের কাছে পেশ ক'রে এসেছে। রোগের বিবরণ শোনবার পরে তিনি নাকি আমাকে দেখবার জন্যে বড্ড বেশি ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। ভিজিট ছাড়াই তিনি আমাকে একবারটি কেবল চোখে দেখে যাবার জন্যে আমার অনুমতি চেয়ে পাঠিয়েছেন। নিশীথ তাঁকে ব'লে এসেছে যে, প্রয়োজনের মুহূর্তে খবর পেলে যেন তিনি চ'লে আসতে বিলম্ব না করেন। ঘরের সামনেই নিশীথ পায়চারি করছিল। আমি ওকে ডেকে বললুম, 'হ্যাঁ রে, ডাক্তার ডাকবার জন্যে তুই এত ব্যস্ত হয়ে উঠেছিস কেন ? তেমন দরকার বুঝলে, কলকাতা থেকে ডাক্তার সেনকে ডেকে নিয়ে আসব।'

'সে তো অনেক দূরের পথ। ঘরের কাছে একজন বড় ডাক্তার থাকা ভাল দিদিমণি।'—বললে নিশীথ।

'কিন্তু এখানে এসে এ কদিনের মধ্যেই আমার স্বাস্থ্য অনেক ভাল হয়েছে। ভাবছি, কাল সকালে হাঁটতে হাঁটতে দার্জিলিং চ'লে যাব।'

'কি বললে ?'—অবাক হয়ে নিশীথ আমার মুখের দিকে এমনভাবে চেয়ে রইল যে, আমি একটা উত্তর না দিয়ে পারলুম না। বললুম, 'আমার ফুসফুসের ফুটোগুলো সব বুজে গেছে। লিভারটা একদম প'চে গ'লে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল ব'লেই তো এই তিন দিনের মধ্যে আবার

একটা নতুন লিভার গজিয়েছে। আমার সারাদেহে শক্তির তুফান উঠেছে নিশীথ।'

'এ কেমন ক'রে হ'ল দিদিমণি? কলকাতায় কেন এমন ওষুধের সন্ধান পাও নি?'

'সেই তো আমার মস্তবড় দুঃখ নিশীথ। কলকাতার লেক প্লেসের ফ্ল্যাটে আমার হাতের কাছে ওষুধ ছিল প'ড়ে, অথচ আমি দেখতে পাই নি। বোধ হয় আমি ইচ্ছে ক'রেই দেখতে চাই নি।'

আমার কথা শুনে নিশীথ একটু হাসল। তারপর হাসতে হাসতেই সে বললে, 'তুমি বড্ড ছেলেমানুষ দিদিমণি।'

'আমার কি মনে হয় জানিস? মনে হয়, আজও সেই দশ বছর বয়সের ছোট্ট মেয়েটি, কেষ্টনগরের জঙ্গলে ভবতোষের হাত ধ'রে ঘুরে বেড়াচ্ছি।'

'ভবতোষবাবুরাও বুঝি কেষ্টনগরে থাকতেন?'—জিজ্ঞাসা করল নিশীথ।

'হ্যাঁ। বাড়ি আমাদের ছিল পাশাপাশি।...নিশীথ বাইরের দরজায় কে যেন কড়া নাড়ছে! ডাক্তার প্রধানকে তুই আসতে বলেছিস নাকি?'

'কই, না তো।'

'তবে এই সন্ধ্যেবেলা কড়া নাড়ছে কে?'

'কি জানি, ডাক্তার প্রধান হয়তো তোমার সঙ্গে আলাপ করতে এসেছেন। এলেনই বা, ক্ষতি কি! ডেকে নিয়ে আসব দিদিমণি?'

'নিয়ে আয়।'

একটু বাদে নিশীথ একাই ফিরে এল। এসে বললে, 'একজন পাদ্রী সাহেব তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন, ডাক্তার সাহেব আসেন নি।'

বিছানায় উঠে বসলুম আমি। কই, কোন পাদ্রী সাহেবকে তো

আমি চিনি না—শোবার ঘরে ডেকে পাঠাই কি ক'রে? আমি একটু ভাবছি দেখে নিশীথ বললে, 'এ অঞ্চলের সবাই পাদ্রী সাহেবকে চেনে। আর ভালবাসেও খুব। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় তাঁর সুনাম আছে। ও-পাশের ওই ছোট্ট গীর্জেটার কাছে তিনি থাকেন। সাহেব খুব ভাল বাংলা বলেন দিদিমণি।'

'আচ্ছা, শোবার ঘরেই ডেকে নিয়ে আয়।'

'তাতে কোন দোষ নেই, সাহেবকে আমি বলেছি তুমি অসুস্থ।'

নিশীথ চ'লে যাবার পরে আমি লেপ গায়ে দিয়ে শুয়ে পড়লুম। ঘরটা বড্ড এলোমেলো হয়েছিল। গোছাবার সময় পেলুম না। টীপয়ের ওপরে ব্র্যাণ্ডির বোতলটা যেমন ছিল তেমনই রইল। ভাবলুম, হাত বাড়িয়ে বোতলটা টেনে নিই, লুকিয়ে রাখি লেপের তলায়। একজন বিদেশী ধর্মযাজকের সামনে নিজেকে এমনভাবে প্রকাশ করা বোধ হয় উচিত হবে না।

ঘরে ঢুকেই পাদ্রী সাহেব কপালের কাছে হাত তুলে বাংলায় বললেন, 'নমস্কার।'

আমিও তাঁকে প্রতিনমস্কার জানিয়ে বললাম, 'বসুন।'

বিছানার পাশেই চেয়ার ছিল। তিনি বসলেন সেখানে। ঘরের চারিদিকটা চকিতের মধ্যে দেখে নিলেন একবার। ব্র্যাণ্ডির বোতলের ওপর তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ হ'ল না এক সেকেণ্ডের জন্যেও। বইয়ের শেল্‌ফ্‌টার দিকে পাদ্রী সাহেব চেয়ে রইলেন মিনিট দুই। কিন্তু বই সম্বন্ধে কোন কথা না ব'লে পাদ্রী সাহেব বললেন, 'আজ দু দিন থেকে ভাবছি আপনার কাছে এসে খবর নিয়ে যাই। আমি আপনার খুব নিকটেই থাকি।' একটু থেমে পাদ্রী সাহেব কি যেন ভাবতে লাগলেন। আমি তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম।

চেয়ারে ব'সে পাদ্রী সাহেব তাঁর ক্যাসকের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে কি যেন খুঁজছিলেন ব'লে মনে হ'ল আমার। জিজ্ঞাসা করলুম,

'কিছু হারিয়ে গেল না কি? আপনাদের কাছ থেকে তো সহজে কিছু হারায় না।'

'কি রকম?'—এই ব'লে পাদ্রী সাহেব এমন ভাবে হাসলেন যেন মনে হ'ল, তাঁর মত এতবড় ঘনিষ্ঠ বন্ধু আমার দ্বিতীয় আর কেউ নেই।

বললুম, 'কোটি কোটি হারানো আত্মা আপনারা উদ্ধার করেন, যারা হতভাগা, যারা অশুচি, যারা নির্যাতিত, যারা হারিয়ে যায়, তাদের আপনারা—'

কথাটা আমায় শেষ করতে দিলেন না পাদ্রী সাহেব। তিনি ব'লে উঠলেন, 'এই তো পেয়েছি।'

'কি পেয়েছেন?'

'চিঠি।'—এই ব'লে তিনি সত্যি সত্যি আমার হাতে একখানা খাম দিলেন। দেখলুম, খামের ওপর লেখা রয়েছে পাদ্রী সাহেবের নাম ঠিকানা। হাতের লেখাটা আমার খুবই চেনা। খামের মধ্যে থেকে চিঠিখানা বার করতে যাচ্ছিলাম, এমন সময় তিনি বললেন, 'আমি ফরাসী দেশের লোক। কিন্তু সবাই ইংরেজী উচ্চারণ করেন। তাই আমায় এঁরা ডাকেন ফাদার হেনরী ব'লে।'

নামটা আমার চেনা। ইতিমধ্যে চিঠিখানা আমার পড়া শেষ হয়ে গেছে।

সন্ধ্যে হয়ে এল। দক্ষিণ দিকের কাচের জানলাগুলো সব খোলা ছিল। আমি বিছানায় শুয়ে শুয়ে দেখতে লাগলুম, সেণ্ট মেরী পাহাড়টায় অন্ধকার নেমে এসেছে। গীর্জার চূড়াটা আর এখান থেকে দেখা যায় না। দিনের বেলায় খণ্ড খণ্ড মেঘ চূড়াটাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে চারদিকে ছুটোছুটি করে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমি চেয়ে থাকি সেই দিকে। মুহূর্তের জন্যেও আমার শ্রান্তি আসে না। আসে না একঘেয়েমির বিরক্তি। মনে হয়, খণ্ড খণ্ড ওই মেঘগুলোর সঙ্গে আমার যেন কোথায় একটা অদ্ভুত মিল রয়েছে। ওদের মত আমিও সারাটা জীবন স্বাধীন-সত্তা

নিয়ে ভেসে বেড়িয়েছি সমাজ-আকাশে। কিন্তু ওদের মত কোন কিছুই ছুঁতে পারি নি আমি।

ফাদার হেনরী বললেন, 'এত বেশি ঠাণ্ডা আপনার পক্ষে ভাল হবে না। জানলাগুলো বন্ধ ক'রে দিই।'

তিনি উঠলেন। আমি বললুম, 'না না, আপনি কেন কষ্ট করবেন, নিশীথ এক্ষুনি এসে যাবে।' আমার আপত্তি তিনি শুনলেন না। আমি ভাবলুম, জানলা বন্ধ করতে গিয়ে তিনি নিশ্চয়ই টীপয়ের ওপর একবার অসন্তুষ্টির দৃষ্টি ফেলবেন এবং ব্র্যাণ্ডির বোতল ও গেলাসের মধ্যে যে একটা নিবিড় যোগাযোগ রয়েছে তাও তিনি লক্ষ্য করবেন। আমি তাঁর কঠিন সমালোচনার ভাষা শোনবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে রইলাম। জানলাগুলো তিনি বন্ধ ক'রে দিলেন বটে, কিন্তু নিষিদ্ধ এলাকার দিকে তিনি ভুল ক'রেও চাইলেন না একবার। বইয়ের শেল্‌ফের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি। আমি যে দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপিকা ছিলাম, সে সম্বন্ধে তাঁর আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ রইল না।

শেল্‌ফের কাছ থেকে ফিরে এসে ফাদার হেনরী বললেন, 'আমার স্বদেশের অনেক লেখকই দেখছি আপনার শেল্‌ফে রয়েছে। দু চারজন ধর্মযাজকের লেখা বইও আছে দেখলুম। ফরাসী লেখকদের প্রতি আপনার পক্ষপাতিত্ব যে-কোন লোকের চোখেই ধরা পড়বে।'

নিশীথ চা নিয়ে এল। ফাদার হেনরীর সামনে একটা টীপয়ের ওপর ট্রে-টা সাজিয়ে দিয়ে সে আবার ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে ফাদার হেনরী বললেন, 'চিঠিখানা আজই আমি পেয়েছি। কিন্তু পরশুদিন যখন প্রথম এসে উঠলেন, তখনই ভেবেছিলুম এসে খবর নিয়ে যাই। এমন জায়গায় বাড়ি কিনলেন যে, আমরা ছাড়া আপনার আর দ্বিতীয় কোন প্রতিবেশী নেই।'

'বাড়িটা কেনবার সময় কেবল এই কথাটাই বিবেচনা করেছিলাম।'

'কোন্ কথাটা?'—জিজ্ঞাসা করলেন ফাদার হেনরী।

'প্রতিবেশী কেউ থাকলে আমি বাড়ি কিনতাম না। চ'লে যেতাম কাঞ্চনজঙ্ঘার কোন নিকটবর্তী স্থানে। আপনাদের অবশ্যি আমি প্রতিবেশী ব'লে বিবেচনা করি না।'

'যাঁরা অস্তিবাদী, অর্থাৎ 'নিছক অস্তিত্ব'-এর বাইরে যাঁরা দ্বিতীয় কোন সত্যের সন্ধান পান না, তাঁরা কেউ আমাদের মানুষই মনে করেন না। কিন্তু ভগবানের কি অশেষ করুণা যে, তা সত্ত্বেও তিনি আমাদের মানুষ ক'রে রেখেছেন।'

'কার করুণা আমি জানি না, কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে এই যে, মানুষ যা করতে চায় তা সে করে না। অথচ মানুষ যা করে তার জন্য দায়ী কেবল মানুষই—আপনি এই কথাটা মানেন কি না-মানেন তাতে কিছু এসে-যায় না, কারণ এইটেই সত্য। তিক্ত সত্য সন্দেহ নেই, তবু সত্য তো বটে।'

'হাঃ, হাঃ, হাঃ!'—ফাদার হেনরী উঠে গিয়ে আমার শেল্‌ফ্ থেকে একটা বই নিয়ে এসে বললেন, 'এই তো আপনার অথরিটি? অস্তিবাদীর অটো-ইরটিক আমোদ-চক্রের বাইরে নিজের প্রতিবিম্ব আপনি দেখতে পাচ্ছেন না, মিস্ বোস। আর একদিন আসব। আজ বড্ড দেরি হয়ে গেছে। বাই দি ওয়ে, এখানে কোন ডাক্তার কি আপনি ঠিক করেছেন?'

'না। নিশীথ বলছিল, এখানে নাকি ডাক্তার প্রধানের খুব নাম। তার একটা ছোট্ট হাসপাতালও আছে।...ফাদার, আপনি কেন আমার চিকিৎসার ভার নেন না?'

আলখাল্লার মত লম্বা ক্যাসকের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে ফাদার হেনরী বললেন, 'হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার ওপর আপনার বিশ্বাস আছে?'

'কেন থাকবে না, হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা কি বৈজ্ঞানিক নয়? ফাদার, পকেট থেকে আপনার ওষুধের বাক্সটা বার করুন না।'—ইচ্ছে ক'রে আমি আমার গলায় খানিকটা আবদারের সুর ভাসিয়ে তুললুম।

পকেট থেকে হাত বার ক'রে তিনি বললেন, 'এই যাঃ! ওষুধের বাক্সটা তো ফেলে এসেছি। অন্য এক জায়গায় যাওয়ার কথা ছিল। আপনার অসুখে হোমিওপ্যাথি কাজ করবে না। মিস বোস, আপনি পীড়িত—চিঠিতে আপনার সব বিবরণ পাঠ ক'রে আমার মনে হয়েছে যে, আপনার জীবনদর্শন আপনাকে ভয়ানক রকমে অসুস্থ ক'রে তুলেছে। এই বয়সে আপনার লিভারটা প'চে গেল কেন? শেল্‌ফ্‌টাকে সাফ করার দরকার হয়েছে—'

বাধা দিয়ে আমি বললুম, 'ফাদার, প্লীজ—একটু থামুন ফাদার। আমার লিভারের সঙ্গে জীবনদর্শনের কি সম্বন্ধ?'

'আছে, সম্বন্ধ আছে মিস বোস। শূন্যতা ছাড়া জীবনে আপনাদের আর কোন সত্য নেই। শুরু থেকেই একটা ক্লান্তিকর নৈরাশ্যজনক শূন্যতাবোধ—সব কিছু ক্ষ'য়ে যাচ্ছে, কোন কিছুই ধ'রে রাখতে পারলেন না, এমন কি লিভারটা পর্যন্ত গ'লে গেল। আজ উঠি, চিঠিখানা আমায় ফিরিয়ে দিন।'

চিঠিখানা ফাদার হেনরীর হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বললুম, 'এমন সুন্দর বাংলা বলতে শিখেছেন যে, বিদেশী ব'লে আর বোঝাই যায় না।'

'আর তো আমি বিদেশী নই মিস বোস। স্বাধীন ভারতবর্ষের সনদপ্রাপ্ত নাগরিক আমি। সে যাক, ভবতোষকে কাল আমি একটা জবাব লিখে পাঠাব। ডাক্তার-বদ্যির ব্যবস্থা কাল যা হয় করা যাবে। কোন কিছু অসুবিধা ঘটলে নিশীথকে দিয়ে আমায় খবর পাঠাবেন। ভগবান আপনার মঙ্গল করুন।'

'লিভারটা প'চে যাওয়ার পরে আমি আর ভগবানের হাতেও নেই ফাদার। কিন্তু ভবতোষের সঙ্গে আপনার পরিচয় কি কেষ্টনগর থেকে?'

ফাদার হেনরী যাওয়ার জন্যে উঠে পড়েছিলেন। চেয়ারে না ব'সেই তিনি বললেন, 'ফরাসী দেশ থেকে আমি যখন প্রথম ভারতবর্ষে আসি, তখন কেষ্টনগরের মিশনে আমি যোগ দিই। সেখানে আমি

পাঁচ বছর ছিলাম। আপনি নিশ্চয়ই জানেন, আমাদের মিশনের খুব বড় কেন্দ্র হচ্ছে কেষ্টনগর। ভবতোষের সঙ্গে আমার পরিচয় সেখান থেকেই। তারপরে বিলেতেও আমরা একসঙ্গে ছিলুম। কোন একটি বিশেষ বিদ্যা সম্বন্ধে গবেষণা করবার জন্যে আমায় সেখানে বছর দুই থাকতে হয়েছিল। ভবতোষের সঙ্গে সেখানে আমার প্রায় প্রত্যেক দিনই দেখা হ'ত। আপনার কথা আমি তখন থেকে জানতুম।'

'জানতেন ?'—আমি বিছানায় উঠে বসলুম। ফাদার হেনরীকে আমি অনুনয়ের সুরে বললুম, 'প্লীজ, আর একটু ব'সে যান। আজ থেকে প্রায় ন' বছর আগেকার কথা। দর্শনশাস্ত্রে এম. এ. পাস ক'রে সবেমাত্র কলেজে চাকরি নিয়েছি। পাস করার প্রয়োজনে দর্শনশাস্ত্র পড়েছি। কিন্তু জীবনে তা প্রয়োগ করবার প্রশ্ন ওঠে নি তখনও। ভবতোষ নিয়মিত বিলেত থেকে চিঠি লিখত আমায়। ভালবাসার উত্তাপে প্রতিটি কথা উত্তপ্ত হয়ে থাকত। ফস্ ক'রে ওর চিঠি কখনও তাই আমি কোনদিনও খুলতুম না। র'য়ে ব'সে, ধীরে সময় নিয়ে একটু একটু ক'রে খামখানা খুলতুম। ফাদার, মনস্তত্ত্ববিজ্ঞান আমার কণ্ঠস্থ ছিল বটে, কিন্তু জীবনে এর কোন প্রয়োজন আছে তা আমি একদিনের জন্যেও বিশ্বাস করি নি। ক্রমে ক্রমে যতই দিন পার হতে লাগল, ভবতোষের চিঠিতে আমি মনস্তত্ত্ববিজ্ঞান খুঁজে বেড়াতে লাগলুম। ওর চিঠির প্রতিটি লাইনই কেবল পড়তুম না, দু লাইনের মাঝখানে কোন গুপ্ত অর্থ পাওয়া যায় কি না তার সন্ধান করতে লাগলুম। সন্ধান করলুম উনিশ শো আটত্রিশ থেকে উনচল্লিশ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। সন্দেহ আমার সত্যে পরিণত হ'ল।'

'হ্যাঁ, সময়টা ঠিকই হয়েছে। ইয়োরোপে তখন একটা ভারতীয় নাচিয়ের দল নাচ দেখিয়ে বেড়াচ্ছিল। ভবতোষ প্যারিসে গিয়েছিল নাচ দেখবার জন্যে। সেখান থেকে আর সে লণ্ডনে ফিরে আসে নি।

পরীক্ষাও দিল না। নাচিয়েদের সঙ্গে ইয়োরোপের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে ভারতবর্ষে যখন সে ফিরে এল, ইয়োরোপে তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হয়েছে। মিস বোস, সেই সময় আপনার যে কত কষ্ট হয়েছিল আমি তা বুঝতে পারি। কিন্তু ইয়োরোপের কথা ভাবুন তো। আপনার মত কত লক্ষ লক্ষ মেয়ের স্বপ্ন সেদিন ভেঙে গুঁড়ো হয়ে গিয়েছিল। ভবতোষ ক্ষমার যোগ্য নয়, কিন্তু তবুও আপনি যদি তাকে ক্ষমা না করেন, তা হ'লে তার যে নরকেও স্থান হবে না। নিশীথকে বলবেন, শেল্‌ফ্‌ থেকে ওই বইগুলো যেন সে সরিয়ে ফেলে।···মিস বোস, বইগুলো সরিয়ে না ফেললে, মানুষকে ক্ষমা করবার মত মনের বিস্তৃতি অর্জন করতে পারবেন না। আজ চলি। অন্য আর একদিন আসব।'—এই ব'লে ফাদার হেনরী চলে যাচ্ছিলেন। আমি পেছন থেকে ডাকলুম, 'একটু দাঁড়ান ফাদার।' তিনি ঘুরে দাঁড়ালেন আমার দিকে মুখ ক'রে। আমি বললুম, 'আমার দৃঢ়বিশ্বাস আপনি আমাদের সম্বন্ধে সব কথাই জানেন। ফাদার, আপনি কি রত্নাকে চেনেন না?'

'চিনতুম, চিনতুম।'—ব'লে তিনি স্বীকৃতিসূচক মাথা নাড়তে লাগলেন। নিমেষের মধ্যে তন্ময় হয়ে গেলেন তিনি। কি যেন ভাবতে লাগলেন।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'তার সম্বন্ধে কোন খবর রাখেন না?'

'রাখি মিস বোস।···ভগবান তাকে শান্তি দিন।···গুড নাইট মিস বোস।'

'গুড নাইট ফাদার।'

একটু হেসে ফাদার হেনরী ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। আমি লক্ষ্য করলুম, হাসির মধ্যে তাঁর দুঃখের চিহ্নটা স্পষ্ট ভাবে ভেসে উঠল। আমার কাছে তিনি কোন কিছুই গোপন করতে পারলেন না। কেবল ভবতোষ নয়, রত্নাও তাঁর মনের জগতে নিকটতম বাস্তব।

ফাদার হেনরীকে এগিয়ে দেবার জন্যে নিশীথ গেল তাঁর পেছনে পেছনে বাইরের দরজা পর্যন্ত।

মিনিট পাঁচ হয়ে গেল, নিশীথ তবু ফিরল না। বুঝলুম, সে গীর্জা পর্যন্ত গেছে। ফাদার হেনরীর থাকবার জায়গাটা না দেখে সে ফিরে আসবে না।

যাক, এবার আমি ফিরে যাচ্ছি সেই পুরনো কাহিনীতে। কেষ্টনগরে আমরা পাশাপাশি বাড়িতে থাকতুম। শহরের এই দিকটা তখন ছিল সবচেয়ে খারাপ। বাড়িগুলো সব পুরনো। বুনো ঘাস আর জঙ্গলের জন্যে কোন বাড়িরই একতলাটা বাইরে থেকে দেখা যেত না। রাত্রে মাঝে মাঝে বাঘ আসত। গোয়ালের দরজা খোলা পেলে গরু-বাছুর রক্ষা পেত না বাঘের মুখ থেকে।

আমাদের বাড়িতে আমি আর মা থাকতুম। বাবা সরকারী কাজ করতেন এলাহাবাদে। দু-এক বছর পর পর তিনি কেষ্টনগরে আসতেন। কিন্তু শেষের দিকে প্রায় বছর চার পর্যন্ত বাবা আর এখানে আসেন নি। মাকে আমি প্রায়ই জিজ্ঞাসা করতুম, বাবা কেন আমাদের এলাহাবাদে নিয়ে যান না? মা আমার প্রশ্নের জবাব দিতেন না। প্রতি মাসে বাবা মনিঅর্ডার ক'রে আমাদের টাকা পাঠাতেন। মনিঅর্ডার সই ক'রে টাকা রাখতুম আমি।

কেষ্টনগর ছেড়ে আসবার দু-এক মাস আগে হঠাৎ মা আমায় একদিন বললেন, 'জয়া, জানিস তোর বাবা আমাদের এলাহাবাদ নিয়ে যান না কেন?'

'জানি না মা। ইস্কুলের মেয়েরা আমায় কত কথাই না বলে! তা ছাড়া, ভবতোষ—'

বাধা দিয়ে মা বললেন, 'আমার একটা পা খোঁড়া, রূপ নেই, তিনি তাই আমায় এখানে ফেলে রেখেছেন। জয়া, আমার

নিজের জন্যে দুঃখ কিছু নেই। কিন্তু তোর প্রতি তিনি অবিচার করছেন।'

'না মা, তুমি এমন কথা ব'লো না। ইস্কুলে আমার মাইনে লাগে না—আমি প্রথম হয়ে ফি বছরই পাশ করছি। কিন্তু ভবতোষ কি বলে জান? বাবা নাকি আবার বিয়ে করেছেন।'

মা মাথা নীচু ক'রে রইলেন, কোন জবাব দিলেন না।

জবাবের আর প্রয়োজন হ'ল না। মা অসুখে পড়লেন। মাস দেড়েক যমে-ডাক্তারে টানাটানি চলল। কলকাতা থেকে আমার মামা এলেন। ডক্টর যাদব মিত্র, সরকারী কলেজের অধ্যাপক। ভারত-ইতিহাসের কি এক গুপ্ত খবর খুঁজে বার করবার জন্যে তাঁর তখন দেশময় নাম ছড়িয়ে পড়েছে। নামের জন্যে মামার খুব লোভ ছিল না। তিনি ইংরেজ কর্মচারীদের সুনজরে পড়তে চেয়েছিলেন। উত্তরকালে প'ড়েও ছিলেন। সে কথা পরে লিখব।

মামা তাঁর সাধ্যমত চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন। বাবাকে আমি সব কথা লিখে জানালাম। সেখান থেকে কোন জবাব এল না, এমন কি মাসিক টাকা পাঠানোও তিনি বন্ধ ক'রে দিলেন। একদিন ভোরবেলা মা মারা গেলেন। ভবতোষ মার বিছানার পাশেই ব'সে ছিল সারারাত। বাইরের বারান্দায় একটা ঈজি-চেয়ারে শুয়ে মামা রাত কাটাতেন।

আমি মার পায়ের কাছে ব'সেছিলুম। হঠাৎ ভবতোষ বললে, 'জয়া, মামাবাবুকে একবার ডাক তো।'

'কেন?'

'দরকার আছে।'

আমি দেখলুম, ভবতোষ তার হাতের উল্টো পিঠটা মায়ের নাকের কাছে তুলে ধ'রে নিশ্বাস পরীক্ষা করছে। বয়সে ভবতোষ আমার চেয়ে বছর দুই কি তিন বড়। মামাকে ডেকে নিয়ে এলুম। তিনি

ঘরে ঢুকেই ভবতোষকে বললেন ডাক্তার ডাকতে। একটু বাদেই ডাক্তার এলেন। তিনি পরীক্ষা ক'রে বললেন, মা মারা গেছেন।

ইচ্ছে হচ্ছিল, খুব চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কাঁদি। বোধ হয় কাঁদবার চেষ্টাও করেছিলুম। কিন্তু চোখে আমার জল এল না। মনের ওপর দিয়ে তখন আমার রাগের তুফান ব'য়ে যাচ্ছে। মানুষের ওপর আমি শ্রদ্ধা হারাতে লাগলুম।

শ্মশানে আমিও গিয়েছিলুম। মার চিতার পাশে দেখলুম, একটি যুবতী মেয়ের শবদেহের ওপর কাঠ সাজানো হচ্ছে। ভবতোষ আমার পাশেই ব'সে ছিল। আমি তাকে বললুম, 'মেয়েটি কি সুন্দর! যাদের রূপ নেই, যাদের একটা পা একটু খোঁড়া, তারাই কেবল মরে না— সুন্দরী মেয়েরাও মরে।'

ভবতোষ আমার ডান হাতটা ওর দু হাতের মধ্যে চেপে ধ'রে বললে, 'জয়া, এবার তো মামা তোমায় কলকাতা নিয়ে যাবেন। আর তো দেখা হবে না।'

'কেন, তুমি কি কলকাতা আসবে না।'

'ম্যাট্রিক পাস করলে তবে হয়তো কলকাতায় যাব। যাব, তাও জোর ক'রে বলতে পারি না। বাবা হয়তো বলবেন, এখানকার কলেজে পড়তে। ততদিন কি কেউ কাউকে মনে ক'রে রাখতে পারে?'

'মানুষ যদি জন্তু না হয়, তবে নিশ্চয়ই পারে। আমি গিয়ে তোমায় চিঠি লিখব। তুমি জবাব দেবে তো?'

'জবাব দিতে আর অসুবিধে কি! কিন্তু চিঠি পাঠাব কি ক'রে?'

'কেন?'

'খাম কিনতে পয়সা লাগবে তো। বাবার কাছ থেকে একটা আধলা পর্যন্ত গলানো যায় না।'

'তা হ'লে কি হবে ভবতোষ?'

'ঠিক আছে, এমনিতে না দেয়, বাবার পকেট থেকে চুরি করব।'

'না না ভবতোষ। তা হ'লে চিঠি লেখার দরকার নেই। লিখলেও তোমার চিঠি আমি পড়ব না।'

ভবতোষের কথা শুনে সেদিন আমি খুবই আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম। সে মিশনরী সাহেবদের ইস্কুলে পড়ত। সেখানকার শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে চরিত্রগঠনের শিক্ষা ছিল সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বিধি। তা ছাড়া কয়েক বছর দেখা হবে না ব'লে ভবতোষ আমায় মনে ক'রে রাখতে পারবে কি না সে সম্বন্ধেও সে নিশ্চয় ক'রে কিছু বলতে পারে না।

পরের দিন মামার সঙ্গে আমি কলকাতা রওনা হলুম। গাড়িতে ব'সে সেদিন আমি কেবল বাবার নিষ্ঠুরতার কথাই ভাবি নি, ভবতোষের কথাও ভেবেছি। এতটুকু বয়সে মানুষ সম্বন্ধে এমন সব অভিজ্ঞতা নিয়ে আমি কলকাতা এলুম যে, উত্তরকালে সে অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র বেড়েই চলল, কিন্তু সঙ্কুচিত হ'ল না।

রত্না, রাত এখন খুব বেশি নয়। নিশীথ গেছে সাহেবকে পৌঁছে দিতে। এখনোও ফেরে নি। এতক্ষণে ওর ফেরা উচিত ছিল। শুয়ে শুয়ে আমি কেষ্টনগরের কথা ভাবছিলুম। আজ আর তোকে চিঠি লিখতে ইচ্ছে করছে না। ভাল লাগছে না লিখতে। সন্ধ্যের সময় আজ কি একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘ'টে গেল! কাথলিক পুরোহিতটির কাছে ভবতোষ চিঠি দিয়েছে আমার অসুখের সব খবর দিয়ে! সেই চিঠি নিয়েই ফাদার হেনরী এসেছিলেন আমার সঙ্গে দেখা করতে।

আজ আর আমার চিঠি লেখা হবে না। তোর কাছে ছুটি চাইছি ভাই। ফাদার হেনরী চ'লে যাওয়ার পরে চোখ ভেঙে আমার ঘুম আসছে। বোধ হয় এক যুগ পরে আজ আমি রাত্রিবেলা ঘুমতে যাচ্ছি। ফাদার হেনরী যাওয়ার আগে ঘরের বাতাসে কি ঘুমের ওষুধ ছড়িয়ে দিয়ে গেলেন?

ঘরের বাইরে খুট্ ক'রে শব্দ হ'ল। জিজ্ঞাসা করলুম, 'কে?'

'আমি, আমি নিশীথ।'

'কখন এলি?'

'একটু আগে।'

'গীর্জা পর্যন্ত গিয়েছিলি বুঝি?'

'হ্যাঁ।'

'সাহেব কি বললেন রে?'

'তোমার জন্যে ওষুধ নিয়ে আসবেন।'

'আলোটা নিবিয়ে দে—আমি এবার ঘুমোব।'

নিশীথ আলো নিবিয়ে দিল।—"

॥ চতুর্থ রাত্রি ॥

"রত্না, আমার স্পষ্ট মনে আছে, সেদিন শ্মশান থেকে ফিরে আসতে প্রায় তিনটে বেজে গিয়েছিল। বড় মামা ডক্টর যাদব মিত্র অবশ্য বেলা তিনটে পর্যন্ত সেখানে ছিলেন না। কি একটা জরুরী কাজ আছে ব'লে তিনি শ্মশান থেকে চ'লে এসেছিলেন বারোটা নাগাদ। আসবার সময় তিনি শ্মশানের যাবতীয় খরচপত্র সব ভবতোষের বাবার কাছে দিয়ে এসেছিলেন। তিনি জানতেন যে, ওঁদের সঙ্গেই আমি বাড়ি ফিরব।

মার মৃত্যুতে বড় মামা খুশি হন নি বটে, কিন্তু দুঃখিত হয়েছেন ব'লেও আমার মনে হ'ল না। তাঁর বোন যে স্বামীপরিত্যক্তা—তেমন একটা তিক্ত বাস্তব মামার মত ঐতিহাসিকের পক্ষে এতগুলো বছর ব'য়ে বেড়ানো সত্যিই খুব সহজ ছিল না। তিনি ঐতিহাসিক, সমাজ-সংস্কারক নন। রাজা রামমোহনের উপর তাঁর অপরিসীম শ্রদ্ধা, অগণিত প্রবন্ধ লিখেছেন রামমোহনের বৈপ্লবিক কীর্তিগুলোর কথা উল্লেখ ক'রে ক'রে। কিন্তু মার ডান পা-টা একটু খোঁড়া ছিল ব'লে তিনি ভগবানের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছেন, তবুও তাঁর নিজের সমাজের বিরুদ্ধে আধখানা প্রবন্ধও লিখতে পারেন নি। বাবা যে মায়ের উপর একটানা বারোটা বছর অবিচার ক'রে গেলেন, তার জন্যে তিনি একটা দিনের জন্যেও প্রতিবাদ করেন নি। অতএব, মার মৃত্যু বড় মামার কাছে খুব একটা নিদারুণ শোকের ব্যাপার ব'লে অনুভূত হ'ল না, উপরন্তু তিনি একটা পুরনো মানসিক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেলেন।

বাড়ি ফিরলাম বেলা প্রায় তিনটের সময়। বাড়ির দরজার কাছে এসে ভবতোষ বললে, 'তুমি যাও, আমি কাপড় বদলে আসছি।' দু-পা এগিয়ে গিয়ে ভবতোষ ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, 'বাড়িতে ঢুকতে তোমার ভয় করছে না কি জয়া?'

'ভয় ? না, না—'

আমি ভিজে কাপড় প'রে দাঁড়িয়েছিলাম। ফিরবার পথে নদীতে আমরা সবাই চান ক'রে ফিরেছি। প্রায় বছর খানেক আগে থেকে মা আমায় শাড়ি পরতে বাধ্য করেছিলেন। এক বছর আগে হয়তো শাড়ি পরবার খুব কিছু দরকার ছিল না, কিন্তু এক বছরের মধ্যেই ভবতোষের দৃষ্টির অর্থ গেল বদলে। নিজেকে গোপন করবার তাগিদ অনুভব করলাম স্বাভাবিক কারণে। অত অল্প বয়সেই, ভবতোষকে একজন গোটা পুরুষমানুষ ব'লে মনে হ'ত আমার।

আমার দিকে চেয়ে ভবতোষ বললে, 'চল, তোমার সঙ্গে আমি যাচ্ছি। আমি জানি, বাড়ির ভেতরে ঢুকতে তোমার ভয় করছে।'

ভয় যে করছিল সে কথা সত্যি। তাই বললুম, 'মা যে নেই, আমি যেন এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না। ভবতোষ, তোমার কি মনে হয়, এমন একটা ভূতুড়ে ভাঙা বাড়ির মধ্যে মার আত্মা আবার ফিরে আসবে?'

আমার কথা শুনে ভবতোষ খ্রীষ্টভক্তদের মত কপালে, কাঁধে এবং বুকে আঙুল ঠেকিয়ে ক্রুশের চিহ্ন এঁকে বললে, 'ভগবান তোমার মায়ের আত্মার কল্যাণ করুন। চল—'

ভবতোষ আমার হাত ধ'রে এক রকম টানতে টানতেই দোতলায় নিয়ে এল। এসে বললে, 'ওই ঘরে গিয়ে এবার কাপড় বদলে এসো। দরজা বন্ধ ক'রে নিয়ো।'

'কেন ?'

'যদি লজ্জা পাও ? আমি যদি ঢুকে পড়ি ?' ভবতোষ যেন ইচ্ছে ক'রেই আমার মধ্যে কি এক লজ্জার একটা অজ্ঞাত হেতু সৃষ্টি করবার চেষ্টা করতে লাগল।

'তোমার কাছে আমার মত ছেলেমানুষের কোন লজ্জাই থাকতে পারে না। তুমি এখানেই দাঁড়াও, আমি আসছি।'—এই ব'লে আমি

ঘরের মধ্যে চ'লে গেলাম। আলনা থেকে একখানা শাড়ি টেনে নিয়ে ভেজা কাপড় বদলাতে আমার দু মিনিটও লাগল না। সামনের দিকে চাইতে গিয়ে দেখলুম, দেয়ালের গায়ে মায়ের একখানা ফোটো রয়েছে। আমি ফোটোখানার দিকে তন্ময় হয়ে চেয়ে রইলুম। মাথা থেকে পা পর্যন্ত মার প্রতিটি অঙ্গ আমি পর্যবেক্ষণ করতে লাগলুম, কোথাও একটু খুঁত আমার চোখে পড়ল না। মা যে একটু খোঁড়া ছিলেন তা যেন মার মুখে না শুনলে আমি কোনদিনও জানতে পারতুম না, অথচ এমনি একটা তুচ্ছ কারণে বাবা কোনদিনও মাকে ভালবাসতে পারেন নি।

এরই মধ্যে ভবতোষ এসে আমার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। সেও চেয়ে ছিল মায়ের ফোটোখানার দিকে।

একটু পরেই আমি ওকে বললুম, 'কাল দুপুরের গাড়িতে আমরা কলকাতা চ'লে যাব। এ বাড়ির কোন জিনিসই আমরা সঙ্গে নেব না।'

'এই ফোটোখানা নেবে না?'

'মামার কাছে মার ছবি আছে, তাই তিনি নিতে বারণ করেছেন। কিন্তু আমি ভাবছি, মার মত এমন মানুষকে বাবা কি ক'রে সারাটা জীবন কষ্ট দিয়েছেন!'

'হিন্দুসমাজের কোন্ মেয়েটা সুখে আছে?'

মিশনরীদের ইস্কুলে ভবতোষ পড়ত ব'লে মাঝে মাঝেই সে হিন্দু এবং হিন্দুসমাজের বিরুদ্ধে মন্তব্য প্রকাশ করত। আজকে ওর মুখে এমন একটা কথা শুনে খুবই বিস্মিত বোধ করলাম। আমি বললুম, 'কোন মেয়েই সুখে নেই—তুমি কি ক'রে জানলে ভবতোষ? তোমার মা তো কত সুখে আছেন।'

'সুখ, না, হাতী।'—ভবতোষ তার বাঁ হাতের গোলাকৃতি মাংস-খণ্ডটিকে ডান হাতের পাঞ্জা দিয়ে রগড়াতে রগড়াতে পুনরায় বললে, 'গায়ে আর একটু শক্তি বাড়লেই দেখে নিও, বাবার সঙ্গে কি রকম ল'ড়ে যাই।'

'ছি ছি ভবতোষ, এমন কথা মুখে আনতে নেই।'

ভবতোষ এবার জানলার ওপব উঠে মায়ের ফোটোখানা নামিয়ে নিয়ে এল।

দেওয়ালের গায়ে ফোটোখানা ঠেকিয়ে রেখে সে বললে, 'ছবিটা আমি নিয়ে যাচ্ছি।'—এই ব'লে ভবতোষ আমার ঘাড়ের ওপর হাত রেখে পুনরায় বললে, 'ছবিখানা নিয়ে যাওয়ার আগে তোমার মার কাছে আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে, জীবনে তোমাকে ছাড়া আমি আর কাউকে বিয়ে করব না।'

আমি কোন কিছু বলার আগে ভবতোষ যা ক'রে বসল তার জন্যে আমি রাগে এবং লজ্জায় কেঁদে ফেললাম। চোখের জল গড়িয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল ঠোঁটের ওপর। তাড়াতাড়ি ঠোঁট দুটো ধুয়ে ফেলবার জন্যে আমি ইচ্ছে ক'রেই চোখ দিয়ে সেদিন জল ফেলেছিলাম প্রচুর পরিমাণে। তারপর দীর্ঘ বিশটা বছর পার হয়ে গেল।…রত্না, আমি লজ্জার মাথা খেয়েই তোর কাছে স্বীকার কবছি যে, সেদিনের সেই শৈথিল্যটুকু আমি নারীজীবনের সবিশেষ পুণ্য ব'লে আজও বহন ক'রে চলেছি। কেবল সবিশেষ নয়—সেই একমাত্র পুণ্যটুকুর মাথায় রাজমুকুট পরিয়ে দিয়ে যেন গত বিশটা বছর তাকে আমার দেহ-সিংহাসনে বসিয়ে রাখলুম আমি।

সন্ধ্যের একটু আগেই বড় মামা এলেন একটা মোটর গাড়ি চেপে। আমি ভবতোষদের বাড়িতে ছিলুম। বড় মামা এসে বললেন, 'জয়া, চল এক্ষুনি যেতে হবে। দু-চারখানা শাড়ি জামা যা আছে সঙ্গে নিয়ে আয়। বাড়ির চাবিটা এখানেই থাক্। তোর বাবা হরিদাস একদিন নিশ্চয়ই আসবে চাবি চাইতে।'

ভবতোষের মাকে আমি মাসীমা ব'লে ডাকতাম। মাসীমা মামাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'রাত্রিবেলা ওকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন?'

বড় মামা বললেন, 'আমার ছোট ভাই অপূর্ব যে এখানে কাজ করছে, আমি তা জানতুম না।'

মাসীমা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি কাজ করেন উনি ?'

প্রশ্ন শুনে ডক্টর যাদব মিত্র যেন কেমন একটু রহস্যজনকভাবে হেসে উঠলেন। হাসিটা মিলিয়ে যেতে সময় লাগল। তারপর তিনি বললেন, 'চাকরিটা বেশ বড়ই—আই. সি. এস. কিনা।'

'মৃত্যুশয্যায় বোনকে যখন তিনি একবার দেখতে এলেন না, তখন অপূর্ববাবু যে বড় চাকরি করেন তাতে আর কেউ সন্দেহ করবে না। দেখুন, আপনারা সবাই হরিদাসবাবুর উপর খুবই বিরূপ আমি জানি। কিন্তু জয়ার মার ওপর কাউকেই তো সুবিচার করতে দেখলুম না। ওই একটা ভূতুড়ে বাড়িতে বারোটা বছর মুখ বুজে তিনি দুঃখ ভোগ ক'রে গেলেন'—একটু থেমে মাসীমা দরজার আড়াল থেকেই বললেন, 'হরিদাসবাবুর চেয়ে ভাল এমন দু-একজন আত্মীয়স্বজন কেউ এসে একবারও তাঁর খোঁজ নেন নি। আমার কথা শুনে আপনি নিশ্চয়ই আশ্চর্য হচ্ছেন ? হবারই কথা। আপনার সঙ্গে এই আমার প্রথম ও শেষ দেখা। জয়ার আপনি মামা, আপনি ভারতবিখ্যাত ঐতিহাসিক. বোনের ওপর দু-চার পাতার ইতিহাস কি আপনি লিখতে পারবেন না ? সতীদাহের নিষ্ঠুরতা কেবল দেখলেন, আর ঘরের পাশের নিষ্ঠুরতা—।' মাসীমা হঠাৎ থেমে গেলেন। আমি বুঝলুম তিনি কাঁদছেন।

বড় মামা বললেন, 'থাক্, অপূর্বর ওখানে জয়ার না যাওয়াই উচিত। কাল স্টেশনে যাওয়ার পথে আমি ওকে এসে নিয়ে যাব। হরিদাস এলে তাকে অনুগ্রহ ক'রে বাড়ির চাবিটা দিয়ে দেবেন।...আর ইতিহাসের কথা যা বললেন, তাতে আপনার একটু ভুল র'য়ে গেল। সতীদাহের ওপর আমার কোন কাজ নেই। নমস্কার।—' বড় মামা চ'লে গেলেন।

মাসীমা আমাকে দু হাতে জড়িয়ে ধ'রে বললেন, 'জয়া তুই একদিন প্রতিশোধ নিস। মুখোশ-পরা জন্তুগুলোকে কোনদিনও ক্ষমা করিস না।'

পরের দিন সকালে ভবতোষকে সঙ্গে নিয়ে এলুম আমাদের বাড়িতে। এখানে আমি জন্মেছি। বড় হলুম। আজ দুপুরের পর থেকে এ বাড়ির সঙ্গে আমার আর কোন সম্পর্ক থাকবে না। ইস্কুলের বইগুলোর সামনে দাঁড়িয়ে আছি দেখে ভবতোষ বললে, 'কলকাতার ইস্কুলে এ সব বই আর চলবে না। সেখানে আবার নতুন বই কিনতে হবে।'

'নতুন বই কিনতে হবে জানি। তবুও এই বইগুলো ফেলে যেতে ইচ্ছে করে না। মা কত কষ্ট ক'রে বইগুলো সব কিনে দিয়েছিলেন। দুটো মাসের জন্যে পরীক্ষাও দিতে পারলুম না।'

ভবতোষ বললে, 'এই দুটো মাস আমাদের এখানেই থেকে গেলে কেমন হয়?'

'মামাকে বলেছিলুম সে কথা, কিন্তু এখানে তিনি আমায় ফেলে যেতে রাজী হন নি। ভবতোষ, বইগুলো সব তোমার কাছে রেখে গেলুম। মা বলতেন—আমাদের পরিবারের মধ্যে বিদ্বান লোকের অভাব নেই; অভাব কেবল মানুষের। মায়ের কথা শুনে রাগে আমার গা জ্ব'লে যেত। মাকে আমি অভয় দিয়ে বলেছিলুম, এই সব অমানুষ বিদ্বান লোকদের ওপর আমি একদিন প্রতিশোধ নেব। একটু হেসে মা আমার বইগুলো হাতে নিয়ে বলেছিলেন, জয়া, ওদের তুই ক্ষমা করিস, যারা কেবল বই মুখস্থ করে, তারা ক্ষমা করতে শেখে না।'

'মা ঠিক কথাই বলেছিলেন, জয়া।'

ভবতোষ আমার বইগুলো সব গুছিয়ে নিতে লাগল। ভবতোষ আমার এক ক্লাস ওপরে পড়ত। আমার এবার অষ্টম শ্রেণীতে ওঠবার

কথা। ভবতোষ অঙ্কে খুব কাঁচা ছিল ব'লে সে আমার কাছে অঙ্ক শিখতে আসত। সপ্তম শ্রেণীতে পড়বার সময়ই আমি নবম শ্রেণীর অঙ্ক প্রায় শেষ ক'রে ফেলেছিলুম। আমার কৃতিত্বে মা খুব গর্ব বোধ করতেন বটে, কিন্তু আমার কৃতিত্বটুকু মূলধন ক'রে মা বেশিদিন বেঁচে থাকতে পারলেন না। বোধ হয় কেউ পারেও না। সন্তানের কৃতিত্ব কখনও ভালবাসার অভাব মেটাতে পারে না। বাবার কাছ থেকে মা যে কেবল ভালবাসা পান নি তা নয়। ভালবাসা পান নি ব'লে মা বড্ড অপমানিত বোধ করতেন। আত্মসম্মান বাঁচল না ব'লে শেষ পর্যন্ত তিনি নিজেও বাঁচলেন না।

একটা টিনের ট্রাঙ্কে আমার জামা কাপড় সব গুছিয়ে নিলুম। মায়ের জিনিসপত্র যেমন ছিল সবই প'ড়ে রইল ঠিক তেমনি ভাবেই। আলনার ওপরে মায়ের ব্যবহৃত ছুখানা শাড়ি ঝুলছিল। হঠাৎ আমার নজরে পড়ল যে, একটা শাড়ির আঁচলে মায়ের চাবির তাড়াটা বাঁধা রয়েছে। আমি চাবি নিয়ে মায়ের হাত-বাক্সটা খুললুম। কয়েক আনা খুচরো পয়সা প'ড়ে রয়েছে বাক্সটার মধ্যে। আমি ভিতরের দিকে হাত দিয়ে চোরা-খুপরিগুলো খুঁজে খুঁজে দেখতে লাগলুম। ডান দিকের একটা খুপরি থেকে পঞ্চাশটা টাকা বেরুল।

ভবতোষ বললে, 'টাকাগুলো কি করবে? এলাহাবাদে তোমার বাবার কাছে পাঠিয়ে দিলে কেমন হয়?'

'হ্যাঁ, মাসীমাকে দিয়ে দিও। তিনিই টাকার ব্যবস্থা করবেন। এ থেকে আমি কেবল দশটা টাকা রাখলুম।'—এই ব'লে চল্লিশটা টাকা আমি ভবতোষকে দিয়ে দিলুম।

টাকার খুপরিটার পাশে আর একটা খুপরি ছিল। সেটার মধ্যে আরও কিছু আছে কি না দেখতে গিয়ে মায়ের গুপ্তধন আমি আবিষ্কার করলুম। সোনার ফ্রেমে বাঁধানো বাবার একখানা ছবি। মা হাতে শাঁখা ছাড়া আর কিছু পরতেন না। দাদামশায়ের দেওয়া

কগাছা সোনার চুড়ি ভেঙে মা এই সোনার ফ্রেমটি তৈরি করিয়েছিলেন। এই ছবিখানা ছাড়া বাবার আর কোন ছবি এ বাড়িতে ছিল না। খুপরি থেকে ছবিখানা বার করবার সময় দু-একটা ফুল আমার হাতে ঠেকল। খুব শুকনো ফুল নয়—মৃত্যুর তিন-চার দিন আগের ফুল ব'লে মনে হ'ল আমার। মা বোধ হয় বুঝতে পেরেছিলেন যে, তিনি আর বেশিদিন বাঁচবেন না।

আমার আজ নতুন ক'রে পুরনো একটা কথা মনে পড়ল। বছর চার আগে এই ছবিখানা ছিল এ বাড়ির ঠাকুর-ঘরে। বসু-পরিবারের অধিষ্ঠিত দেবতা ছিলেন নারায়ণশিলা। মা সকাল-সন্ধ্যেতে নিজেই পুজো করতেন। বাবার ছবিখানা ছিল নারায়ণশিলা থেকে একটু দূরে আলাদা একটা মঞ্চের ওপর। রাত্রিবেলা পুজো শেষ হওয়ার পরে নারায়ণশিলার জন্যে মা বিছানা পাততেন, ছোট একটা মশারি টাঙানো থাকত মাথার ওপরে, সেটা ফেলে দিয়ে বিছানার চারদিকে গুঁজে দিতেন, পায়ের তলায় থাকত ছ ইঞ্চি মাপের একটা লেপ। গ্রীষ্মকালেও লেপটা সরিয়ে নেওয়া হ'ত না। পুতুলের ঘরের মত মনে হ'ত নারায়ণশিলার ঘরখানা। বাবার ফোটোখানার জন্যেও মা ঠিক তেমনি ব্যবস্থাই করেছিলেন। একদিন সেখান থেকে ফোটোখানা উধাও হ'ল। আমি বড় হয়ে উঠেছি ব'লে কি তিনি লজ্জা পেয়েছিলেন? মা তাঁর নিজের শাড়ি থেকে কাপড় কেটে নিয়ে ফোটোর জন্যে বিছানার চাদর তৈরি করেছিলেন। ফোটোর সুখ-সুবিধার দিকে মায়ের নজর ছিল খুব। নিজের বালিশ থেকে একমুঠো তুলো বার ক'রে ফোটোর জন্যে একটা লেপ তৈরি করে-ছিলেন মা। ঘরের বাইরে, দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে আমি দু-একদিন লক্ষ্য করেছিলাম যে, রাত্রিতে তিনি তন্ময় হয়ে আট ইঞ্চি মঞ্চের ওপর বাবার জন্যে শয্যা রচনা করছেন! দু মিনিটের কাজটা তাঁর শেষ করতে আধ ঘণ্টা লাগত। ফোটোখানাকে শুইয়ে দিয়ে তিনি

লেপ দিয়ে ঢেকে দিতেন। তারপর মশারিটা ফেলে দিয়ে তিনি দু-চার মিনিট চেয়ে থাকতেন সেই দিকে। ঘরে যে নারায়ণশিলা আছে সে কথা যেন মার মনেই থাকত না। ফুঁ দিয়ে প্রদীপটা নিবিয়ে দিয়ে ঠাকুর-ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেন তিনি।

প্রায় চার বছর হ'ল মা আর পুজো করতেন না। তাঁকে আর ঠাকুর-ঘরে ঢুকতে আমি কখনও দেখি নি। একদিন আমি নিজেই গিয়ে ঠাকুর-ঘরে ঢুকে পড়লুম। বাবার ফোটোখানা দেখতে পেলুম না। বসু পরিবারের দেবতা দেখলুম মশারির নীচে শুয়ে আছেন। ফুল-বেলপাতা শুকিয়ে সব চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। ঘরে ধুলো এবং আবর্জনার পরিমাণও কম নয়। আজ মনে হচ্ছে, আমার কাছে লজ্জা পাওয়ার জন্যে নয়, তিনি নিশ্চয়ই দেবতার ওপর বিশ্বাস হারিয়েছিলেন ব'লেই জীবনে আর কোনরকম পুজোর প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন নি। বসু পরিবারের দেবতা যখন জাগ্রত অবস্থায়ও কিছুই দেখতে পান না, তখন তাঁকে ঘুম থেকে তুলে ফুল-বেলপাতা দিয়ে পুজো করবার দরকার কি? দেবতার ওপর অভিমান ক'রে মা বাবার ফোটো পুজো করাও যুক্তিহীন ব'লে বিবেচনা করেছিলেন।

ভবতোষকে বললুম, 'বাবার ফোটোখানা আমি নিয়ে যাচ্ছি।'

'হ্যাঁ, পাকা সোনার ফ্রেম।' বললে ভবতোষ।

'সোনার ওপর আমার লোভ নেই।' আমি থেমে গেলুম।

'তবে নিচ্ছ কেন?'—জিজ্ঞাসা করল ভবতোষ।

'বাবার একটা চিহ্ন আমার কাছে থাকা উচিত। বাবার অভাব তো মামা পূরণ করতে পারবেন না। তা ছাড়া বাবার পরিচয় দিয়েই তো আমার পরিচয়···বাবার বসু উপাধিটা আমার নিজের উপাধি হয়ে থাকবে চিরদিন।'

'চিরদিন কেন?'—একটু হেসে ভবতোষই তার জবাব দিল নিজে, 'একদিন তো তোমার উপাধি বদলে যাবে, বসুর পরিবর্তে—'

কথাটা ওকে শেষ করতে না দিয়ে আমি বললুম, 'নাও, ট্রাঙ্কটা এবার তোমাদের বাড়ি নিয়ে চল। ইস্কুলের হেডমিস্ট্রেস সুরমাদির সঙ্গে দেখা করতে যেতে হবে। চল।'

ভবতোষ আমার ট্রাঙ্কের ওপরে বইয়ের প্যাকেটটা রেখে ট্রাঙ্কটা মাথায় তুলে ফেলল। বিছানাটা ওদের বাড়িতেই রয়েছে। আমি জানলা-দরজা সব বন্ধ ক'রে এসে দাঁড়ালুম ভবতোষের পাশে। বললুম ওকে, 'আমি মরে গেলে বসু-পরিবারের আর কেউ থাকবে না। তুমি মাঝে মাঝে বাড়িটা একটু দেখাশুনো ক'রো।'

ভবতোষ বলল, 'তা দেখব। নিশ্চয়ই দেখব। কিন্তু কার কাছে সেদিন শুনলুম, এলাহাবাদে তোমার একটি সৎ বোন আছে। তুমি বসু-পরিবারের শেষ সন্তান নও।'

ভবতোষের কথা শুনে আশ্চর্য না হয়ে পারলুম না। বোধ হয় আধ ঘণ্টার মধ্যেই ভবতোষকে সঙ্গে নিয়ে সুরমাদির বাড়ি গেলুম। সুরমাদি আমাদের ইস্কুলের হেড-মিস্ট্রেস। দেখলুম তিনি তাঁর বাচ্চাকে চান করাচ্ছেন। আমাকে দেখে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি, ব্যাপার কি জয়া?'

বললুম, 'কাল আমার মা মারা গেছেন। আজ দুপুরের গাড়িতে মামার সঙ্গে কলকাতা চ'লে যাচ্ছি।'

আমার কথা শুনে তিনি তাঁর বাচ্চাকে ঝির হাতে দিয়ে উঠে এসে দাঁড়ালেন আমার সামনে। খুবই অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার মা'র যে এত বড় অসুখ যাচ্ছিল, কোনদিন তো বল নি?'

'অসুখটা যে মার কি ছিল, তাই তো আমি জানতুম না।'

'কিন্তু—।' সুরমাদি একটু ভেবে নিয়ে বললেন, 'তোমাকে দিয়ে আমরা কত বড় আশা করছিলাম জান? ম্যাট্রিক পরীক্ষায় তুমি প্রথম স্থান অধিকার করতে পার আমাদের বিশ্বাস। জয়া, তোমার

মামা যদি সামান্য কিছু টাকা দেন, তা হ'লে তুমি অনায়াসেই ইস্কুলের বোর্ডিংয়ে থাকতে পার।'

'আচ্ছা, মামাকে আমি জিজ্ঞাসা ক'রে দেখব। মামার ওপর সব নির্ভর করছে।'—এই ব'লে আমি স্বরমাদির পায়ের ধুলো নিলুম। তিনি এক রকম মরিয়া হয়েই আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেষ্টনগরে তোমার কি কোন আত্মীয়স্বজনও নেই ?'

ছোট মামার কথা মনে পড়ল আমার। কিন্তু তাঁর পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করলুম না আমি। একটু দূরে দাঁড়িয়ে ভবতোষ একটা পেয়ারা চিবচ্ছিল। স্বরমাদির শেষ প্রশ্নটা শুনতে পেয়ে সে ফস ক'রে ব'লে ফেলল, 'কেষ্টনগরের ছোট ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব তো জয়ার আপন মামা।'

আমি আর দেরি করতে পারলুম না। ভবতোষের দিকে হাঁটতে হাঁটতে পেছন ফিরে বললুম, 'আমি চললুম স্বরমাদি।'

ভবতোষকে নিয়ে আমি বেরিয়ে এলুম। ভবতোষের আগেই রাস্তাটা পার হয়ে এলুম আমি। সদর-রাস্তা দিয়ে হাঁটতে আমার লজ্জা করছিল। বিষম লজ্জা। লজ্জা আমার নিজের জন্যে নয়, লজ্জা হচ্ছিল ছোট মামার জন্যে। জনৈকা স্বামী-পরিত্যক্তা নারীর এক কন্যা তাঁর ভাগ্নী, তেমন খবর লোকের কানে গেলে ছোট মামা মুখ দেখাবেন কি ক'রে ? পচা-গলা হিন্দু সমাজকে শক্তিশালী করবার জন্যে এঁরা বিলেত থেকে পাস ক'রে এসেছেন। তাঁদের মুখে আমি চুনকালি মাখাই কি ক'রে ? সদর রাস্তা দিয়ে আমি আর হাঁটতে সাহস পেলুম না। ডান দিকের একটা মস্ত বাগান-বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়লুম। চোখ ফেটে আমার জল আসছিল। কোথায় কার জন্যে যেন আমি এই মাত্র ব্যথা পেয়ে এলুম—তীব্র ব্যথা। গাছের তলায় এসে দাঁড়িয়ে গেলুম। গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে উল্টো দিকে মুখ ক'রে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলুম আমি।

ভবতোষ এসে আমায় জিজ্ঞাসা করল, 'কাঁদছ কেন ?'

চোখের জল মুছে বললুম, 'এমনি। বোধ হয় কেষ্টনগর থেকে বিদায় নিচ্ছি ব'লে। বড্ড দেরি হয়ে গেছে, চল, এ দিক দিয়ে চ'লে যাই।'

'এর চেয়ে আরও একটা শর্ট-কাট রাস্তা আছে।'—এই ব'লে ভবতোষ পুবদিকে হাঁটতে লাগল। আম আর লিচু গাছের মস্ত বড় বাগান এটা। ভবতোষের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে এসে উপস্থিত হলুম একটা ছোট্ট দরজার বাইরে। খিড়কি ব'লেই মনে হ'ল। ভবতোষ ধাক্কা দিয়ে দরজা খুলে বললে, 'এস।' ঢুকতে আমি একটু ইতস্তত করছি দেখে ভবতোষ আমার হাতে মৃদুভাবে টান দিয়ে ভেতরে নিয়ে এল। সামনেই একটা একতলা ছোট্ট বাড়ি। নতুন বাড়ি। বাড়িটার উঠোনে ফুলের বাগান। সিঁড়ির ধার ঘেঁষে অনেকগুলো ফুলের টব সাজানো রয়েছে। টবের মধ্যে তিন-চার রকমের গোলাপ ফুল—তাদের ভিন্ন ভিন্ন রঙ। ডান দিকে দেখলুম, পাথর দিয়ে একটা নকল পাহাড় তৈরি করা হয়েছে। লতাপাতা দিয়ে পাহাড়ের ওপরটা ঢাকা। ভবতোষ বললে, 'পাহাড়টার ভেতরে একটা সুড়ঙ্গ আছে, দেখবে ?' সে ওইদিকে এগুতে লাগল। আমিও চললুম ওর পেছনে পেছনে। সুড়ঙ্গটার মুখের কাছে এসে আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'এ কোথায় নিয়ে এলে আমায় ?'

ভবতোষ অতি সংক্ষেপে জবাব দিল, 'গ্রোটো।'

ভেতরে ঢুকে আমি বুঝতে পারলুম, এটা মিশনরীদের গীর্জার মত কিছু একটা হবে। সুড়ঙ্গের মধ্যে দিয়ে ভবতোষ আমায় নিয়ে এল একটা ঘরের সামনে। ঘরে পর্দা ঝুলছিল। ভবতোষ বললে, 'আমাদের হেডমাস্টার ফাদার ডুবোয়ার অফিস এটা। তোমার কথা তিনি জানেন।'

'কি ক'রে জানলেন ?'—আমি ওকে জিজ্ঞাসা করলুম।

'আমিই বলেছি। তা ছাড়া তুমি যে লেখাপড়ায় এই শহরের সবচেয়ে সেরা ছাত্রী, সে খবর হেডমাস্টারদের কারও অজানা নেই।'

'আমায় এখানে নিয়ে এলে কেন?'

'ফাদার দুবোয়ার সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেব। আর হয়তো তুমি কেষ্টনগরে আসবে না।'

'আসব, আসব ভবতোষ। বড্ড দেরি হয়ে যাচ্ছে—মামা হয়তো এতক্ষণে এসে গেছেন।'

ফাদার দুবোয়া অফিসে ছিলেন না। তাঁর বেয়ারা খবর দিল, এক্ষুনি তিনি এসে যাবেন। ভবতোষ বললে, 'ততক্ষণ এস, দেওয়ালে টাঙানো ছবিগুলো আমরা দেখি।'

যীশুখ্রীষ্টের বিভিন্ন অবস্থার ছবি। ভবতোষ প্রায় সবগুলো ছবিরই নাম জানে দেখলুম। ঘটনাগুলোও সে মোটামুটি জানে। প্রত্যেকটা ছবির কাছে দাঁড়িয়ে সংক্ষেপে সে ঘটনাগুলো বলতে লাগল। শেষ ছবিটার কাছে এসে ভবতোষ বললে, 'এই জায়গাটার নাম কালভারি। দুপুরের আগেই ইহুদীরা যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করেছিল। ওরা দুজন চোরকেও ধ'রে এনেছিল সঙ্গে। সেই চোর দুজনকে যীশুর ডান দিকে ও বাঁ দিকে ক্রুশবিদ্ধ করা হ'ল। যীশু তখন বললেন—হে পিতা, এদের তুমি ক্ষমা কর; এরা জানে না এরা কি করছে।'

এই সময় ফাদার দুবোয়া এলেন। ভবতোষকে দেখতে পেয়ে তিনি বাংলায় বললেন, 'কি খবর ভবতোষ?'

'জয়া আজ কলকাতা চ'লে যাচ্ছে ফাদার। আমি তাই ওকে এখানে নিয়ে এলুম।'

ফাদার দুবোয়ার অফিস-ঘরে এসে বসলুম আমরা। আমাদের পরিবারের দু-চারটে খবর তিনি জানতে চাইলেন। সব শুনে তিনি বললেন, 'মাত্র দুটো মাসের জন্যে পরীক্ষাটা বন্ধ করা উচিত নয়। একটা বছর নষ্ট হওয়া কি সোজা কথা? ভবতোষদের বাড়িতে থাকতে পারা যায় না?'

'আমার দিক থেকে কোন অসুবিধে ছিল না, কিন্তু মামার হয়তো আপত্তি হবে। এখন চলি, বড্ড দেরি হয়ে গেছে। আবার যখন কেষ্টনগর আসব, তখন আপনার সঙ্গে এসে দেখা করব।'

'বড্ড খুশি হয়েছি তোমাকে দেখে। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।'—ফাদার দুবোয়া চোখ বুজে মিনিটখানেক সময় মনে মনে মন্ত্র উচ্চারণ করলেন।

বাড়ি ফিরে শুনতে পেলুম, মামাবাবু একটু আগেই এসে গিয়েছেন। তিনি সঙ্গে ক'রে একজন ব্রাহ্মণ-পুরোহিত নিয়ে এসেছিলেন। বসু-পরিবারের প্রতিষ্ঠিত নারায়ণশিলা তিনি এখানে ফেলে যেতে পারেন না।

মামার কথা শুনে মাসীমা মন্তব্য করেছিলেন, 'নারায়ণশিলাও তো আপনার সঙ্গে কলকাতা যেতে পারেন।'

'পারতেন, কিন্তু সেখানে স্থানের বড় অভাব।'

'জয়ার যদি স্থানের অভাব না হয়, তা হ'লে তিন পোয়া ওজনের পাথরটুকুর জন্যে স্থানের অভাব হবে কেন ?'

'আপনি ব্যস্ত হবেন না, ব্রাহ্মণ-পুরোহিতের বাড়িতে প্রতিদিন তিনি পুজো পাবেন। আমি কলকাতা থেকে ব্রাহ্মণটিকে মাসে মাসে পাঁচ টাকা ক'রে পাঠাব।'

মাসীমার কাছ থেকে চাবি নিয়ে তিনি ঠাকুর-ঘর খুলে ব্রাহ্মণটিকে নারায়ণশিলা দিয়ে ব'লে দিয়েছেন যে, বাবা যদি কোনদিন এখানে এসে তাঁর নারায়ণশিলা ফিরে চান তো তাঁকে ফিরিয়ে দিতে হবে।

মামা যখন ও-বাড়ি থেকে ফিরে এলেন আমার তখন খাওয়া শেষ হয়ে গেছে। মাসীমা বললেন, 'এক মাস মাছ মাংস খাস নে জয়া। কলকাতায় কিন্তু শিক্ষিত লোকেরা ধর্ম মানে না। আমাদের কথা কি তোর মনে থাকবে ?'

'থাকবে মাসীমা। ভবতোষ ম্যাট্রিক পাস করলে ওকে কলকাতা পাঠিয়ে দিও।'

মামাকে দেখতে পেয়ে মাসীমা দরজার আড়ালে স'রে গেলেন। মামাকে অনুরোধের সুরেই তিনি বললেন, 'জয়াকে দুটো মাসের জন্যে আমার এখানে রেখে গেলে ভাল হ'ত। নইলে ওর তো আর পরীক্ষা দেওয়া হবে না। একটা বছর শুধু শুধু নষ্ট হবে।'

মামা বললেন, 'পরীক্ষার জন্যে মেয়েদের এত ঝঞ্ঝাট ক'রে লাভ কি? তা ছাড়া বছর তিন-চার পরে ওর বিয়ে আমি দিয়ে দেব। স্টেশনে যাওয়ার সময় হ'ল। ধারে-কাছে কোথাও ঘোড়ার গাড়ি পাওয়া যাবে না?'

মাসীমা বললেন, 'ভবতোষ ডাকতে গেছে। এখুনি সে পৌঁছে যাবে। আপনি কিছু খাবেন না? আপিসে যাওয়ার আগে উনি বার বার ক'রে—'

বাধা দিয়ে মামা বললেন, 'না না, আমি অপূর্বর ওখান থেকেই খেয়ে এসেছি।'

এই সময় ভবতোষ এসে বললে, 'গাড়ি এসেছে। জয়ার ট্রাঙ্ক আর বিছানাটা তুলে দেব কি?'

মাসীমা ভেতর থেকে বললেন, 'খোকা, মামাবাবুর বাক্সটাও তুলে দিস।'

মাসীমার পায়ের ধুলো নিয়ে আমি মামার পেছনে পেছনে এসে গাড়িতে উঠলুম। ভবতোষ আমার ট্রাঙ্ক আর বিছানাটা মাথায় নিয়েছে, আর মামাবাবুর সুটকেসটা নিয়েছে হাতে ঝুলিয়ে। গাড়োয়ান ওপর থেকে মালগুলো সব টেনে তুলে নিল। মামাবাবু আমায় বললেন, 'ওকে বল্ না ওপরে উঠে বসতে।' ভবতোষকে কিছু বলবার আগেই সে গাড়োয়ানের পাশে ব'সে পড়েছে।

স্টেশনে এসে পৌঁছবার একটু আগেই বড় মামা জিজ্ঞাসা করলেন, 'হ্যাঁ রে, তোর মামীমার কথা মনে পড়ে?'

'না, ছেলেবেলায় একবার দেখেছিলুম, কিন্তু এখন আর মনে নেই।'

'তোকে পেলে তাঁর খুব সুবিধেই হবে। শরীরটা ভাল নেই তাঁর। তবুও সংসারের সব কাজ তাঁকেই করতে হয়। এই যে স্টেশনে এসে গেছি।'

গাড়ি থামতেই মামা নেমে গেলেন। আমিও নামলুম। দুটো কুলী এসে দাঁড়াল মামার সামনে। তিনি বললেন, 'আমার সুটকেসটা আমিই নিতে পারব।'

ভবতোষ বললে, 'না না, আপনি বরং টিকিট কাটতে যান, আমিই সব মাল নিয়ে আসছি।'

'বেশ, বেশ।'—কুলী-ভাড়াটা বেঁচে গেল ব'লে মামা দ্রুতপদে ছুটে গেলেন টিকিট-ঘরের দিকে। কুলী দুটো অবাক হয়ে চেয়ে ছিল ভবতোষের দিকে। ভদ্রলোক বাঙালীকে এরা মাথায় ক'রে কোনদিনও মোট বইতে দেখে নি। আমি কিন্তু ভবতোষের দিকে চাইতে পারছিলুম না। গায়ের জোর বেশি ব'লে যদি ভবতোষ মোট বইত, আমার তাতে কোন আপত্তিই হ'ত না। আপত্তির কথা উঠেছে এই জন্যে যে, বড় মামা কুলী-ভাড়াটা বাঁচাবার জন্যে ভবতোষের মাথায় মোট চাপিয়ে দিতে দ্বিধা করলেন না।

ওয়েটিং-রুমে এসে বসলুম আমি। ভবতোষ মাথার মোট নামিয়ে রাখল আমার সামনে। ওয়েটিং-রুমে আরও অনেক লোক ছিল। তারা সব অবাক হয়ে ভবতোষের দিকে চেয়ে ছিল। ভবতোষ যেন সাবেক বাংলার বিদ্যাসাগরকেও হার মানিয়ে দিয়েছে!

মামার আসতে দেরি হচ্ছে দেখে আমি আঁচল থেকে সেই দশ টাকার নোটখানা খুলে ভবতোষকে দিয়ে দিলুম। ভবতোষ জিজ্ঞাসা করলে, 'মোট বইবার মজুরী না কি?'

'না, তুমি টাকাটা পকেটে রেখে দাও।'

ভবতোষ নোটখানা পকেটে রেখে দিল।

দশ মিনিট পরে ট্রেন এল। ভবতোষের মাথায় মোট তুলে দিতে মামা সাহায্য করলেন। গাড়িতে উঠে তিনিই ওর মাথার ওপর থেকে বিছানাটা টেনে নিলেন। বাকি মাল দুটো ভবতোষ গুছিয়ে রেখে দিল বেঞ্চের তলায়। গার্ড সাহেবের বাঁশি বেজে উঠতেই ভবতোষ লাফিয়ে নেমে গেল নীচে। আমি জানলা ঘেঁষে ব'সে ছিলাম। ভবতোষের কানের কাছে মুখ এগিয়ে বললুম, 'ম্যাট্রিক পাস ক'রে কলকাতায় এসো কিন্তু। চিঠি লিখো, ডাক-টিকিটের জন্যে তোমায় আমি দশটা টাকা দিয়ে গেলুম।'

ট্রেন বেরিয়ে গেল। প্ল্যাটফর্মের শেষ সীমা থেকে দেখলুম, ভবতোষ তখনও চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। দৃষ্টি তার আর গাড়ির দিকে নেই, মাথা নীচু ক'রে সে কি যেন ভাবছে। আমার কিন্তু মনে হ'ল, ভবতোষ ভাবছে না, ভবতোষ কাঁদছে।"

এতটা লেখবার পরে মিস জয়া বসু পরিশ্রান্ত বোধ করতে লাগলেন। ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলেন, প্রত্যূষ সমাগত। বেড-সুইচটা টিপে দিতেই আলো নিবে গেল। চতুর্থ রাত্রি শেষ হয়ে যাচ্ছে। কি এক অজ্ঞাত কারণে জয়া বসু ক্রমশই সুস্থ বোধ করছেন। এযাবৎকাল তিনি ভেবে এসেছেন যে, মানুষের স্বাস্থ্য থাকলেই তবে সে সুস্থ বোধ করে। কিন্তু জয়া বসু তাঁর স্বাস্থ্য হারিয়েও কার্শিয়ংয়ের উঁচুতে উঠে সুস্থ বোধ করছেন কি ক'রে?

বিছানা থেকে উঠলেন তিনি। পুবদিকের জানলাটাও খুলে দিলেন। প্রত্যূষের হাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই ভাল। ও-পাশের ঝাউগাছটার পাতাগুলো জানলার কাঁচ ছুঁয়ে থাকে। জয়া বসু জানলা খুলে এবার ঝাউপাতাগুলো হাত দিয়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে খেলা করতে লাগলেন। শিশিরভেজা পাতাগুলো মাঝে মাঝে তিনি ঠোঁট পর্যন্ত টেনে এনে হঠাৎ কি রকম অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিলেন···। না, থাক্,

পাতার মধ্যে কত আবর্জনা জ'মে আছে তা কে জানে! মিস জয়া বসু দেখলেন, পুব আকাশ একটু একটু ক'রে সাদা হয়ে আসছে। দিনের বেলায় ঝাউপাতা কেবল ঝাউপাতাই, রাত্রির মাদকতা সে দিনের আলোয় ধ'রে রাখতে পারে না।

জয়া বসু কি মনে ক'রে একবার নীচের দিকে দৃষ্টি ফেললেন। টুপ টুপ ক'রে বৃষ্টিবিন্দুর মত হিম পড়ছে। হিম তিনি চোখে দেখতে পেলেন না বটে, কিন্তু একটা মানুষের ছায়া যেন এসে থেমে গেল ঝাউগাছের গুঁড়িটার সঙ্গে হেলান দিয়ে। চমকে উঠলেন জয়া বসু। ছায়াটার সঙ্গে অমিতাভ সেনের কি অদ্ভুত সাদৃশ্য! বাঁ হাতের বগলের নীচে 'ক্রাচ' রেখে সে হাঁটে। বাঁ পাটা ওর কেটে ফেলতে হয়েছিল—প্রায় সবটাই কেটে ফেলতে হয়েছিল। দুনিয়া-সুদ্ধ লোক জানে, পা-টা কাটবার আগেই ওর শারীরিক ক্ষতি যা হয়েছিল তাতে আর অমিতাভ সেনকে পুরুষ না বললেও চলে। হাত-বোমাটা এসে লেগেছিল ওর জানুর ওপরে, কতটা ওপরে দুনিয়া-সুদ্ধ লোক সবাই তা জানে। বাঁ চোখটা ওর পাথর দিয়ে তৈরি। তবে একটা চোখ দিয়েই অমিতাভ যা দেখে, তা বোধ হয় খণ্ডিত বাংলার আড়াই কোটি লোক এক সঙ্গেও তা দেখতে পায় না। অমিতাভ সেন শিল্পী। উঁচুদরের শিল্পী। ফরাসী সেনাবাহিনী বেলজিয়াম সীমান্ত থেকে হ'টে যাবার সময় মঁসিউ অমিতাভ সেন ভীষণভাবে আহত হয়। হাত-বোমার টুকরো-টাকরা এসে লুটিয়ে পড়ে ডান হাতের ওপর। ফরাসী সার্জেন দ্বিতীয় বার চিন্তা না ক'রে ওর ডান হাতটা কেটে কোথায় যে ফেলে দিল অমিতাভ তা জানতে পারল না। তবু বাঁ হাত দিয়েই অমিতাভ যা ছবি আঁকে, তেমন ছবি ঠাকুর-বাড়ির অগণিত হাতও আঁকতে পারে নি। এ মন্তব্যটা জয়া বসুর নিজের।

অমিতাভ সেনের ঠাকুরদা থাকতেন চন্দননগরে। এটাই ছিল ওদের বংশ-পরিচয়ের পাকা ঠিকানা। বাবা ছেলেবেলায় প্যারিসে

গিয়েছিলেন পড়তে। সেখানেই তিনি জীবন কাটিয়েছেন। চন্দননগরে আর তিনি কোনদিনই আসেন নি। অমিতাভ জন্মগ্রহণ করে প্যারিসে, প্রতিপালিত হয় ফরাসী মায়ের কাছে। বাবার কাছে বাংলা শিখেছে বাঙালীর মত, মায়ের কাছে ফরাসী। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে অমিতাভর দেশে আসবার কথা ছিল। কিন্তু ফরাসীরা তখন নাৎসীদের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছে। অমিতাভর ফরাসী মা বললেন, যে ছেলে মাতৃভূমির জন্যে লড়তে চায় না, তাকে তার রক্ত-মাংসের মাও সন্তান ব'লে স্বীকার করে না।

যুদ্ধবিগ্রহের প্রতি অমিতাভর ছিল অপরিসীম ঘৃণা। ভারতীয় রক্ত, বিশেষ ক'রে বাঙালী রক্তের প্রভাব খুব বেশি ছিল ব'লেই অমিতাভ বিনা যুদ্ধেই ভূমি ছেড়ে দেওয়ার পক্ষপাতী। দু-এক বিঘে ভূমি না হয়ে যদি সারা ভারতবর্ষের আয়তনও হয়, তাও সে বিনা যুদ্ধে ছেড়ে দেওয়ার জন্যে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু ফরাসী মায়ের প্রভাবও কম ছিল না। অমিতাভকে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে যোগ দিতে হ'ল। ওর ভাগ্য খুব ভাল ছিল ব'লেই যুদ্ধের প্রথম দিকেই সে আহত হয়। এত বেশি ভাবে আহত হওয়াও ভাগ্যের খুব বেশি জোর না থাকলে হ'ত না। হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে অমিতাভ সোজা চ'লে এল মায়ের কাছে। রোমান কাথলিক মা। কিছুতেই তিনি দরজা খুলতে চান না। একবার দরজা খুলে তিনি চেহারাটা দেখেই ফস ক'রে দরজা বন্ধ ক'রে দিয়েছিলেন। মা গো, মানুষের আবার এমন বীভৎস চেহারাও হতে পারে! এমন কি মাও অমিতাভকে চিনতে পারেন নি। প্রায় আধ ঘণ্টা সংগ্রামের পর সে দরজা খোলাতে পারল। সন্তানের পরিচয় পেয়ে মা তো কেঁদে অস্থির। ঘরে ঢুকে সোফার উপর ব'সে পড়ল অমিতাভ। ডান পা-টা ছড়িয়ে দিল একেবারে টান ক'রে। কাঁদতে কাঁদতে মা ওর ডান পায়ে হাত দিলেন না, দিলেন বাঁ পায়ে। কিন্তু বাঁ পা কই? তিনি জানুর ওপর পর্যন্ত তাঁর অনুসন্ধিৎসু হাতের

পাঞ্জা তুলতে লাগলেন অত্যন্ত ধীরে ধীরে। জানুর সীমা প্রায় শেষ হয়ে এল। আতঙ্কে মায়ের বুক ধড়াস ধড়াস করতে লাগল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "কতটা পর্যন্ত গেছে রে?" কথা শেষ না হতেই সাইরেন বেজে উঠল। মা সহসা হাতটা নামিয়ে নিয়ে বললেন, "শিগগির চ'লে আয়।"

"কোথায়?"—জিজ্ঞাসা করল অমিতাভ।

"এয়ার-রেড-শেল্টারে।"

নিজেকে রক্ষা করবার আজ আর তাড়া নেই অমিতাভর। যেটুকু নিয়ে সে আজ এখানে ফিরে এসেছে, তার জন্যে এত ছোটাছুটির দরকার কি? যুদ্ধ শেষ হতে হতে কতটুকু গিয়ে কতটুকু থাকবে, সে সম্বন্ধে কেউ তো কিছু বলতে পারে না। সাইরেন বেজে বেজে থেমে গেল। নাৎসীদের উড়োজাহাজে আর বোমা নেই। সবগুলো ফেলে দিয়ে তারা দেশে ফিরে গেল। মা এয়ার-রেড-শেল্টারে যান নি, সন্তানকে যখন তিনি চিনতেই পেরেছেন তখন নিজের জীবন রক্ষা করবার জন্যে তিনি সেখান থেকে উঠলেন না। ব'সে রইলেন অমিতাভর পায়ের কাছে। তিনি অমিতাভর মধ্যে একটা অদ্ভুত ধরনের গাম্ভীর্য লক্ষ্য করলেন। পাথরের চোখটা স্থির হয়ে আছে, অন্য চোখটার মধ্যে রয়েছে একটা শূন্যতা। শূন্যতা এখনও ঠিক জেঁকে বসতে পারে নি, হালকা মেঘের মত ছুটে বেড়াচ্ছে। তিনি যেন ওর দৃষ্টির মধ্যে দেখতে পেলেন সংগ্রামের তুফান উঠেছে। এ সংগ্রাম ওর সেই শূন্যতার সঙ্গেই। অমিতাভর মধ্যে জন্ম নিচ্ছে নূতন দর্শন।

জানলার কাছে দাঁড়িয়ে জয়া বসু পুরনো সব কথা ভাবছিলেন। অমিতাভকে তিনি চেনেন। কেবল চেনেন বললে সত্য বলা হবে না, অমিতাভকে তিনি গভীরভাবে জানেন।

একটু আগেই তিনি যেন দেখতে পেয়েছিলেন, ঝাউগাছের

গুঁড়িতে একটা লোক তার ক্রাচটা ঠেকিয়ে রেখে নিজে হেলান দিয়ে দাঁড়াল সেইখানে। মনে হ'ল, অমিতাভ সেন এসে দাঁড়াল। পকেট থেকে সিগারেট বার ক'রে এক হাতেই দেশলাই জ্বালাবার চেষ্টা করতে লাগল সে।

কিন্তু অমিতাভই বা এত ভোরে এখানে আসবে কি ক'রে? তিনি নিজেই তো ওকে একদিন বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। সে কেন তবে কার্শিয়ং পর্যন্ত ছুটে আসবে?

গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে লোকটা সিগারেট খেতে লাগল। সিগারেটের আলোয় জয়া বসু দেখলেন, লোকটা সত্যিই অমিতাভ সেন। অসম্ভব নয়, অবিশ্বাস্য নয়, অমিতাভ সেন ওখানে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছে!

জয়া বসু উত্তেজনায় চঞ্চল হয়ে উঠলেন। আলনার ওপর থেকে একটা গরম কাপড় নিয়ে তাড়াতাড়ি গায়ে জড়িয়ে ফেললেন তিনি। হঠাৎ তাঁর পায়ে জোর বেড়ে গেল। তিনি কেবল সুস্থ বোধ করছেন না, স্বাভাবিক বোধ করছেন। দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন করিডোরে। বেশ লম্বা করিডোর। পেছন দিকের সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে গিয়ে তিনি দেখলেন, নিশীথ দাঁড়িয়ে আছে সিঁড়ির মুখে।

"এ কি সর্বনাশ করছ দিদিমণি? কোথায় যাচ্ছ?"

"নিশীথ, অমিতাভ এসেছে। স'রে যা নিশীথ!"

"আমায় বল, আমি ডেকে নিয়ে আসছি।"

"না, নিশীথ, একদিন আমিই তাকে তাড়িয়ে দিয়েছিলুম, আজ তাই ওকে অভিনন্দন ক'রে নিয়ে আসতে হবে আমাকেই। রাস্তা ছেড়ে দে নিশীথ।"

জয়া বসু কাঠের সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলেন নীচে। সত্যিই অমিতাভ ঝাউগাছে হেলান দিয়ে সিগারেট খাচ্ছিল! অবিশ্বাস করবার আর কিছু নেই।

জয়া বসু ক্রাচটা নিজের হাতে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "অমিতাভ, তুমি এখানে কি ক'রে এলে ?"

"হেঁটে হেঁটে এলুম তোমার সঙ্গে দেখা করতে।"

"এত ভোরে, এমন উঁচু-নীচু রাস্তায় একা একা কেন এলে ? কোথায় আছ ?"

"ওই যে বাড়িটা দেখছ, ওখানে ফাদার ডুবোয়া আছেন। তাঁদের গেস্ট হাউসে এসে উঠেছি। তুমি তো ফাদার ডুবোয়াকে একদিন চিনতে জয়া ?"

"সে তো অনেকদিন আগে। চেহারাটা আমার মনে নেই। চল এখানে আর নয়—ঘরে চল।"

একটু হেসে অমিতাভ সেন জিজ্ঞাসা করল, "তাড়িয়ে দেবে না তো ?"

জয়া বসু কোন উত্তর দিলেন না, কেবল বললেন, "এবার আমার কাঁধে ভর দিয়ে চল। কার্শিয়ংয়ে যতদিন থাকবে, আমিই তোমার ক্রাচ হয়ে রইলুম।"

বসবার ঘরে এসে বসল ওরা। জয়া বসু অমিতাভর পকেট থেকে সিগারেটের টিন বার ক'রে একটা সিগারেট তার মুখে দিলেন গুঁজে। তারপরে দেশলাই জ্বালিয়েও দিলেন তিনি।

নতুন রোমান্সের স্বাদ পেলেন মিস জয়া বসু। বোধ হয় পেলেনই। খুবই আশ্চর্য বোধ করছিলেন জয়া বসু। জীবনের শেষ দিনটা তিনি দেখতে পেয়েছিলেন ব'লে হিসেব ক'রে হাতের সময়টুকু খরচ করছিলেন। বেহিসেবী হ'লে সময়ের ক্ষতি আর এ জীবনে পূরণ হ'ত না। কিন্তু চতুর্থ রাত শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর হিসেবে যেন ভুল ধরা পড়ল। মনে হ'ল, শেষ দিনটা আর সন্নিকটে নেই। জীবনের মেয়াদ বাড়ছে। আজ তিনি কেবল সুস্থ নন, স্বাস্থ্যবতীও।

অমিতাভ জিজ্ঞাসা করল, "নিশীথকে সঙ্গে আন নি ?"

"এনেছি। এক্ষুনি তোমার জন্যে কফি নিয়ে আসবে।"

কথাটা শেষ হতে হতেই নিশীথ ট্রেতে সাজিয়ে কফির সরঞ্জাম নিয়ে এল। অমিতাভ জিজ্ঞাসা করল, "কেমন আছ নিশীথ?"

"ভাল আছি। আপনি ভাল তো?"

নিশীথ দু দিকের দুটো জানলা খুলে দিয়ে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মিনিট পাঁচেক পরে বাইরের দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে এসে অমিতাভ বলল, "তোমার লেক প্লেসের বাড়ি থেকে তাড়া খেয়ে আসবার পরে আমি আর ছবি আঁকি নি।"

"এতদিন তবে কি করলে?"

"কি যেন একটা খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম!"

"খুঁজে লাভ কি?"

"কেন?"

"খোঁজার সাধনায় হয়তো আরও বিশটা বছর যাবে নষ্ট হয়ে। তখন পেলেও ধ'রে রাখতে পারবে না।"

জয়া বসুর কথাটা উড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে উপস্থিত-আলোচনার উল্লেখ না ক'রে অমিতাভ বলল, "আমি আজকাল কার লেখা পড়ছি, জানো?"

"না তো! কেমন ক'রে জানব? তোমার সঙ্গে আজই আমার প্রথম দেখা। তা ছাড়া এই বয়সে কাউকে তুমি নতুন ক'রে খুঁজতে পার তা আমি সত্যিই বিশ্বাস করতে ভয় পাই।"

"তুমি কি জার্মান ভাষা শিখেছিলে, জয়া?"

"না।"

অমিতাভ তার কোটের পকেট থেকে একটা কবিতার বই বার ক'রে বলল, "রাইনর মারীয়া রিল্‌ক্‌-এর লেখা। তোমাকে আমি 'পিয়েতা' কবিতাটা প্রথম শোনাচ্ছি। পিয়েতা কথাটার অর্থ হচ্ছে, স্নেহমমতা।" এই ব'লে অমিতাভ বইটার পাতা ওলটাতে লাগল। এক জায়গায় এসে থেমে গেল সে। বইটার মাঝখানে একটা

আলাদা কাগজ রয়েছে। সেই দিকে চেয়ে অমিতাভ পড়তে লাগল :

এতদিনে দুঃখ আমার হ'ল পরিপূর্ণ আর অনির্বচনীয়,
তা যে দিচ্ছে ভরে আমাকে।
এক দৃষ্টিতে আমি তাকিয়ে আছি এখানে
যেমন ক'রে পাষাণের সত্তা তাকিয়ে থাকে।
পাষাণী হয়েও একটা কথা বুঝি :
তুমি বড় হয়ে পড়েছিলে
...আর বড় হয়েছিলে
যাতে, বড্ড বেশি ব্যথা হয়ে
আর আমার এই হৃদয়টার নাগালের নেহাতই বাইরে গিয়ে
তুমি যাতে এগিয়ে দাঁড়াতে পার।
আজ তুমি সোজা আমার কোল জুড়ে শুয়ে আছ,
আজ আর আমি তোমার
ভার সইতে পারছি না।

জয়া বসু এক দৃষ্টিতে চেয়ে ছিলেন অমিতাভর চোখের দিকে। কবিতা শেষ হওয়ার পর জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কি পাথরের চোখ দিয়ে আজকাল দেখতে পাও?"

"কেন?"

"মনে হ'ল, কবিতা পড়বার সময় পাথরের চোখটা তোমার জীবন্ত হয়ে উঠেছে। রহস্যটা কি, অমিতাভ?"

জয়া বসুর প্রশ্নের জবাব দিল না সে। হাসতে হাসতে অমিতাভ বলল, "কবিতাটা অনুবাদ করেছেন তোমারই প্রিয় কবি বীরেশ রায়। এটাই তাঁর শেষ লেখা। কোথাও প্রকাশিত হয় নি।...... কফি ঠাণ্ডা হয়ে গেল জয়া।"

হঠাৎ যেন আঘাত পেলেন মিস্ জয়া বসু। মুখ নিচু ক'রে পেয়ালায় কফি ঢালতে লাগলেন তিনি।

॥ পঞ্চম রাত্রি ॥

"রত্না, অমিতাভ এসেছে জানিস? আজ সমস্তটা দিন সে আমার এখানেই কাটিয়ে গেছে। সন্ধ্যের একটু আগে আমিই ওকে যেতে বললুম। নইলে ওর একেবারেই ইচ্ছে ছিল না ফাদার ড্রুবোয়ার গেস্ট হাউসে ফিরে যাওয়ার। আমি কিন্তু ওকে উৎসাহ দিতে পারলুম না।··· মানে, এখানে থাকবার জন্যে ওকে যে অনুরোধ করব তেমন সাহস আমার নেই। হাসছিস? ভাবছিস, লেক প্লেসের ফ্ল্যাটে যে-লোকটাকে তাঁবু ফেলতে দিয়েছিলুম, তাকে আজ কেন আমি এখানে থাকবার জন্যে অনুরোধ করতে পারলুম না? প্রশ্ন করবি, হঠাৎ আমার সাহসের অভাব ঘটল কি ক'রে? হয়তো জানতে চাইবি, আমার চারিত্রিক শুচিতা হঠাৎ কেন কার্শিয়ংয়ের পাহাড়ে এসে অবৈজ্ঞানিক হয়ে উঠল? কেবল অবৈজ্ঞানিকতার জন্যে নয়, প্রতিক্রিয়াশীলতার অপরাধে আমাকে তোরা অভিযুক্ত করতে দ্বিধা করবি না। কিন্তু আমি কি ক'রে তোদের বোঝাব রত্না যে, কুমারী জয়া বসু কোন কারণেই আজ আর লেক প্লেসের ফ্ল্যাটে ফিরে যেতে পারে না। আঃ কুমারী!! কুমারী নামের প্রতিধ্বনি যেন আমার সারাদেহে পুলকের তরঙ্গ তুলেছে। তুই তো জানিস, কুমারী-জীবনের প্রতি আমার কী রকম লোভ ছিল। সারা পৃথিবীর বিনিময়ে আজও আমি পারি না এতবড় ঐশ্বর্য ত্যাগ ক'রে আসতে। আজ সকালে অমিতাভ যখন রিল্‌ক্‌-এর 'পিয়েতা' কবিতাটা পড়ছিল, তখন আমার চোখের সামনে বার বার ক'রে কি একটা ছবি যেন ভেসে উঠছিল। কার ছবি ওটা? শেষের তিনটে লাইন থেকে কি একটা ছবি ফুটে উঠছে না, রত্না?

> আজ তুমি সোজা আমার কোল জুড়ে শুয়ে আছ,
> আজ আর আমি তোমার
> ভার সইতে পারছি না।

এ ভার কি কুমারী-জীবনের? তা তো নয়। রত্না, অমিতাভ চ'লে যাওয়ার পরে আমি যেন এই ছবিটা থেকে কিছুতেই চোখ ফেরাতে পারছি না। আমার ঘরের সবগুলো দেওয়াল জুড়ে যেন ছবি আঁকা রয়েছে। ভাবছিস আমার কোল জুড়ে কে আসবে? কে আসবে আমি নিজেও তা জানি না। তবুও মনে হয়, এলে ভাল হ'ত।"

মিস জয়া বসু কলমটা ফেলে রাখলেন কাগজের ওপর। শেষ লাইনটা লেখবার পরে তিনি মুখটা সরিয়ে নিয়ে এলেন ডান দিকে। চোখ দিয়ে জল পড়ছে তাঁর। জলের আঘাতে কালির অক্ষরগুলো ভেঙে গেলে রত্না হয়তো কত আজেবাজে কথাই না ভাববে। কিন্তু রত্নার কাছে কোন কিছু গোপন রাখবেন না ব'লেই তো তিনি আজ তাঁর জীবনের সব কাহিনী লিখতে বসেছেন।

মিস জয়া বসু তাঁর কুমারীত্বের নিষ্কলঙ্ক নিরাপত্তায় মুহূর্তপূর্বেও গর্ব বোধ করছিলেন। উপস্থিত তিনি তাঁর হাত দুটো ছড়িয়ে দিলেন ডবল খাটের চওড়া বিছানার ওপর। স্পর্শানুভূতির আলোড়ন রয়েছে আঙুলগুলোতে। কি যেন ধরতে চাইছিলেন তিনি। কেউ একজন কাছে থাকলে আঙুলগুলোতে শক্তি আসত তাঁর। অমিতাভর কথা ভাবতে ভাবতে জয়া বসু বিছানা থেকে উঠে এসে দাঁড়ালেন জানলার কাছে। ফাদার দুবোয়ার গেস্ট হাউস এখান থেকে কতদূর?

"কে?"—মিস জয়া বসু পেছন ফিরে প্রশ্ন করলেন।

"আমি।"—দরজা খুলে ঘরে এল নিশীথ।—"তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে এলুম, দিদিমণি।"

জয়া বসু কথা শোনবার জন্যে বিন্দুমাত্র আগ্রহ দেখালেন না। নিশীথের কথায় যে কোন মঙ্গল-সমাচার থাকবে না, তা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, অমিতাভর আকস্মিক আগমন

নিশীথ একেবারেই পছন্দ করে নি। ভবতোষের প্রতি ওর ছিল অকারণ আনুকূল্য, মাঝরাতে দরজা খুলে সে লেক প্লেসের ফ্ল্যাটে ভবতোষকে বসতে দিতে পারত, কিন্তু অমিতাভর বেলায় নিশীথ কোন-দিনই তেমন খাতির দেখাতে চায় না। কেন দেখাতে চায় না, সে কথা জিজ্ঞাসা করলে নিশীথ তার জবাব দেয় না। মিস জয়া বসু জানলার কাছ থেকে স'রে এসে বললেন, "তোর কথাটা এবার আমি শুনতে চাই, নিশীথ। ব'লে ফেল্।"

"অমিতাভবাবু তোমার ঠিকানা জানলেন কি ক'রে?"

"তা তো বলতে পারব না। নিশীথ, অমিতাভর প্রতি তুই এত বিরূপ কেন রে?"

নিশীথ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। কি একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে এসে শেষ পর্যন্ত কোন কথাই আর জিজ্ঞাসা করা হ'ল না। ঘর থেকে সে নিঃশব্দে বেরিয়ে যাচ্ছিল। জয়া বসু বললেন, "আর ভয় নেই নিশীথ। এত উঁচুতে উঠে কেউ আর আসবে না তোর দিদিমণির নামে কুৎসা রটাতে। তা ছাড়া···তা ছাড়া অমিতাভর শারীরিক দুর্ঘটনার খবর তো সবাই জানে।"

"সেই জন্যেই অমিতাভবাবুকে আমার পছন্দ হয় না।"—ফস ক'রে কথাটা ব'লে ফেলে দরজার মাঝখানে দাঁড়িয়ে রইল সে। কি করবে ভাবছিল। দিদিমণির মুখ থেকে একটা উত্তর শোনবার জন্যে নিশীথ অপেক্ষা করতে লাগল। নিশীথের বিশ্বাস, জয়া বসুর স্বাস্থ্য আবার ফিরে আসবে। বিয়ে হবে দিদিমণির। সংসার পাতবার সুযোগ তাঁর আসবে, আসবেই। কার্শিয়ংয়ের ডাক্তার প্রধানের সঙ্গে ওর এ নিয়ে আলোচনা হয়েছে। বৈজ্ঞানিক আলোচনা। মন্ত্র কিংবা মাদুলীর সাহায্যে যে জয়া বসু সংসার পাততে পারবেন না, সে সম্বন্ধে নিরক্ষর নিশীথ এক রকম নিশ্চিত হয়েছে। ডাক্তার প্রধানকে ও নেমন্তন্ন করে এসেছে দিদিমণির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবে ব'লে। হয়তো কাল

সকালেই তিনি আসবেন। আসা দরকার। কেবল বুকে একটু দাগ হয়েছে ব'লে গোটা দেহটাকে অকেজো ক'রে তোলার অর্থ কি? ডাক্তার প্রধান বলেছেন, কোন অর্থ ই নেই। তিনি দিদিমণিকে আরোগ্য ক'রে তুলবেন ব'লে নিশীথকে কথা দিয়েছেন। ডাক্তার প্রধানের কথা অবিশ্বাস করার মত মূর্খতা ওর নেই। বিলেত থেকে এক গাদা ডিগ্রী এনেছেন তিনি। খুব বড় পণ্ডিত ব'লেই তিনি এখনও বিয়ে করেন নি। এমন একটা সুন্দর পরিস্থিতির মধ্যে অমিতাভবাবু হঠাৎ কি ক'রে এসে উপস্থিত হলেন? নিশীথ প্রমাদ গুনলো—দরজার মাঝখানে দাঁড়িয়েই সে প্রমাদ গুনছিল। এমন সময় মিস জয়া বসু জিজ্ঞাসা করলেন, "কিছু বলবি?"

"কাল সকালে ডাক্তার প্রধান তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন।"

"আমার অসুখ তো এমনিতেই সেরে যাচ্ছে, ডাক্তারকে আবার ডাকতে গেলি কেন? তা ছাড়া কাল সকালে অমিতাভকে আমি চা খেতে বলেছি।"

"ডাক্তার প্রধান আসবেন বেলা এগারোটার সময়। তখন বোধ হয় অমিতাভবাবু থাকবেন না"—এই ব'লে নিশীথ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মিস জয়া বসু কি যেন ভাবছিলেন। সামনের দিকে হঠাৎ তিনি দৃষ্টি ফেলতেই দেখলেন যে, নিশীথ সেখানে নেই। তিনি বেশ একটু জোরেই ডাকলেন, "নিশীথ, নিশীথ—"

করিডোর থেকেই নিশীথ জিজ্ঞাসা করলে, "আমায় ডাকছ, দিদিমণি?—"

"হ্যাঁ। কাল দুপুরে অমিতাভবাবু এখানেই খাবেন।"

জয়া বসুর কথা শুনে নিশীথ পুনরায় ফিরে এল করিডোর থেকে। নিঃশব্দে এসে দাঁড়াল দরজার কাছে। জয়া বসু জিজ্ঞাসা করলেন, "আর কিছু বলবি?"

"না।"

"তবে আবার ফিরে এলি কেন?"

"মনে হ'ল তুমি আরও কি যেন বলতে চাইছ আমাকে।"

"না, এ তোর ভুল ধারণা। অমিতাভকে তুই পছন্দ করিস না ব'লে তোর মন আজ চঞ্চল হয়ে উঠেছে—"

নিশীথের ঘরের দরজা বন্ধ হওয়ার আওয়াজ পেলেন ব'লে মিস জয়া বসু শেষের কথাটা আর শেষ করলেন না। একটু পরেই তিনি এসে আবার রত্নার কাছে চিঠি লিখতে শুরু করলেন।

"খানিকটা সময় নিশীথ নষ্ট ক'রে দিয়ে গেল। তা হোক, আমার কাছে নিশীথের সাতখুনও মাপ।

রত্না, গতকাল যে তোর কাছে চিঠি দিয়েছি, তাতে আমার কলকাতা আসার কথা লেখা ছিল। প্রায় বিশ বছর আগে আমি বড়মামা ডক্টর যাদব মিত্রের সঙ্গে কলকাতা এলুম। ট্রেনের কামরায় ব'সে মামা আমার সঙ্গে আর কথা বলেন নি। কোটের পকেট থেকে একখানা ইংরেজী বই বার ক'রে তিনি তন্ময় হয়ে বইখানা পড়তে লাগলেন। প্রাচীন ভারতবর্ষের কোন এক বিশেষ যুগ সম্বন্ধে তিনি তখন গুরুতর গবেষণা নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। আমার পক্ষে ট্রেনযাত্রাটা সেই জন্যে খুবই আরামদায়ক হয়ে উঠল। কামরায় ব'সে নিশ্চিন্ত মনে কেষ্টনগরের কথা ভাবতে লাগলুম। গতকাল ভোরবেলাতেও মা বেঁচে ছিলেন। আজ তিনি নেই। পৃথিবীর কোথাও তাঁকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। মৃত্যুর মুহূর্ত পূর্বেও এমন একটা বাস্তব-সত্য হৃদয়ঙ্গম করা সহজ ছিল না, অথচ মা নেই ব'লে আজকে আমার জীবনের সব কিছু বদলে গেল চব্বিশ ঘন্টার মধ্যেই! কেষ্টনগরকে পেছনে ফেলে যেতে একটুও কষ্ট হচ্ছে না। ভবতোষকে মনে রাখতে হবে ব'লেই আমি আজও কেষ্টনগরের কথা ভুলি নি। নইলে—

'শেয়ালদা এসে গেছি।'—এই ব'লে বইটা বন্ধ ক'রে মামা বেঞ্চির তলা থেকে আমার ট্রাঙ্কটা টেনে বার করলেন। গাড়িটা থামতেই

একজন কুলি এসে উঠে পড়ল কামরায়। শেয়ালদা স্টেশনে ভবতোষ নেই—কুলির পয়সা বাঁচাতে পারলেন না ব'লে মামা মনে মনে যারপরনাই বিরক্তি বোধ করতে লাগলেন। তিনি তাঁর গলার স্বরে বিরক্তির ঝাঁজ মিশিয়ে বললেন, 'এত কি হাতীঘোড়া নিয়ে এলি কেষ্টনগর থেকে ?'

'কেন মামা, খুব বেশী ওজন নাকি ? দু-চারখানা কাপড় জামা ছাড়া আর কিছু নেই।'

'বলিস কি ! তবে এত ওজন কেন ?'—কুলির মাথায় ট্রাঙ্কটা তুলে দিতে দিতে প্রশ্ন করলেন মামা।

কি জবাব দেব ঠিক করতে পারলুম না।

কুলির গা ঘেঁষে ঘেঁষে তিনি হাঁটতে লাগলেন। মাঝে মাঝে বলতে লাগলেন, 'এই কুলি, উধার না, ইধার আও।' আমার দিকে পেছন ফিরে দু-তিনবার তিনি সাবধান ক'রে বললেন, 'জয়া, ব্যাটার দিকে চোখ রাখিস, মাল নিয়ে স'রে না পড়ে।'

টিকিট-কালেক্টারের হাতে টিকিট দুটো গুঁজে দিয়ে মামা বেরিয়ে এলেন প্ল্যাটফর্মের বাইরে। আমি তাঁর পেছনেই ছিলুম। মামাকে ডেকে বললুম, 'একটু দাঁড়াও মামা।'

'কি হ'ল ? ব'সে পড়লি কেন ?'

'স্যাণ্ডেলের চামড়া ছিঁড়ে গেছে।'

'স্যাণ্ডেল ?'—মামা মুখ ভেংচে জিজ্ঞাসা করলেন, 'স্যাণ্ডেল আবার কোত্থেকে নিয়ে এলি ?'

'কেষ্টনগর থেকে।'

'কই, আমি তো দেখি নি!'—মামার চোখে মুখে বিস্ময়ের আভাস।

স্যাণ্ডেলটা হাতে নিয়ে মামার পেছনে পেছনে আমি হাঁটতে লাগলুম। তিনি একটা ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করলেন। যেতে হবে হরিশ মুখার্জি রোডে।

গাড়িতে উঠে তিনি বললেন, 'তোর মামীমা কিন্তু সারাটা দিন ধর্মকর্মে ব্যস্ত থাকেন।'

'পুজো করেন বুঝি ?'

'হ্যাঁ। তাঁর সংসারে চামড়ার চল নেই। তিনি জুতো-টুতো পরেন না। বুঝলি ?'

'বুঝেছি মামা।' হাত থেকে ছু পাটি স্যাণ্ডেল ফেলে দিলুম রাস্তায়। বউবাজারের মোড়টা পার হয়ে যাওয়ার পরে হঠাৎ মামা আমায় বললেন, 'স্যাণ্ডেলটা কাগজ দিয়ে মুড়ে নিলেই চলবে। বুঝলি জয়া ?'

'বুঝেছি। কিন্তু স্যাণ্ডেল তো আর নেই।'

'নেই ?'—মামা যেন আকাশ থেকে পড়লেন।

'নেই। শেয়ালদা থেকে বেরিয়ে আসবার সময় ফেলে দিয়েছি।'

'ফেলে দিলি কেন ? ছুটো পয়সা খরচ করলেই রাস্তার যে-কোন একজন মুচি সেলাই ক'রে দিত। বোকা মেয়ে! কলকাতায় কি মুচির অভাব আছে ?'

'না মামা, মামীমার সামনে জুতো পায় দিয়ে কি আমি হাঁটতে পারি ? তিনি জুতো পরেন না, আমি কেন পরব ?' আমার কথা শুনে মামা খুব খুশি হলেন। কোচোয়ানকে বললেন, 'জলদি চলো। কলকাতার ঘোড়া ক্রমাগত চাবুক না খেলে ছুটতে চায় না, বুঝলি ?'

'বুঝেছি। হরিশ মুখার্জি রোড আর কত দূর মামা ? রাস্তাটা স্টেশনের কাছে হ'লে কত সুবিধে হ'ত। ভাড়া লাগত কত কম।'

মামা আলোচনা বন্ধ করলেন।

বাড়ির কাছে এসে তিনি বললেন, 'মামার বাড়িতে এলি বটে, কিন্তু মনে রাখিস, আমার অবস্থা তেমন ভাল নয়। সংসার চলে কষ্ট ক'রে। তার ওপর তোর মামীমার আবার শরীর ভাল নেই। এক গেলাস

জল খেলে পর্যন্ত হজম হতে চায় না। সংসারের কাজে মামীমাকে সাহায্য খানিকটা করতেই হবে। নামীনাথ, এই নামীনাথ—'

'নামীনাথ কে মামা?'

'ঠাকুর। এই যে। মালগুলো সব গুনে গুনে ভেতরে নিয়ে যা। দোতলায় তুলিস নে, নীচের ঘরটা সাফ ক'রে রেখেছিস তো?'

বাড়িটা দোতলা। নীচের তলায় মামীমা থাকেন। সবচেয়ে ছোট ঘরখানায় থাকে লক্ষ্মীর ছবি। পুজো করেন তিনি নিজেই। কিন্তু মামাকে একদিনও পুজো করতে দেখি নি। পুজো করবার সময়ও তিনি পেতেন না। দোতলার ছাদ জুড়ে মস্ত বড় একটা হলঘর আছে। এটা মামার লাইব্রেরি। কলেজে পড়াতে যাওয়ার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি এখানেই থাকেন। বিদ্যাচর্চার প্রতি তাঁর যে কী ভীষণ তন্ময়তা, এখানে না এলে তা কেউ বুঝতেই পারত না। দোতলার মামার সঙ্গে একতলার মামার ছিল আকাশপাতাল তফাত।

গাড়ি ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে মামা আমায় ভেতরে নিয়ে এলেন। মামীমা সামনেই দাঁড়িয়ে ছিলেন।

মামীমার পায়ের ধুলো নেবার জন্যে মাথা নীচু করতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু মামীমা বাঁ হাত দিয়ে আমায় রুখে দিয়ে বললেন, 'থাক্, থাক্'—

মামার বড় ছেলে নন্তু সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে আই. এস-সি. পড়ছিল।

আমি ভেতরে আসবার পরে নন্তু নিঃশব্দে স'রে পড়ল ওখান থেকে। আমার চেহারা দেখে ওর একটুও ভাল লাগে নি।

মামীমা এবার বললেন, 'ও-ঘরে গিয়ে জামা কাপড় বদলে আয়।' ঠিক কোন্ ঘরে যে যেতে হবে বুঝতে না পেরে আমি বললুম, 'নামীনাথ চলুক না আমার সঙ্গে।'

একটু পরেই একতলার স্থাপত্য-শিল্প বুঝে ফেললুম আমি। উঠোনের পুবদিক ঘেঁষে চারখানা ঘর পাশাপাশি সাজানো রয়েছে, অনেকটা

ব্যারাক-বাড়ির মত দেখতে। পশ্চিম দিকে রান্নাঘর, তার পাশে কলতলা। মাঝখানে খানিকটা ফাঁকা জায়গা, তারপরে ভাঁড়ারঘরের মত ছোট্ট একখানা ঘর। নামীনাথ আমায় এখানে নিয়ে এসে বলল, 'আজ থেকে তুমি এখানেই শোবে।'

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'তোমাদের খুব অসুবিধে হ'ল, না নামীনাথ?'

'কেন?'

'তোমাদের একখানা ঘর আমি নিয়ে নিলুম।'

বিছানাটা পেতে ফেললুম আমি। কাল রাত পর্যন্ত নামীনাথ এই চৌকিটা ব্যবহার করেছে। আজ থেকে ব্যবহার করব আমি। নামীনাথকে স্থানচ্যুত করলুম ব'লে মনটা বড্ড খারাপ লাগতে লাগল। রাত্রের খাওয়া শেষ হতে সেদিন প্রায় এগারোটাই বেজেছিল। মামীমা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'কেষ্টনগরে তোদের ক'টার সময় খাওয়া হ'ত রে?'

'রাত এগারোটার আগে তো নয়ই। সাড়ে দশটা অবধি আমি লেখাপড়া করতুম।'

'ও মা, তুই আবার কি লেখাপড়া করতিস?' অবাক হওয়ার মত মুখের ভঙ্গি ক'রে প্রশ্ন করলেন মামীমা।

ইত্যবসরে নামীনাথ আমার থালায় বেশ বড় বড় দু টুকরো পোনামাছ ভাজা দিয়েছে। মামীমা সেই দিকে দৃষ্টি ফেলে বললেন, 'ভাজা জিনিস আমার পেটে একরত্তি হজম হয় না। সিকি ইঞ্চি মাছ কোনরকমে চিবতে পারি—'

বাধা দিয়ে আমি তাড়াতাড়ি নামীনাথের দিকে চেয়ে বললুম, 'এতগুলো মাছ খাওয়ার অভ্যেস আমারও নেই। মামীমা, ওকে বলুন না মাছ দুটো তুলে নিয়ে যেতে। আমি তো এঁটো করি নি।'

'কেন রে? মাত্র দুটো মাছ, খেতে পারবি না? খা, খা, খেয়ে নে।'

'না, এক মাস আমার মাছ খেতে নেই।'

'ও, তাই তো! নামীনাথ!'—ডাকলেন মামীমা।

নামীনাথ সামনেই দাঁড়িয়ে ছিল। তিনি ঠাকুরকে বললেন, 'মাছ দুটো তুলে নিয়ে যাও। নামীনাথ, নন্তুবাবু কি আজ মাছ খায় নি?'

'খেয়েছে মা।'—জবাব দিল নামীনাথ।

'কখানা খেয়েছে?'

'চারখানা।'—আমার থালা থেকে মাছ তুলতে তুলতে জবাব দিল বামুন ঠাকুর।

মামীমা জবাব শুনে বললেন, 'মাছ যখন বেশী আনা হয়েছে, তখন ওকে ছখানা দিলেই তো পারতে। বুঝলি জয়া, ছেলেদের এই তো খাবার বয়স। সতেরো বছর বয়সে ছখানা পোনামাছের টুকরো খাওয়া এমন আর বেশী কি হ'ল, বল্?'

আমি কিছুই আর বললুম না। নিঃশব্দে বাকি সময়টুকু তরকারি দিয়ে ভাত মেখে খেতে লাগলুম। মনে হ'ল, নামীনাথ যেন একদৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে আছে। চেয়ে চেয়ে সে দেখছিল কি? আমার ভবিষ্যৎ?

ঘরে ঢুকে আমি যেন দরজা বন্ধ করতে ভুল না করি সেজন্যে মামীমা আমায় বার বার ক'রে সাবধান ক'রে দিলেন। হরিশ মুখার্জি রোডে চোর ডাকাতের অভাব নেই। দরজা বন্ধ করতে আমার অবিশ্যি ভুল হ'ল না।

বিছানার ওপর ব'সে পড়লুম আমি। রাস্তার দিকের জানলাটা খোলা ছিল। সন্ধ্যেবেলা থেকে টিপ টিপ ক'রে বৃষ্টি পড়ছিল। কি মনে ক'রে জানলার কাছে এগিয়ে বসলুম। বোধ হয় ঠাণ্ডা বাতাসটা গায়ে লাগাতে ভাল লাগছিল আমার। কিংবা নতুন দেশের নতুন হাওয়া আমায় আকর্ষণ করছিল অমিতবিক্রমে। কলকাতার আকর্ষণ উপেক্ষা করবার মত সংসাহস গত বিশ বছরের মধ্যে আমি অর্জন করতে পারি নি, রত্না। সেদিন সেই অন্ধকূপের মত ছোট্ট ঘরখানাতে ব'সে আমি কলকাতার জগৎটাকে দেখতে পেয়েছিলুম পরিষ্কারভাবে।

কেষ্টনগরে ফিরে যাওয়ার উপায় আমার ছিল না। তাই সেই জগৎটার অন্ধকার আমায় গ্রাস করতে লাগল প্রতি পলে পলে। আমি ঘুমিয়ে পড়লুম জানলার পাশে, প্রাচীরের গায়ে হেলান দিয়ে।

সহসা ঘুম ভেঙে গেল। বাইরে থেকে জানলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে কে যেন আমায় ধাক্কা দিয়ে বলছে, 'দিদিমণি, জানলা বন্ধ ক'রে দাও। বৃষ্টির জলে বিছানা তোমার ভিজে গেল যে।'

'কে? কে?'—চোখ রগড়ে চেয়ে দেখি, নামীনাথ জানলার ও-পাশে দাঁড়িয়ে আছে। বৃষ্টির জলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজছে হিন্দুস্থানী নামীনাথ। বোধ হয় আমি ঘুমিয়ে পড়বার পরেই খুব জোরে বৃষ্টি নেমেছে। জানলা দিয়ে চেয়ে দেখলুম, রাস্তায় জল জমেছে অনেক।

নামীনাথকে বললুম, 'জলে দাঁড়িয়ে ভিজছ কেন, ভেতরে চ'লে এস।'

'না দিদিমণি। জল এক্ষুনি থেমে যাবে।'

'শোবে কোথায় নামীনাথ?'

'ওই তো ওখানে একটা বেঞ্চি প'ড়ে আছে।'—এই ব'লে সে ওখান থেকে স'রে যাচ্ছিল। রাস্তার উল্টো দিকে উড়িয়াদের একটা পান-সিগারেটের দোকান ছিল। আমি দেখলুম, দোকানটার সামনে একটা বেঞ্চি রয়েছে। দোকানের গা থেকে একটা টিনের ছাউনি এসে ঝুঁকে পড়েছে রাস্তার ওপর। বেঞ্চিটা পাতা ছিল সেই ছাউনিটারই তলায়। যাওয়ার সময় নামীনাথ আমায় বললে, 'কোনও ভয় নেই, দিদিমণি। আমি তো সামনেই রইলাম।'

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'এখানে চোর-ডাকাত আসে না কি?'

'না, রাত্রিবেলা তোমার ঘরে ইয়া বড় বড় ইঁদুর আসে—বড্ড বেশী ছোটাছুটি করে।'

'ঘরে তো কিছুই নেই, ছোটাছুটি করে কেন নামীনাথ?'

'তোমার চৌকির তলায় মা তরকারি রাখেন। বর্ষাকালে আলুর

দাম চ'ড়ে যায় ব'লে বাবু কলেজ থেকে ফেরবার মুখে কদিন আগে দু মন আলু কিনে এনেছিলেন। বালির সমুদ্রে আলুগুলো সব ডুবে আছে দিদি। জল থেমে গেছে, আমি চলি। দরকার হ'লে ডাক দিয়ো।'

খোলা জানলা দিয়ে আমি স্পষ্ট দেখতে পেলুম নামীনাথকে। কোমর থেকে গামছাটা খুলে নিয়ে সে শুয়ে পড়ল বেঞ্চিটার ওপর।

বাকি রাতটুকু আর ঘুম এল না। আলো জ্বালাতেই দেখি, বেড়াল-বাচ্চার মত বড় বড় দুটো ইঁদুর নর্দমা দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল। দরজা বন্ধ করতে মামীমা আমায় বার বার ক'রে সাবধান ক'রে দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু নর্দমার মুখ তো বন্ধ করতে বলেন নি। কি জানি, দু মন আলুর হিসেব করতে গিয়ে কোনদিন যদি ওজনে কিংবা সংখ্যায় কম পড়ে তা হ'লে আমাকেই হয়তো তার জবাবদিহি করতে হবে। কেষ্টনগরেই বুঝতে পেরেছিলাম যে বড়মামা টাকাপয়সা সম্বন্ধে খুবই সতর্ক—একাধিক সাম্রাজ্য পতনে তিনি বিচলিত হন না, কিন্তু ইঁদুরের পেটে আলুর অন্তর্ধান হ'লে তিনি উদ্বেলিত হয়ে ওঠেন।

বিছানায় ব'সে মনে মনে আমি শঙ্কিত হয়ে উঠলাম। ঐতিহাসিক ডক্টর যাদব মিত্রের ভাঁড়ারঘরে সম্ভবত নতুন ইতিহাস তৈরি হচ্ছে।"

॥ ষষ্ঠ রাত্রি ॥

"কাল তোকে লিখেছিলাম যে, মামার বাড়ির ভাঁড়ারঘরে ইতিহাস তৈরি হচ্ছে। আশা করি, হালকা রসিকতা ভেবে কথাটাকে উড়িয়ে দিস নি। উড়িয়ে দেবার মত কথা এটা নয়। কেবল ভাঁড়ারঘরে কেন, এ বাড়ির সর্বত্রই বুঝি প্রতি মুহূর্তে ইতিহাসের তথ্য পুঞ্জীভূত হয়ে উঠছে! এ ইতিহাস পতনের, উত্থানের নয়। ভারতবিখ্যাত ঐতিহাসিক ডক্টর যাদব মিত্রের সাম্রাজ্যে সবাই মৃত। দোতলার লাইব্রেরি-ঘরে ব'সে তিনি বিগত দিনের রাজা-বাদশাদের কাহিনী লেখেন। মৃতদেহের কাহিনী। কাহিনীর মধ্যে কোথাও একটি ভুল নেই। তারিখ এবং তথ্যের তালিকায় অধ্যাপক যাদব মিত্রের নির্ভুল-গবেষণা নিরক্ষর ভারতবাসীর কাছে ছিল গর্বের বিষয়।

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই তিনি নেমে আসেন নীচে। আমার ঘরের কাছে এসে অত্যন্ত মৃদু গলায় ডাকেন, 'জয়া, জয়া, ঘুমচ্ছিস নাকি?'

'না, মামা। আসছি।'

জগুবাবুর বাজারে গিয়ে পৌঁছুতে আমাদের মাত্র পাঁচ মিনিট লাগে। কিছু তরকারি আর আধ সের মাছ কিনতে মামার সময় লাগে প্রায় এক ঘণ্টা। প্রত্যেকটি দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি দাম নিয়ে মেছোদের সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক করেন। অর্থশাস্ত্রের 'চাহিদা ও আমদানী' আইনটি মামার মুখস্থ ছিল ব'লে তিনি বাজারে এসে মেছোদের সঙ্গে তর্ক ক'রে জেতবার চেষ্টা করতেন। প্রায় প্রত্যেক দিনই হয়তো তাঁরই জিত হ'ত, কিন্তু মাছের দাম তাতে এক পয়সাও কমত না।

আমি আসবার আগে মামা নিজেই বাজার ক'রে নিয়ে আসতেন। বাড়িতে তাঁর চাকর ছিল না। ঝি ছিল একজন সারাদিনের জন্যে।

মাঝে মাঝে তিনি নামীনাথকে বাজারে পাঠাতেন। কিন্তু তিনি ওর ওপর নির্ভর করতে পারতেন না। মামার ধারণা ছিল যে, নিরক্ষর লোকেরা সংসারের সর্বত্রই ঠকে। জগুবাবুর বাজারের মত একটা সাংঘাতিক জায়গায় নামীনাথ যে ঠকে এসেছে, সে সম্বন্ধে মামার কোন সন্দেহই থাকত না। তা ছাড়া নামীনাথ তো ইকনমিক্সের কোন আইন জানে না, অতএব সে তো ঠকবেই।

মামা আমায় বাজারে নিয়ে যেতেন। সওদা যা কিনতেন, আমরা দুজনে তা ভাগ ক'রে বাড়ি পর্যন্ত ব'য়ে নিয়ে আসতুম। বাজারে যাওয়ার পথে মামা প্রত্যেক দিনই আমায় বলতেন, 'নিজেদের খাবার নিজেরা ব'য়ে নিয়ে আসব, তাতে লজ্জার কি আছে ?'

'লজ্জা ? লজ্জা কেন মামা ?'

'ওই তো আজকালকার ছেলেরা সব বাজারে যেতে লজ্জা পায়। ভাড়াটে লোক দিয়ে কখনো বাজার করানো চলে ?'

'না, তা চলে না। কিন্তু কোন্ ছেলেরা বাজার করতে লজ্জা পায় মামা ?'

'আরে, ওই তো তোর নন্তুদার কথা বলছি। ছেলেটা বেলা আটটা পর্যন্ত ঘুমোয়, অথচ বাজারে যাওয়ার নাম করলেই আত্মসম্মান নাকি সব তার গ'লে যায়! জয়া, তুই মেয়ে না হয়ে যদি ছেলে হতিস ?'

'মেয়ে হয়েছি ব'লে তোমাদের কোন অসুবিধে হচ্ছে নাকি ?'

'না, না, তোর মত এমন কাজের মেয়ে বাংলা দেশে বোধ হয় আর একটিও নেই।'

'নেই ? হয়তো এক গাদা আছে, তোমার সঙ্গে দেখা হয় নি।'

আমার মুখের দিকে চেয়ে ডক্টর যাদব মিত্র সহসা হেসে ফেললেন।

ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠে একদিন পাঁজি দেখছিলুম। সব চেয়ে কম দাম দিয়ে পাঁজিখানা মামা কলেজ স্ট্রীটের ফুটপাথ থেকে কিনে

এনেছিলেন। তিনি একদিন আমায় বললেন, 'জয়া, আজ আর আমরা মাছ কিনব না।'

'কেন মামা?'

'বাজারে আজ মাছের দাম চড়বে। চাহিদার চেয়ে আমদানি হবে কম। বিয়ের তারিখ কিনা। পাঁজিটা এবার থেকে তোর কাছেই থাকবে। বিয়ের তারিখগুলো আমায় স্মরণ করিয়ে দিস। বুঝলি?'

'বুঝেছি।'

সেই থেকে সকালবেলা উঠে প্রতিদিন আমায় পাঁজি দেখতে হয়। একদিন ভুল ক'রে পাঁজি দেখতে পারি নি। কিন্তু বাজারে পা দিয়েই মামা আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'পাঁজি দেখতে ভুল করিস নি তো?'

'ঠিকই দেখেছি।'—সভয়ে জবাব দিলুম আমি।

'মনে হচ্ছে আজও বিয়ের তারিখ আছে।'—এই ব'লে মামা মাছের বাজারে গিয়ে ঢুকলেন। মাছ সেদিন সত্যিই খুব আক্রা ছিল। দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি আমায় বেশ খানিকটা রাগের সুরেই বললেন, 'তুই মিছে কথা বলেছিস জয়া।'

'কেন মামা?'

'হয় তুই পাঁজি দেখিস নি, নয় তো পাঁজি ভুল। আজ নিশ্চয়ই বিয়ের তারিখ।'

আমি জবাব দিলুম না। দোকানীই মামার কথা শুনে বলল, 'আজ্ঞে, আজ যে জামাই-ষষ্ঠী। সেই জন্যই জিনিসপত্র সব আক্রা।'

দোকানীর কথা শুনে মামা প্রায় বাজার থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন।

তিনি বললেন, 'সর্বনাশ করেছে! আজ তো তা হ'লে কোন জিনিসেই হাত দেওয়া যাবে না জয়া। তোর মামীমাকে বলিস, আজ আমরা সব আলুভাতে আর পাটনার মসুর ডাল দিয়ে ভাত খাব। মসুর ডালের সবটুকুই তো প্রোটিন। ওঃ, তুই তো আবার প্রোটিনের

মানে জানিস না!' এই ব'লে মামা খুব তাড়াতাড়ি হাঁটতে লাগলেন তরকারির বাজারের দিকে।

হরিশ মুখার্জি রোডে তিনটে মাস কেটে গেল, কিন্তু ইস্কুলে ভর্তি করবার জন্যে মামার কিংবা মামীমার কোন আগ্রহ দেখা গেল না। ঘুম থেকে উঠে মামার সঙ্গে বাজারে যাই। ফিরে এসে মামীমার ফুটফরমাস খাটি, মাছ এবং তরকারি সব কেটেকুটে দিয়ে নামীনাথকে বুঝিয়ে দিতে আমার প্রায় দু ঘণ্টা লাগে। আমি আসবার পরে, মামীমার শরীর আরও খারাপ হয়েছে। বেলা আটটা পর্যন্ত তিনি বিছানায় শুয়ে থাকেন। আমি আসবার পর নন্তুদারও নাকি ঘুমের নেশা বেড়ে গেছে অত্যন্ত বেশী পরিমাণে। রান্নাবান্নার কাজ সব নামীনাথকে বুঝিয়ে দিয়ে নন্তুদার ঘরের বাইরে থেকে আমি ডাকি, 'নন্তুদা, বেলা আটটা বেজে গেছে।' সেখান থেকে ঢুকে পড়ি মামীমার ঘরে।

সেদিন সকালবেলা নন্তুদার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে তিন-চারবার ডাকলুম, কিন্তু তার সাড়া পেলুম না। দরজাটায় হাত লাগাতেই দেখি যে, দরজাটা খুলে গেল। বিছানায় শুয়েই নন্তুদা ডাকল, 'জয়া, এদিকে আয়।'

'তুমি জেগে আছ না কি? রাত্রিতে দরজা বন্ধ করো নি?'

'না।'

'কেন? তোমার ভয় করে না নন্তুদা?'

'না।'

বিছানার পাশে গিয়ে দাঁড়াতেই নন্তুদা আমায় একটা হেঁচকা টান দিয়ে বসিয়ে দিল খাটের ওপর। ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারলুম না। আমি তাই জিজ্ঞাসা করলুম, 'কি চাই তোমার, নন্তুদা?'

আমার কথার জবাব না দিয়ে সে একদৃষ্টিতে চেয়ে রইল আমার দিকে।

বিছানায় ব'সে হঠাৎ কেন যেন আমি ভবতোষের কথা ভাবতে লাগলুম। তিন মাস হয়ে গেছে, ভবতোষের কাছ থেকে একটা চিঠিও পাই নি। ডাক-টিকিটের অভাব ঘটতে পারে ব'লেই আমি তাকে দশটা টাকা পর্যন্ত দিয়ে এসেছিলুম। মানুষ পুরুষ হয়ে জন্মালেই কি অকৃতজ্ঞ হয়?

রঞ্জা, আমাদের পাশের বাড়ির বৌটি ঠাকুরঘরের দরজা বন্ধ ক'রে সকাল-সন্ধ্যে স্বামীর ফোটো পুজো করেন দু'বেলা মিলিয়ে চার ঘণ্টা! এ পুজো কেন? এঁরা শাক্ত—শক্তির পূজা এঁদের পুণ্য সঞ্চয়ের প্রিয়তম পথ—সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম। স্বামীর ফোটোখানা কালীর ফোটোর পাশে টাঙিয়ে রাখার অর্থ কি? শক্তি ভিক্ষা কার জন্যে? শুনেছি, স্বামী তাঁর সকাল বিকেল নিজের বুক চিরে কালীর পায়ে দু'ফোঁটা রক্তদান করেন। মাসিক দেড় হাজার টাকা মাইনে না পেলে তিনি দু'ফোঁটা রক্তের লোকসান কিছুতেই পূরণ করতে পারতেন না। তা ছাড়া বুক চিরলেই যে সব বাঙালীর বুক থেকে রক্ত বেরয় না, সে খবর তোরা রাখিস না বটে, আমি রাখি। গল্পের মাঝখানে হঠাৎ তোকে এমন ক'রে চমকে দিলুম ব'লে আমায় তুই ক্ষমা করিস।

ভবতোষের কথা ভাবতে গিয়ে নন্তদার বিছানার ওপর কতক্ষণ যে নিঃশব্দে ব'সে ছিলুম আজ আর তা মনে নেই। খানিকক্ষণ পরে নন্তদা আমার হাতের ওপর চাপ দিয়ে বলল, 'তুই কিন্তু বেশ ভালই আছিস জয়া।'

'কেন?'

'তোর তো আর লেখাপড়ার ঝক্কি নেই!'

লেখাপড়ার কথা উল্লেখ করতেই আমার চোখ ভেঙে জল আসবার উপক্রম! এখানে এসে লক্ষ্মীর পাঁচালী ছাড়া আমার আর কিছু পড়বার সুযোগ আসে নি। আমি এখানে আসবার আগে মামীমা নিজেই পড়তেন। কিন্তু বানান ক'রে পড়তে হ'ত ব'লে তাঁর পুজো

শেষ করতে সময় নিত অনেক। পুজো না করলে যে হিন্দুদের পাপ হয় তেমন মন্তব্য আমি মামীমার কাছে প্রত্যেক দিনই শুনতুম। কিন্তু বেশীক্ষণ পুজো করতে বসলে যে মামীমার কোমরে ব্যথার আক্রমণ তীব্রতর হ'ত সে সংবাদ তিনি না বললেও আমি জানতাম। অতএব আমি আসবার পরে তিনি পাঁচালী পড়বার কষ্ট থেকে নিষ্কৃতি পেলেন। এবং সুন্দর ক'রে পাঁচালী পড়বার গুণের জন্যে মামীমা যে আমায় ভাল লোকের সঙ্গে বিয়ে দিতে পারবেন তেমন প্রতিশ্রুতি আমি তাঁর কাছ থেকে অন্তত ত্রিশবার পেয়েছি।

তিনি বলতেন, 'হিন্দুদের পুজো-আচ্চা নিয়ে থাকাই ধর্ম।' মামা কাছে থাকলেও তিনি মামীমার কথার কোনদিনও প্রতিবাদ করতেন না। উপরন্তু, মামা যেন মামীমার কথায় সমর্থন করতেন ব'লে মনে হ'ত। মামীমার মন্তব্য শুনে আমি একদিন তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'পাঁচালী পাঠ করলেই যে ধর্মপালন করা হয়, তেমন যুক্তি কি সত্যি ?'

'আলবৎ সত্যি।'—মামীমা তেড়ে উঠে জবাব দিলেন।

'তা হ'লে গত তিন মাস থেকে তুমি কিন্তু ধর্ম পালন কর নি, মামীমা।'

'কেন ?'

'কারণ, পাঁচালী পাঠ করছি আমি।'

'পুজো-আচ্চার কথা নিয়ে তুই ঠাট্টা করছিস নাকি, জয়া ?'

'না। বোধহয় তুমিই আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছ।'

ধার্মিক মামীমা রাগে থরথর ক'রে কাঁপতে লাগলেন। কাঁপতে কাঁপতেই তিনি প্রশ্ন করলেন, 'ঠাট্টার কথাটা কি শুনি ?'

সত্যি কথা বলতে কোনদিনও আমি ভয় করতে শিখি নি। অতএব আমি বললুম, 'আমাকে দিয়ে পাঁচালী পাঠ করিয়ে পুণ্য সঞ্চয় করছ তুমি এবং তোমরা। এটা ঠাট্টা নয় তো কি ? মামীমা, আমি তোমাদের বাসন মেজে দেব, তোমার কোমর টিপে দেব, বাজার ক'রে

দেব, আর যা যা বলবে সব ক'রে দেব। আমি পুণ্য চাই নে, ধর্ম চাই নে—'

'কি চাস, বজ্জাত মেয়ে?' বাধা দিয়ে মামীমা ধমকে উঠলেন।

'পড়তে চাই, পাঁচালী নয়, ইস্কুলে।'

আমার মুখ থেকে এতবড় অধর্মের কথা শুনে মামীমা পুনরায় প্রশ্ন করলেন, 'পাঁচালীর চেয়ে ইস্কুলের বই বড় হ'ল?'

'হ্যাঁ। বড়মামাকে দেখেও কি সেটা তুমি বুঝতে পারছ না, মামীমা?'

'পুরুষমানুষদের কথা ছেড়ে দে। ওঁরা বাইরে বাইরে ঘোরেন ব'লে সংসারের অনেক কাজই করতে পারেন না। কিন্তু মেয়েদের তো তেমন অজুহাত দেওয়া চলে না। মেয়েদের ধর্মকর্মে মন না থাকলে পৃথিবীটা যে বাসের অযোগ্য হয়ে উঠবে, জয়া? পুরুষদের সাতখুনও মাপ।'

তারপর অনেক দিন কেটে গেছে। বয়সও বেড়েছে আমার। কিন্তু মামীমার এই কথাগুলো কোনদিনও মন থেকে মুছে যায় নি। কেন যে পুরুষদের সাতখুনও মাপ, তা আমি ভাই, আজও বুঝতে পারি না। ধর্ম পালন করা কি কেবল মেয়েদেরই কর্তব্য ব'লে বিবেচিত হয়? বড়মামাকে আমি কোনদিনও পুজো-আচ্চা করতে দেখি নি। পুজো-আচ্চার প্রতি মামার যে বিন্দুমাত্র আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল, তেমন বিশ্বাস আমার কোনদিনই হয় নি। অথচ বাইরের আড়ম্বর বজায় রাখবার জন্যে তিনি কী না করতেন! দেবদেবীদের নিয়ে কেউ যদি কখনো ঠাট্টা করত, তা হ'লে মামা তার সঙ্গে কলেজ কামাই ক'রেও তর্ক করতেন। তর্ক ক'রে তিনি বোঝাতে চাইতেন যে, তাঁর মত সৎ হিন্দুর সংখ্যা ভারতবর্ষে বড় কম নেই। অথচ মামীমা যখন পুজো নিয়ে ব্যস্ত হয়ে থাকতেন, বড়মামা কখনো ভুল ক'রেও একবার ঠাকুর-ঘরে উঁকি দিয়ে পুণ্য সঞ্চয়ের চেষ্টা করতেন না। বরং তাঁর কথাবার্তা শুনলে মনে হ'ত

যে, পুজোপার্বণ ইত্যাদি ব্যাপারগুলো মেয়েদের কাজ ব'লেই তিনি বিশ্বাস করতেন। আমি তো মামার সঙ্গেই বাজারে যেতুম। পুজোর জন্যে তিনি সবচেয়ে কম দামের জিনিস কিনে নিয়ে আসতেন। কলা কিনতেন দু-তিন ইঞ্চির চেয়ে লম্বা নয়। খোসা ছাড়াতে গিয়ে তিন-চারটে কলা নষ্ট হয়ে যেত। শসা কিনতে গিয়ে মামা বেছে বেছে সবচেয়ে খারাপ শসা কিনতেন নামমাত্র মূল্যে। বাড়ি ফেরবার মুখে মামাকে একদিন আমি জিজ্ঞাসা করেছিলুম, 'যে সব জিনিস আমরা নিজেরা খেতে পারি নে, তা কি ঠাকুর-দেবতাকে দেওয়া যায়, মামা?'

মামা তখন রসা রোড পার হচ্ছিলেন। রাস্তার ও-পারে গিয়ে তিনি বললেন, 'এসব জিনিস থেকে তো প্রসাদ তৈরি হবে। প্রসাদের কোন কোয়ালিটি থাকে না। উনোনের ছাই যদি কেউ প্রসাদ ব'লে নিয়ে আসে, তবে তাও ভক্তির সঙ্গে বিনা প্রতিবাদে গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু তুই এসব ধর্মের কথা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিস কেন? তুই বুঝতে পারবি নে।'

'কেন মামা?'

আমরা তখন প্রায় বাড়ির কাছে এসেই পড়েছি। বাইরের ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে মামা বললেন, 'এসব কথা বুঝতে হ'লে লেখাপড়া শিখতে হয়। তুই তো লেখাপড়া করিস না, জয়া।'

'সে কি মামা, আমি তো লক্ষ্মীর পাঁচালী পড়ি!'

একটু হেসে বড়মামা ডক্টর যাদব মিত্র বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়লেন। এ সম্বন্ধে তিনি আর আলোচনা করলেন না।

আজ আবার নন্তুদা ভোরবেলায় আমায় বলল যে, আমি বেশ ভালই আছি। কারণ, আমার লেখাপড়ার কোন ঝক্কি নেই। নন্তুদার কথা শুনে আমি আর চোখের জল রুখে রাখতে পারলুম না। লেখাপড়া করতে পারছি নে ব'লেই যে দুঃখের বোঝা আমার প্রতিদিন অসহনীয় হয়ে উঠছে, তেমন কথা হরিশ মুখার্জি রোডের কাকে আমি বোঝাই

বল্ ? ঘর ঝাঁট দেওয়া কিংবা বাসনকোসন মাজাই তো আমার একমাত্র কাজ নয় ! আমার চোখে জল দেখতে পেয়ে নন্তুদা জিজ্ঞাসা করল, 'কাঁদছিস কেন ?'

নন্তুদার কথার জবাব দিলুম না। চুপ ক'রে রইলুম খানিকক্ষণ। চুপ ক'রে রইলুম বটে, কিন্তু নন্তুদা বার বার ক'রে সেই একই প্রশ্ন করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত আমি বললুম, 'নন্তুদা, আমি কাঁদছি কেন জানো ? আমি লেখাপড়া করতে চাই—আমায় তোমরা ইস্কুলে ভর্তি ক'রে দাও। ইস্কুল থেকে ফিরে এসে আমি তোমাদের সব এঁটো বাসন মেজে দেব। নন্তুদা, তোমরা জানো না, কেষ্টনগরে আমি প্রতি বছর প্রথম হয়ে ওপরের ক্লাসে প্রমোশন পেয়েছি।' আমার কথা শুনে নন্তুদা বিছানায় উঠে বসল। চওড়া বুকটা তার আমার দিকে তুলে ধ'রে সে চেয়ে রইল বিস্ময়ের দৃষ্টিতে। কী সুন্দর নন্তুদার স্বাস্থ্য !

কিন্তু অতি অল্পদিনের মধ্যে তার শুধু স্বাস্থ্যই নয়, জীবনটাই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। সে এক অতি মর্মান্তিক কাহিনী ! রত্না, নন্তুদার কাহিনী শোনবার জন্যে তুই হয়তো সময় নষ্ট করতে চাইবি না। কারণ, নন্তুদাকে তুই কখনো দেখিস নি। কিন্তু আমি তো ভাই তাকে ভুলতে পারি না। সেদিন সে আমার চোখের জল দেখে মুহূর্তের মধ্যে সহানুভূতিশীল হয়ে উঠেছিল। কেবল সহানুভূতিশীল নয়, সে যেন আমার মুক্তির একটা রাস্তাও বার ক'রে ফেলল।

একটু পরেই সে বলল, 'ঝরনার মা মিসেস সবিতা গুপ্তকে আমি চিনি। তিনি তো বিধানচন্দ্র বালিকা বিদ্যালয়ের হেড-মিস্ট্রেস। তাঁকে বললে কেমন হয় ? অবিশ্যি ঝরনাকে বললেও চলে।'

নন্তুদা চিন্তান্বিতভাবে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগল। পরে বুঝেছিলাম, আমায় ইস্কুলে ভর্তি করবার জন্যই কেবল সে চিন্তা করছিল না। ঝরনার সঙ্গে দেখা করবার সহজ রাস্তা তৈরি করবার কথাও সে ভাবছিল। নন্তুদা ঝরনাকে ভালবাসত। একই ইস্কুলে আমি

আর ঝরনা যদি পড়ি, তা হ'লে কি নন্তদার একটু সুবিধে হয় না? হয়, নিশ্চয়ই হয়। ঝরনা যদিও ম্যাট্রিক ক্লাসে পড়ছিল, আমার চেয়ে দু ক্লাস ওপরে, তাতে তো বন্ধুত্ব করবার কোন অসুবিধে নেই। তবে? একটু পরে নন্তদা বলল, 'আমি যেমন ক'রে পারি তোর ব্যবস্থা একটা করবই। আমি যে খুব একজন স্বার্থহীন ছেলে, তা কিন্তু মনে ভাবিস নে, জয়া। আমার এতে পুরোপুরি স্বার্থ আছে।'

আমি চমকে উঠলাম।

মামা দোতলা থেকে নীচে নামছিলেন। বেশ জোরে জোরে পা ফেলে ফেলে নীচে নামছিলেন তিনি। বাজারের পথে হাঁটবার পদক্ষেপ এ নয়। প্রতিদিনকার সঙ্গে আজকের পদক্ষেপ তাঁর একেবারেই মিলছে না। মনে হ'ল, তিনি নন্তদার ঘরের দিকেই আসছেন। ভয় পেয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'ব্যাপার কি?'

'ব্যাপার? কিছুই না। তোর মুখটা একটু সরিয়ে নে জয়া। নাকের নিশ্বাস তোর কি রকম গরম হয়ে উঠেছে! বুকে আমার ফোস্কা না পড়ে!'

বললাম, 'ভয় পেয়েছি ব'লেই বোধ হয় নিশ্বাস আমার গরম হয়ে উঠেছে। সে যাক, তুমি কোন অন্যায় কাজ কর নি তো, নন্তদা?'

নন্তদা জবাব দেওয়ার আগেই বড়মামা এসে ঘরে ঢুকলেন।

মামার বাড়িতে এসে এই আমি প্রথম দেখলুম, বড়মামার সঙ্গে নন্তদা তর্ক করতে সাহস পেয়েছে। কেবল সাহসের মূলধন নিয়েই বড়মামার সঙ্গে তর্ক করা যায় না। প্রতিটি কথার মধ্যে যুক্তি থাকা চাই। তা ছাড়া প্রত্যেকটি কথার মধ্যে যেন কোথাও এতটুকু মিথ্যে বলবার প্রয়াস না থাকে। বড়মামা নিজে কোনদিন ভুল ক'রেও মিথ্যে কথা বলেন নি। মিথ্যে কথা বলা যে মহাপাপ তা তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন। তিনি বলতেন, একবার যে মিথ্যে কথা বলে, তাকে আর কখনই বিশ্বাস করা চলে না, এমন কি সে যদি আবার সত্যিকথাও

বলে। আজকালকার শিক্ষাপদ্ধতি থেকে যে চরিত্র গঠনের মূলনীতি ক্রমশই উহ্য হয়ে যাচ্ছে, সে সম্বন্ধে মামা প্রায়ই বক্তৃতা দিতেন আমাদের কাছে।

ঘরের মধ্যে ঢুকে প্রথমেই মামা নন্তদার টেবিলের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। টেবিল থেকে একটা একটা ক'রে প্রত্যেকটা বই তিনি হাতে নিয়ে পাতা ওল্টাতে লাগলেন। কেমিস্ট্রি বইখানার মধ্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে মামা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কলেজ কামাই ক'রে আজকাল কি তুমি মাঠে-ময়দানে বক্তৃতা দিতে যাচ্ছ?'

'দু-একদিন কলেজ কামাই করলে মহাভারত অশুদ্ধ হয় নাকি?'—নন্তদার এই পাল্টা-প্রশ্ন শুনে বড়মামা চোখ তুলে চেয়ে রইলেন তাঁর সন্তানের দিকে। নন্তদা তখন ইচ্ছে ক'রেই যেন তার চওড়া বুকটাকে আরও বেশী ক'রে চওড়া করতে লাগল। বড়মামা অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন নন্তদার চওড়া বুকের দিকে। অবাক হয়েই বোধ হয় তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুই আমায় ভয় দেখাচ্ছিস নাকি?'

নন্তদা জবাব দিল না।

বড়মামা নিজের মনে মনেই যেন বলতে লাগলেন, বাংলার ভবিষ্যৎ খুব অন্ধকার। কি এক বিকৃত-বিজ্ঞান-বুদ্ধি এসে মানুষের মন থেকে ক্রমে ক্রমে সব রকম নীতিবোধ মুছে দিয়ে যাচ্ছে।···'নন্ত, তুই তো বার্ষিক পরীক্ষায় পাস করতে পারিস নি। কেন? আমায় তুই মিছে কথা বলেছিস কেন?'

'আমি কোন জবাব দেব না।'—বলল নন্তদা।

'আজ থেকে আমার এখানে তোর আর থাকাও চলবে না।'—বড়-মামার আদেশের সুরে দুর্বলতার আভাসও ছিল না।

'সেই জন্যেই তো জামাকাপড় সব গুছিয়ে নিচ্ছি।'—নন্তদা সত্যি সত্যি জামাকাপড় সব গুছোতে লাগল।

বড়মামা এবার আমার দিকে চেয়ে বললেন, 'চল্ জয়া, আমরা এবার

বাজারে যাই। তোর মামীমা আজ আবার খুব ধুমধাম ক'রে শনিপুজো করছেন!'

দরজার কাছে গিয়ে তিনি পুনরায় বললেন, 'এ বাড়িতে বারো মাসে তেরো পার্বণের ধর্ম তো লেগেই আছে।...কিন্তু মিথ্যে না বলার ধর্ম এখানে তো কেউ মানে না!'

মামা চ'লে যাওয়ার পরে হঠাৎ আমার চোখ পড়ল কেমিস্ট্রি বই-খানার দিকে। বইটা দেখলুম খুলেই রেখে গেছেন মামা। খোলা পাতা দুটোর মাঝখানে ছোট্ট সাইজের একটা ফোটো রয়েছে। ফোটোখানা হাতে নিয়ে আমি নন্তুদাকে জিজ্ঞাসা করলুম, 'এটা কার ছবি?'

আমার হাত থেকে ছোঁ মেরে ফোটোখানা নিয়ে নন্তুদা বলল, 'ঝরনা গুপ্তর ছবি।'

'মামা কিন্তু ছবিখানা দেখে গেলেন নন্তুদা।'

নিঃশব্দে নন্তুদা ছবিখানা কুটিকুটি ক'রে ছিঁড়তে লাগল আমারই চোখের সামনে।"

রাত একটা না বাজতেই মিস জয়া বসু ঘুমিয়ে পড়লেন আজ। খুবই আশ্চর্য বোধ করল নিশীথ। করিডোরে সে পায়চারি করছিল। দিদিমণি না ঘুমলে নিশীথ ঘুমতে যায় না। ধীরে ধীরে অতি নিঃশব্দে নিশীথ দরজাটা খুলে ফেলল। জয়াদি সত্যি সত্যিই ঘুমিয়ে পড়েছেন!

বহু বছর পরে এমন দৃশ্য দেখবার সৌভাগ্য হ'ল নিশীথের। রাত্রি-বেলা দিদিমণি ওর ঘুমচ্ছেন! তবে কি তাঁর স্বাস্থ্য আবার ফিরে এল? কার্শিয়ংয়ে আজ তাঁর ষষ্ঠ রাত্রি পার হচ্ছে—জয়া বসুর মুখের দিকে চেয়ে নিশীথ পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারল যে, দিদিমণির অশান্তি অনেক ক'মে গেছে। কমবেই। বিন্দুমাত্র অশান্তিও আর থাকবে না জয়াদির যদি বিয়ে হয়। বিয়ে? হ্যাঁ, বিয়ের মধ্যেই ওষুধ তিনি পাবেন,

পাবেন স্বাভাবিকতা, ভাবল নিশীথ। ভাবতে ভাবতে কখন্ যে সে ঘরের আলোটা নিবিয়ে দিয়েছে নিশীথের তা খেয়াল ছিল না। অন্ধকার ঘর। ঘরটা উপস্থিত মিস জয়া বসুর শোবার ঘর। এই কথাটা ভাবতে গিয়ে নিশীথ যেন আজ একটু লজ্জাই পেল। দিদিমণির স্বাস্থ্য ক্রমে ক্রমে ফিরে আসছে। চোয়ালের হাড় দুটোর ওপর মাংস গজিয়েছে এ কদিনের মধ্যেই। মাংস ?

ঘর থেকে বেরিয়ে এল নিশীথ। করিডোরে দাঁড়িয়ে সে ভাবল, হ্যাঁ, মাংস। বাঁশপাতার মত শুকনো শরীরটায় মাংস কই ? বিয়ের আগে খানিকটা মাংস না গজালে ডাক্তার প্রধানের কৃতিত্ব বোঝা যাবে কি ক'রে ? আজ সকালে ডাক্তার প্রধান এসেছিলেন। তিনি ভাল ক'রে পরীক্ষা করেছেন দিদিমণিকে। মধ্যরাত্রিতে ওর ঠোঁটের ওপর হাসির রেখা ভেসে উঠল। ডাক্তার প্রধানের দু দাগ ওষুধ খাওয়ার পরেই দিদিমণির ঘুম এল নাকি ? আসবেই।

দিদিমণি আজ মধ্যরাত্রিতে ঘুমিয়ে পড়েছেন। ডাক্তার প্রধান দিদিমণির দেহটাকে অবজ্ঞা করেন নি। উপহাসের সুরে তিনি বিশ্লেষণ ক'রে বলেন নি যে, তাঁর শরীরে আর স্বাস্থ্য নেই। দেহের কোথাও যদি একটু-আধটু স্বাস্থ্য থেকেও থাকে, তা নিয়ে জীবনের উত্তাপ আর বেশী দিন ধ'রে রাখা যাবে না। ইচ্ছে করলেই ডাক্তার প্রধান এসব কথা বলতে পারতেন। কিন্তু তা তিনি বলেন নি। দিদিমণির কঙ্কালটার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা এসেছে। করিডোরের অন্ধকারে দাঁড়িয়ে নিশীথ অনুপস্থিত ডাক্তারের প্রতি হাত তুলে নমস্কার জানাল।

এটা নিঃস্বার্থ নমস্কার নয়। ডাক্তার প্রধান আজও অবিবাহিত। নিশীথ খবর নিয়ে জেনেছে যে, সংসারে তাঁর কোন রকম বন্ধন পর্যন্ত নেই। বন্ধন ছিল, ডাক্তার প্রধান তা কেটে ফেলতে বাধ্য হয়েছেন। কেটে ফেলেছেন প্রায় পঁচিশ বছর আগেই। ডাক্তার প্রধান আজ পঁয়তাল্লিশে পা দিয়েছেন। বিশ বছর বয়সে তিনি খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত

হয়েছিলেন। এসব খবর নিশীথ জেনেছে রেল-স্টেশনের ছোট কেরানী-বাবুর কাছে। তিনি ডাক্তার প্রধানের আত্মীয়।

ছোট কেরানীবাবু একদিন বলেছিলেন, "খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হওয়ার জন্যে আমরা তাঁকে সমাজে আর স্থান দিই না। স্থান পাওয়ার জন্যে তিনি অবশ্যি চেষ্টাও করেন নি।···কি হবে সমাজে ঢুকে? খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন ব'লেই তো তিনি আজ এত উচ্চশিক্ষিত। পাদ্রী সাহেবরা তাঁকে বিলেত পর্যন্ত ঘুরিয়ে নিয়ে এসেছেন। খ্রীষ্টান না হ'লে তিনি এসব সুবিধে পেতেন না।"

কেরানীবাবুর কথা শুনে নিশীথ সেদিন খুবই অবাক হয়েছিল। টাকার সুবিধে পাওয়ার জন্যে মানুষ ধর্ম বদলায় নাকি? ছোট কেরানী-বাবুর কথা যদি ঠিক হয়, তা হ'লে ডাক্তার প্রধানের প্রতি নিশীথের কোন শ্রদ্ধাই থাকতে পারে না। চোর-ডাকাতের চেয়ে ডাক্তার প্রধান তবে ভাল হ'ল কি ক'রে? অভাবের তাড়নায় অনেকে চুরি করে, নিশীথ তাদের ক্ষমা করতে পারে। কিন্তু যারা টাকার সুবিধে পাওয়ার জন্যে ধর্ম বদলায়, তাদের সে ক্ষমা করতে পারে না। ধর্মজ্ঞান নিশীথের প্রবল। ওর বাবা ছিলেন পণ্ডিতলোক। কিন্তু নিশীথ লেখাপড়া শিখতে পারে নি। মুখ দিয়ে কথা ফোটবার আগেই ওর বাবা মারা যান। পাড়া-গাঁয়ের সমাজ ওকে প্রতিপালন করবার দায়িত্ব নিল না। রাষ্ট্র হয়তো এ দায়িত্ব নিতে পারত। কিন্তু রাষ্ট্র যে কি এবং কোথায়, নিশীথের মা তার ঠিকানা জানতেন না। অতএব একেবারে ভিক্ষের ওপর নির্ভর ক'রে মা ওর চ'লে এলেন কলকাতায়। নিশীথ লেখাপড়া শিখতে পারল না। নিরক্ষর নিশীথের ধর্মজ্ঞান হ'ল। ভাল-মন্দ-ন্যায়-অন্যায়-বিচারবোধ যেন শিক্ষিত লোকদের চেয়েও অনেক বেশী হ'ল নিশীথের।

ডাক্তার প্রধানের কথা মনে পড়ল ওর। আজ সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় ডাক্তার প্রধান হাসিমুখে নিশীথের কানে

কানে বলেছিলেন, "ভগবান তোমার মঙ্গল করুন, নিশীথ। মিস বসুর অসুখ আমি ভাল করবই।"

ডাক্তার প্রধানের কৃতিত্বের প্রতি সম্ভ্রম জানাল নিশীথ।—"ব্যাগটা আমার কাছে দিন, আমি পৌঁছে দিয়ে আসি, ডাক্তারসাহেব।"

"না নিশীথ। তুমি এবার দিদিমণির কাছে যাও।—" দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন ডাক্তার প্রধান। বেরিয়ে যাওয়ার সময় পেছন ফিরে তিনি বললেন, "ধন্যবাদ নিশীথ।"

চামড়ার ব্যাগটা হাতে নিয়ে ডাক্তার প্রধান নামতে লাগলেন নীচে। পাহাড়ের গা দিয়ে সিঁড়িটা নেমে গেছে কার্ট রোড পর্যন্ত। দরজায় দাঁড়িয়ে নিশীথ চেয়ে ছিল সেই দিকেই। একেবারে শেষ সিঁড়িটায় গিয়ে ডাক্তার প্রধান যখন পৌঁছলেন, তখন ফাদার হেনরীর সঙ্গে দেখা হ'ল তাঁর। ওঁরা দুজনে কার্ট রোডের দিকে হাঁটতে লাগলেন। একটু পরে আর তাঁদের দেখতে পাওয়া গেল না।

নিশীথ দরজা বন্ধ ক'রে দিল।

মিস জয়া বসু ডাকছিলেন ওকে। দরজা বন্ধ ক'রে নিশীথ ছুটে এল মিস জয়া বসুর শোবার ঘরে। বেলা তখন বোধ হয় বারোটার বেশী নয়। ডাক্তার প্রধান এসেছিলেন ঠিক এগারোটায়। এক ঘণ্টা ধ'রে ডাক্তার কি রোগ পরীক্ষা করলেন ?

"দেখি, প্রেসক্রিপশানটা দাও তো।"—হাত বাড়াল নিশীথ।

"প্রেসক্রিপশান ?"—মিস জয়া বসু উঠে ব'সে বললেন, "প্রেসক্রিপশান নেই।"

"কেন, ভিজিট দাও নি ?"—নিশীথের ভঙ্গীতে বিস্ময়ের আভাস।

"ভিজিট উনি নিলেন না। উনি বললেন, আমাদের মধ্যে দেনাপাওনার কোন হিসেব থাকবে না। হিসেব থাকবে না যতদিন না আমি ভাল হয়ে উঠি।"

"কিন্তু ওষুধ ছাড়া তুমি কেমন ক'রে ভাল হয়ে উঠবে ?"

"ওষুধ উনি দিয়ে গেছেন রে, নিশীথ।"

মনের আনন্দ যেন প্রকাশ না পায় সেই জন্যে নিশীথ এরই মধ্যে জানলা বন্ধ করবার অজুহাতে মুখটা ঘুরিয়ে রেখেছিল উল্টো দিকে। ডাক্তার প্রধানের ওষুধ তা হ'লে দিদিমণির পছন্দ হয়েছে! হবেই। নিশীথ জানে, অমিতাভবাবু যা দিতে পারেন না, ডাক্তার প্রধান তা পারেন।

করিডোরের অন্ধকারে দাঁড়িয়ে নিশীথ সকালবেলার কথাগুলোই সব ভাবছিল। একটু আগেই সে দেখে এসেছে যে, মিস জয়া বসু চিঠি লিখতে লিখতে সহসা ঘুমিয়ে পড়েছেন। সহসা ঘুমিয়ে পড়বার মত মুহূর্ত তাঁর জীবনে খুব কমই এসেছে। নিশীথ খুশী হয়েছে আশাতীত ভাবে। দিদিমণির স্বাস্থ্য ফিরে আসছে; শরীরের উন্নতি তিনি আর নিশীথের দৃষ্টি থেকে গোপন ক'রে রাখতে পারছেন না।

কি মনে ক'রে নিশীথ ব'সে পড়ল করিডোরের মেঝের ওপর।

মিস জয়া বসু আজ ঘুম থেকে উঠে পড়েছেন খুব ভোরে। নিশীথ সকালবেলা গরম কফি নিয়ে এসে হাজির হয় প্রতিদিন। আজ তার কফি আনতে দেরি হচ্ছে দেখে তিনি বেরিয়ে এলেন বাইরে। নিশীথ দেয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে ঘুমচ্ছিল। মিস জয়া বসু অবাক হলেন খুবই। পুবদিকের খোলা জানলা দিয়ে রোদ এসে পড়েছে করিডোরের মধ্যে। নিশীথের তবু ঘুম ভাঙল না। জয়া বসু ডাকলেন, "নিশীথ— নিশীথ—"

"আজ্ঞে।"—নিশীথ উঠে দাঁড়াল।

"ব্যাপার কি? এখানে ব'সে ঘুমচ্ছিস কেন?"—জিজ্ঞাসা করলেন মিস জয়া বসু।

"ঘুমচ্ছিলাম না-কি?"—নিশীথ এখনো ঠিক বুঝতে পারছিল না, সে ঘুমচ্ছিল কি না।

"ঘুমচ্ছিলি, না, ধ্যান করছিলি, আমি কি ক'রে জানব? এক পেয়ালা গরম কফি দিতে পারিস?"—জিজ্ঞাসা করলেন জয়া বসু।

"নিশ্চয়, নিশ্চয়"—চোখ রগড়াতে রগড়াতে নিশীথ হাঁটতে লাগল রান্নাঘরের দিকে।

জয়া বসু ডাকলেন, "নিশীথ, একটু দাঁড়া।"

"কেন দিদিমণি?"

"তুই ঘুমতে যা। আজ কফি আমিই তৈরি করব। কি রে, বোকার মত হাঁ ক'রে মুখের দিকে চেয়ে কি দেখছিস?"

"তোমাকে দেখছি, মানে—তুমি যে সেরে উঠছ তাই দেখছি। তুমি এবার পুরোপুরিভাবে ভাল হয়ে যাবে, দিদিমণি।"

এই সময় বাইরের দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ পাওয়া গেল। মিস জয়া বসু বললেন, "বোধ হয় অমিতাভ এসেছে।"

"তোমরা তা হ'লে বসবার ঘরে গিয়ে গল্প কর, আমি ঠিক পাঁচ মিনিটের মধ্যে দু পেয়ালা কফি নিয়ে আসছি। ব্রেকফাস্ট কটায় খাবে?"

"আর এক ঘণ্টা পরে দিস।"—বললেন জয়া বসু।

দরজা খুলতেই ওপাশ থেকে ফাদার হেনরী বললেন, "গুড মর্নিং, মিস বোস।"

"গুড মর্নিং, ফাদার। আমি ভাবলুম, অমিতাভ এল বুঝি! আসুন।"

বসবার ঘরে এসে বসলেন ফাদার হেনরী। মিস জয়া বসু বসলেন ফাদার হেনরীর উল্টো দিকে। তিনি লক্ষ্য করলেন যে, ফাদার হেনরী বইয়ের দিক থেকে একবার চোখ ঘুরিয়ে নিলেন। পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার ক'রে একটা সিগারেট ধরিয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "কেমন আছেন এখন?"

"ভালই আছি। কার্শিয়ংয়ের আবহাওয়া মন্দ লাগছে না।"—জবাব দিলেন জয়া বসু।

"লাগবে, ভাল লাগবে কার্শিয়ং।"—হোমিওপ্যাথি ওষুধের বাক্সটা সেণ্টার টেবিলের ওপর রেখে তিনিই আবার বললেন, "কার্শিয়ংয়ে কেবল আবহাওয়া নেই, উচ্চতাও আছে।"

জয়া বসু বললেন, "বুঝেছি। তবে স্বাস্থ্য আমার ভাল হচ্ছে আবহাওয়ার জন্যে, না, উচ্চতার জন্যে, তা আমি এখনো বুঝতে পারি নি।"

"বুঝবেন, ক্রমে ক্রমে অবশ্যই বুঝবেন। দেখুন মিস বোস, দি গ্লোরি অব গড—।" শেল্‌ফের দিকে চেয়ে ফাদার হেনরী আগের লাইনটা শেষ না ক'রে বললেন, "কোন পরিবর্তন দেখছি না তো? আপনি কি আজও অস্তিবাদের পেছনে ছুটছেন?"

জবাব দিলেন না জয়া বসু। অতএব তিনিই পুনরায় বলতে লাগলেন, "প্রতি মুহূর্তে এক-একটা ক'রে সংকট আসছে আপনাদের জীবনে—ক্রাইসিস। ইন্ ফ্যাক্ট, ক্রাইসিস অথবা সংকট হচ্ছে আপনাদের জীবনের চিরস্থায়ী সত্য। জীবনের সত্য হোক বা না হোক, আপনাদের ফিলজফির সত্য তো বটেই। এই সংকট থেকে পরিত্রাণের কোন পথ আপনাদের নেই। অ্যাম আই কারেক্ট, মিস বোস?"

"হ্যাঁ, ফাদার।"

"তা হ'লে সারা জীবন ধ'রে যদি সংকটের মধ্যেই ডুবে থাকেন, অর্থাৎ জীবনটা যদি সংকটের প্রতিশব্দ হয়, তবে ভগবানের কীর্তি আপনি দেখবেন কি ক'রে?"

"এক পেয়ালা কফি খেয়ে নিন, ফাদার।"—এই ব'লে জয়া বসু নিশীথের হাত থেকে কফির পেয়ালা দুটো নামিয়ে নিয়ে সাজিয়ে রাখলেন সেণ্টার টেবিলের ওপর। হোমিওপ্যাথি ওষুধের বাক্সটা নিশীথের হাতে তুলে দিয়ে তিনি বললেন, "ঐ বড় টেবিলের ওপর সরিয়ে রাখ্।"

নিশীথ বাক্সটা সরিয়ে রাখল। সরিয়ে রেখে সে জিজ্ঞাসা করলে, "ঘরের জানলাগুলো খুলে দি, দিদিমণি?"

"দে।"—তারপর ফাদার হেনরীর দিকে চেয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "এখন বুঝি ডাক্তারি করতে বেরিয়েছেন, ফাদার ?"

"হ্যাঁ। সকালবেলার প্রথম এবং প্রধান কর্তব্য হচ্ছে আমার গীর্জাতে গিয়ে প্রার্থনা-সভায় যোগ দেওয়া। তারপরে দু ঘণ্টা আমার কাটে রোগীদের চিকিৎসার কাজ নিয়ে। জানেন তো, এদিককার মানুষ কত গরিব।"

"জানি ফাদার, জানি। না জানলে, আপনাদের চব্বিশ ঘণ্টাই প্রশংসা করি কেন ? মানুষের জন্যে আর কাউকেই তো আপনাদের মত ভাবতে দেখি না! ইস্কুল, কলেজ, হাসপাতাল ইত্যাদি চালাবার জন্যে কত দূর দেশ থেকে আপনারা সব ছুটে এসেছেন ভারতবর্ষে।"

"একটু ভুল হ'ল আপনার, মিস বোস। ইস্কুল কলেজ কিংবা হাসপাতাল চালাবার জন্যে আমরা এখানে আসি নি। আমরা এসেছি ধর্মপ্রচারের জন্যে।"

"তা হোক, আপনারা যা ইচ্ছে তাই প্রচার করতে পারেন আমরা তা শুনতে যাব না। আমরা দেখব আপনাদের ইস্কুল কলেজ হাসপাতাল, এবং—।" একটু হেসে মিস জয়া বসু বললেন, "দেখব আপনার এই ছোট্ট হোমিওপ্যাথি ওষুধের বাক্সটা। দু-দশজন রাষ্ট্র-নায়কের অথবা ধর্মযাজকের দু-দশ কোটি বক্তৃতার চেয়েও দামী আপনার এই এক ফোঁটা ওষুধ। বক্তৃতা দিয়ে আধখানা গরিবকেও বাঁচানো যায় না, কিন্তু আপনি আপনার ওই ওষুধ দিয়ে একটা গোটা বস্তিকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। ফাদার, মানুষের জন্যে অনেকে অনেক কিছু হয়তো করে, কিন্তু গরিব মানুষদের জন্যে তো আপনাদের মত এমন সংঘবদ্ধ-ভাবে কাউকে কিছু করতে দেখি নি! ডাক্তার প্রধানের সঙ্গে আলাপ হওয়ার পরে, আপনাদের কীর্তি সম্বন্ধে আমার আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। আপনাদের সাহায্য না পেলে তিনি হয়তো আজ কোন একজন মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির দরজায় বন্দুক হাতে নিয়ে পাহারাওয়ালার

কাজ করতেন। কত মাইনে পেতেন তিনি? কিন্তু আজ দেখুন তো ডাক্তার প্রধানের অবস্থা কি? ফী ছাড়াই তিনি আমার চিকিৎসা করছেন। এবং একটি পয়সা না নিয়েই তিনি আমায় আরোগ্য ক'রে তুলবেন ব'লে কথা দিয়েছেন। বক্তৃতা দিতে সবাই পারে, কিন্তু কথা দিতে কজন পারে, ফাদার?"

"ইণ্টারেস্টিং! খুবই হাসির খোরাক আছে আপনার বিশ্লেষণে। কিন্তু ডাক্তার প্রধান আমাদের কাছে কোন সাহায্যই পান নি, পেয়েছেন ভগবানের কাছে। আজ উঠি—"

ফাদার হেনরী উঠে পড়েছেন দেখে মিস জয়া বসু জিজ্ঞাসা করলেন, "গীর্জার প্রার্থনা-সভায় কি অমিতাভর সঙ্গে আপনার দেখা হয় নি?"

প্রশ্ন শুনে ফাদার হেনরী পুনরায় ব'সে পড়লেন সোফার ওপর। হাসতে হাসতে তিনি বললেন, "সেখানে তার সঙ্গে দেখা হবে কি ক'রে? সে তো খ্রীষ্টান নয়। তা ছাড়া আমার যতদূর বিশ্বাস, অমিতাভ কোন ধর্মই মানে না। অমিতাভ সেন সম্বন্ধে আপনার এতবড় ভুল হ'ল কি ক'রে, মিস বোস?" জয়া বসু একটু অপ্রস্তুত বোধ করলেন। হঠাৎ তিনি কেন আজ ওর সম্বন্ধে এমন একটা মন্তব্য ক'রে বসলেন? একটু ভেবে নিয়ে জয়া বসু বললেন, "সেদিন অমিতাভ রিল্‌ক্-এর একটা কবিতা পাঠ করছিল—বঙ্গানুবাদ। পৃথিবীতে এত কবিতা থাকতে, সে কেন যে বিশেষ ক'রে ওই 'পিয়েতা' কবিতাটা পাঠ করেছিল তার অর্থ বুঝতে না পেরেই হয়তো আমি তার সম্বন্ধে আজ এতবড় ভুল ক'রে বসলাম। কিন্তু সত্যিই কি আমার ভুল, ফাদার?"

"ভুল—" ফাদার হেনরী বললেন, "আমি এবার চলি।" তিনি সত্যিই দরজার দিকে এগিয়ে যেতে লাগলেন। হঠাৎ তিনি পেছন ফিরে ঘোষণা করলেন, "কাল রাত থেকে অমিতাভ অসুস্থ হয়ে পড়েছে।"

"কি অসুখ ?"—জানতে চাইলেন জয়া বসু।

"বোধ হয় সর্দি-জ্বর। ভয়ের কোন কারণ নেই। দু কৌটা ওষুধ খেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।"

"আমি কি ওকে দেখতে যেতে পারি না, ফাদার ?"

"একটু অসুবিধে আছে। ওখানে যে মহিলাদের প্রবেশাধিকার নেই। এটা গীর্জা-কর্তৃপক্ষের আইন।"

"তা হ'লে অমিতাভকে এখানে আনানো যায় না ?"

দরজার ও-পাশ থেকে নিশীথ ঘরে ঢুকল। জয়া বসুর দিকে চেয়ে সে বলল, "অমিতাভবাবুকে ডাক্তার প্রধান এই মাত্র দেখে এলেন। জ্বর খুব সামান্যই আছে। তাঁকে এখন টানাহেঁচড়া করবার দরকার নেই।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই ভাল।"—সায় দিলেন ফাদার হেনরী। তারপর তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

॥ সপ্তম রাত্রি ॥

"রত্না, এইমাত্র খবর পেলুম যে, অমিতাভর আজ আর জ্বর নেই। আজ সকাল থেকে নিশীথ সেখানেই আছে। আছে এবং অমিতাভর বিছানার কাছে ব'সে সেবা করছে। অদ্ভুত এই লোকটি! অমিতাভর প্রতি ওর মনোভাব তো আমার আর জানতে বাকি নেই! অমিতাভকে সে একেবারেই পছন্দ করে না। তবু সকাল থেকে নিশীথ ওখানেই প'ড়ে আছে। শুনলুম, ফাদার ডুবোয়া পর্যন্ত নিশীথের কাণ্ড দেখে অবাক হয়ে গেছেন! এমন নিঃস্বার্থভাবে কোন নিরক্ষর লোক যে কাউকে সেবা করতে পারে তা তিনি এই প্রথম দেখলেন। নিশীথের কল্যাণের জন্যে ফাদার ডুবোয়া নাকি আজ সন্ধ্যেবেলা গীর্জাতে গিয়ে সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে প্রার্থনা করেছেন! আশা করি, শেষ পর্যন্ত নিশীথের কল্যাণ হবে। হয়তো হবেই।

মাসটা বোধ হয় ফেব্রুয়ারি ছিল। নন্তুদা সত্যি সত্যি বাড়ি থেকে একদিন বেরিয়ে গেল। কোথায় গেল এবং কেন যে গেল তার কারণটা আমার খুব পরিষ্কারভাবে জানা ছিল না। বড়মামার কথায় তার এমন কিছু অপমান বোধ করা উচিত হয় নি। নন্তুদার নিজেরই তো খুব গুরুতর অপরাধ হয়েছিল। সে কেন পাস করেছে ব'লে বড়মামার কাছে মিথ্যে কথা বলতে গেল? কেবল ফেল করবার জন্যে বড়মামা তাকে কিছুতেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বলতেন না। কেমিস্ট্রি বইখানার মধ্যে ঝরনার ছবিখানা তিনি দেখেছিলেন বটে, কিন্তু তাতেও বড়মামা নন্তুদাকে কোন শাস্তি দিতেন ব'লে আমার বিশ্বাস হয় নি। তবে নন্তুদা হঠাৎ একদিন বাড়ি থেকে চ'লে গেল কেন? ঝরনাকে জিজ্ঞাসা ক'রেও কোন খবরই আমি জানতে পারি নি। বড়মামা নিজে এ সম্বন্ধে একেবারেই আগ্রহশীল ছিলেন না। তাঁকে দেখে অন্তত কেউ তা বুঝতে পারত না। মামীমা মাঝে মাঝে নন্তুদার জন্যে

কাঁদতেন। কাঁদতেন আমাদের সামনে, বড়মামার সামনে নয়। বড়মামার আদেশ ছিল যে, এ বাড়ির কেউ যেন নন্তুদার নাম না করে। কেবল মিথ্যে কথা বলার অপরাধই নন্তুদার একমাত্র অপরাধ ছিল না। নন্তুদা লুকিয়ে লুকিয়ে একটা বৈপ্লবিক দলে যোগ দিয়েছিল। সে গান্ধীজীর অহিংসা-নীতিতে বিশ্বাস করত না। বড়মামা একদিন বাড়ি ফিরলেন বেশ একটু রাত ক'রে। আমরা সবাই খুব উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলাম। মাঝে মাঝে তিনি অত্যন্ত চেনা রাস্তাও চিনতে পারতেন না। ভবানীপুরের দিকে না এসে তিনি অনেক দিন ভুল ক'রে শ্যাম-বাজারের ট্রামে চেপে বসেছেন।

আজ যখন বাড়ি ফিরলেন তখন তাঁর মুখের ওপর বিরাট এক দুর্ঘটনার ছাপ পড়েছে ব'লে মনে হ'ল আমাদের। সেদিন আমাদের সত্যিই মনে হয়েছিল যে ইংরেজ রাজত্বের বোধ হয় অনিবার্য অবসান ঘটেছে। এর চেয়ে খারাপ দুর্ঘটনা সেদিন মামার পক্ষে কল্পনা করা সম্ভব ছিল না।

মামা বাড়ি ফিরে এসে বললেন, 'নন্তু আমাদের কেউ নয়। ইংরেজ রাজত্বের অবসান ঘটাবার জন্যে সে সন্ত্রাসবাদীদের দলে গিয়ে যোগ দিয়েছিল। ধরা পড়েছে। কোথায় কোন্ এক ব্যাঙ্ক লুটের ব্যাপারে সে ধরা পড়েছে। তোমরা কেউ বিশ্বাস কর যে, নন্তু ডক্টর যাদব মিত্রের ছেলে ?'---বলতে বলতে তিনি দোতলায় উঠে যেতে লাগলেন। আমরা জানতুম, একবার লাইব্রেরি-ঘরে গিয়ে পৌঁছুতে পারলে, সংসারের সব কিছু তিনি ভুলে যাবেন। ইতিহাস কি ? সময়ের স্রোত। সেই স্রোতের মধ্যে নন্তুদা তো একটা সামান্য কুটো পর্যন্ত নয়।

আমি কিন্তু নন্তুদাকে ভুলতে পারলুম না। বাড়ি থেকে চ'লে যাওয়ার আগে সে মিসেস সবিতা গুপ্তর সঙ্গে দেখা ক'রে গিয়েছিল। আমার মেধা এবং পরীক্ষা পাসের কৃতিত্ব সম্বন্ধে সে সব কথাই বলেছিল তাঁর কাছে। বিধানচন্দ্র বালিকা বিদ্যালয়ে ভর্তি হবার সুযোগ ক'রে দিয়েছিল নন্তুদা।

একদিন আমি মামার লাইব্রেরি-ঘরটা পরিষ্কার করছিলাম। এটাই ছিল আমার কাছে সবচেয়ে আনন্দের কাজ। লাইব্রেরি-ঘরে ঢোকবার জন্যে সকালবেলা থেকেই আমি ছটফট করতুম। মামা কলেজে বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি গিয়ে ঢুকে পড়তুম সেখানে।

সেদিন মামার ছিল ছুটির দিন। সকালবেলা তিনি কি এক প্রয়োজনীয় কাজে বাইরে বেরিয়েছিলেন। হাতে আমার সেদিন খুব বেশী কাজও ছিল না। মামীমাকে বললাম, 'আজ একটু সকাল সকাল লাইব্রেরি-ঘরটা পরিষ্কার ক'রে দিয়ে আসি। মামা নিশ্চয়ই বেলা বারোটার আগে ফিরবেন না।'

মামীমা পুজোর ঘরে ছিলেন। নন্তুদা ধরা পড়বার পর থেকে তিনি প্রায় সমস্ত দিনটা পুজোর ঘরে কাটিয়ে দেন। ক'দিন থেকে তাঁর বোধ হয় মামার সঙ্গে দেখাও হয় না। মামার কাছে শুনেছিলাম যে, তিনি এক গেলাস জল পর্যন্ত খেয়ে হজম করতে পারেন না। কথাটা একটু বাড়িয়ে বলা বটে। কিন্তু সত্যিই মামীমার স্বাস্থ্য ছিল খুবই খারাপ। নন্তুদা বাড়ি থেকে চ'লে যাওয়ার পরে মামীমা বোধ হয় আধ গেলাস জল খেয়েও হজম করতে পারছেন না।

লাইব্রেরি-ঘরে যাওয়ার কথাটা ঘোষণা ক'রে আমি ঠাকুর-ঘর থেকে বেরিয়ে আসছিলাম। মামীমা আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'হ্যাঁরে জয়া, আজকের খবরের কাগজে কি লিখেছে রে? ওদের মকদ্দমা শুরু হবে কবে থেকে?'

'কবে থেকে শুরু হবে তার তারিখ এখনো পড়ে নি।'

'তোর মামা তো একটা পয়সাও খরচ করবেন না—নন্তুর জন্যে উকিল-ব্যারিস্টার কেউ থাকবে না।'

'এ নিয়ে তুমি চিন্তা ক'রো না, মামীমা। মকদ্দমা শুরু হতে এখনও দু-তিন মাস লাগবে। তত দিনে মামা নিশ্চয়ই একটা ব্যবস্থা করবেন।'

'করবেন ব'লে তো আমার বিশ্বাস হয় না। আমি নিজেও কিছু করতে পারি না। শরীরের যা অবস্থা, তাতে বেশী দিন বোধ হয় আর বাঁচবও না।'

'এই ছোট্ট ঘরটায় সারাদিন ব'সে না থেকে, খোলা হাওয়ায় যদি খানিকটা ঘুরে বেড়াতে পারতে—মানে, খাওয়া-দাওয়া তো করা দরকার, তুমি কিছুই তো খাচ্ছ না।' আমার কথা শুনে মামীমা ব্যথা পেলেন। ব্যথা পেয়ে তিনি একটুও রাগ করলেন না। আগের মত তিনি আমায় শাসন করবার চেষ্টাও করলেন না। শরীরে আর এক বিন্দু শক্তি নেই ব'লেই হয়তো অত্যন্ত নরম গলায় তিনি বললেন, 'আমার কি খাবারের অভাব আছে রে? এখানেই তো প্রসাদ পাচ্ছি।'

'পাচ্ছ সে কথা ঠিক। কিন্তু বেশী কিছুই পাচ্ছ না। বাজারের সব চেয়ে ছোট ছোট ফল কেনেন মামা। দোকানদারেরা আজকাল মামাকে দেখলেই বুঝতে পারে যে, তিনি পুজোর ফল কিনতে আসছেন। মামীমা, তুমি একটু ভাল ক'রে খাওয়া-দাওয়া কর। কেবল প্রসাদ খেয়ে তো বেঁচে থাকতে পারবে না।'

আমি বুঝলুম, মামীমা আরও বেশী ব্যথা পেলেন। আমার কথার কোন প্রতিবাদ করলেন না তিনি। আমি দেখলুম, তাঁর চোখের নীচে কালি পড়েছে। স্বাস্থ্যহীনতার শতাধিক লক্ষণ তাঁর সর্বদেহে পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে। আধ্যাত্মিক উন্নতির লক্ষণ মামীমার মন এবং দেহের কোথাও নেই। মামীমা চুপ ক'রে রইলেন ব'লে আমি বললুম, 'আমি যাচ্ছি, মামীমা।'

লাইব্রেরি-ঘরে এসে টেবিল-চেয়ার সব মুছতে লাগলুম আমি। কাজে আজ একেবারেই মন বসছিল না আমার। ভাল লাগছিল না প্রতিদিনকার মত বইগুলোকে বুকে চেপে আদর করতে।

বইগুলোর দিকে চেয়ে চেয়ে প্রতিদিনই আমি স্বপ্ন দেখতুম। কবে আমি লেখাপড়া শিখব? বইগুলো সব পড়বার মত বিদ্যে আমার

কবে হবে ? আজও আমি এসব কথা ভাবছিলুম আর টেবিলের খোলা বইগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলুম।

সিঁড়ি দিয়ে কে যেন ওপরে উঠে আসছিলেন। মামার পায়ের শব্দ এ নয়। দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই আমি দেখলুম, মিসেস সবিতা গুপ্ত মামার সঙ্গে দেখা করতে আসছেন। বিধানচন্দ্র বালিকা বিদ্যালয়ের পরিচালক-কমিটীর সভাপতি ছিলেন মামা।

আমি বললুম, 'মামা তো এখনো ফেরেন নি। আপনি ভেতরে এসে বসুন। তিনি সম্ভবত এখুনি ফিরে আসবেন। বেলা তো কম হ'ল না।'

চেয়ারে ব'সে তিনি আমার দিকে চেয়ে রইলেন অনেকক্ষণ। কথা বললেন না একটিও। টেবিলে ছড়ানো বইগুলো আমি সাজিয়ে গুছিয়ে রাখছিলাম। তিনি আমার কাজ দেখছিলেন। তিনি আমার কাজ দেখবেন ব'লেই আমি হয়তো আজ বেশী মনোযোগ দিয়ে কাজ করছিলাম। খানিকক্ষণ পরে তিনি আমায় জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার নাম কি ?'

'জয়া বসু।'—আমি এসে তাঁর সামনে দাঁড়ালুম।

'নন্তুর কাছে তোমার কথা সব শুনলাম। ইচ্ছে করলে তুমি আমার ইস্কুলে ভর্তি হতে পার।'

'ভর্তি হওয়ার তো আমার খুবই ইচ্ছে, কিন্তু—'

'কিন্তু কি ?'—জিজ্ঞেস করলেন মিসেস সবিতা গুপ্ত।

আজ আর কোন কথা গোপন করব না ব'লে মনে মনে ঠিক ক'রে ফেললাম। এমন সুযোগ জীবনে আমার আর দ্বিতীয়বার আসবে না। তাই তাঁকে বললাম, 'মামা বোধ হয় ইস্কুলের মাইনে দিতে চাইবেন না।'

'কেষ্টনগরে তোমার মাইনে দিত কে ?'

'সেখানে আমার মাইনে লাগত না।'

মিসেস গুপ্ত চুপ ক'রে কি যেন ভাবতে লাগলেন। ইতিমধ্যে

সাহস আমার বেড়ে গেছে অনেক। আমি তাই বললুম, 'কেষ্টনগরে আমি কেবল প্রথম হয়ে পাস করতুম না, আমি শতকরা নব্বই ভাগ নম্বর রাখতুম—অঙ্কে আমার এক নম্বরও কাটা যেত না।'

'তাই নাকি?'—মিসেস গুপ্ত যেন কোথায় চ'লে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে ফিরে এসে তিনি পুনরায় বললেন, 'বেশ, আমিও তোমায় ফ্রী ক'রে দেব, যদি তুমি প্রথম হয়ে পাস করতে পার। কেবল তাই নয়, বইপত্তর তোমার একখানাও কিনতে হবে না। আমি তোমায় কিনে দেব সব।'

আনন্দের আতিশয্যে হঠাৎ আমি ব'সে পড়লাম মেঝের ওপর। মেঝের ওপর ব'সে মিসেস গুপ্তের পায়ের ধুলো নিয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'কবে থেকে ইস্কুলে যাব?'

'ফেব্রুয়ারি শেষ হয়ে যাচ্ছে—'

বাধা দিয়ে বললুম, 'তা যাক, আমার তাতে একটুও অসুবিধে হবে না। আপনি বলুন কবে থেকে আমি ইস্কুলে যাব? ইস্কুলটা তো আমি চিনি।'

হেসে ফেললেন মিসেস গুপ্ত। হাসতে হাসতে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'ইস্কুলটা তুমি চিনলে কি ক'রে?'

'বাজারে যাওয়ার পথে রোজ আমি তুবার ক'রে দেখি। সামনে গেটের ওপরে বড় বড় ক'রে লেখা রয়েছে বিধানচন্দ্র বালিকা বিদ্যালয়। সেদিন তো আমি একলাই বাজারে গিয়েছিলাম। ফিরতে প্রায় এগারোটা বাজল। গেটের কাছে পৌঁছতেই শুনি ঢং ঢং ক'রে ঘণ্টা বাজছে—ঠিক যেন আমাদের কেষ্টনগর ইস্কুলের ঘণ্টা। তারপরে কি হ'ল জানেন?'

'না তো, কি ক'রে জানব?'

'আমি ঢুকে পড়লাম ইস্কুলে। ভেতরে মস্তবড় একটা বাগান। তু গজ মাত্র রাস্তা গেছি। ও মা, কোথা থেকে একটা হিন্দুস্থানী

দারওয়ান এসে আমায় ধমকাতে লাগল। আমার হাতে ধ'রে মারল একটা টান—হাত থেকে বাজারের থলিটা গেল প'ড়ে। এক পোয়া আলু ছিল ওতে, আর দুটো ছোট ছোট কইমাছ ছিল। মামার জন্যে কইমাছ —তিনি বারোটার সময় কইমাছের ঝোল খেয়ে কলেজে পড়াতে যাবেন। কিন্তু এদিকে তো দারওয়ানটা আমার হাত থেকে সব ফেলে দিয়েছে— মেয়েরা আমায় ঘিরে মজা দেখছে। আমি কোনরকমে থলিটা নিলুম কুড়িয়ে। দারওয়ানটা হিড়হিড় ক'রে টানতে টানতে আমায় ফটকের বাইরে নিয়ে এসে ধমকে বললে, কক্ষনো আর এখানে ঢুকবি না। মা গো, লোকটার মুখভরা দাড়িগোঁফ, আর কী রাগী! বাড়ি ফিরে সে আর এক লঙ্কাকাণ্ড! মামা তো রেগে অস্থির! বেলা হয়েছে, এখনো কইমাছ রান্না হয় নি কেন? তারপর থলিতে যখন কইমাছ দুটো পাওয়া গেল না, তখন—উরে বাবা, দাড়িগোঁফ না থাকলে কি হবে, মামার সে কী রাগ! সেই তুলনায় আপনাদের দারওয়ান তো বাচ্চা ছেলে। যাকগে, তাতে আমার গালের কোন ক্ষতি হয় নি। মামা ঠাস ঠাস ক'রে আমার গালের ওপর চড় বসিয়ে দিলেন। আমি গুনি নি, তবু আন্দাজে বলতে পারি যে, সাতটা কি আটটা চড় এসে আমার গালের ওপর পড়ল। এজন্যে মামাকে অবশ্যি দোষ দেওয়া যায় না। সত্যিই তো, ফিরতে আমার অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল। মাছগুলো যে আপনাদের ইস্কুলে হারিয়ে এসেছি তাও তো মিথ্যে নয়? কি দরকার ছিল আমার ইস্কুলের মধ্যে ঢোকবার? কেষ্টনগর ইস্কুলের মত ঘণ্টা কি দুনিয়ায় আর কোথাও নেই? যাকগে সেসব পুরনো কথা। কবে থেকে আমি ইস্কুলে যাব? ঝি-চাকরাণীর কাজ করতে আমার আর ভাল লাগছে না, সবিতাদি।'

'কিন্তু—।' একটু ভেবে নিয়ে মিসেস গুপ্ত বললেন, 'এ বছরটা তো তোমায় মাইনে দিয়ে পড়তে হবে। তোমার হয়ে ডক্টর মিত্রের কাছে আমি-ই না হয় প্রতি মাসের মাইনেটা চেয়ে নেব।'

'পাবেন না। সংসার চালিয়ে মামার হাতে একটা পয়সাও থাকে না। তার ওপরে আমি এসে আবার তাঁর ঘাড়ে চেপে বসলুম। আমার কাপড়চোপড় কিনতে পয়সা খরচ হয়। আমার খাবার জন্যেও মামার খরচ হচ্ছে। তা হ'লে আমার কি ইস্কুলে আর পড়া হবে না?'

'হবে, নিশ্চয়ই হবে। পরে আমি ডক্টর মিত্রের সঙ্গে দেখা ক'রে সব ঠিক ক'রে নেব। আজ উঠছি।'

'কখন দেখা করবেন? কি বলব মামাকে?'

'কিছু বলতে হবে না। আমি দু-এক দিনের মধ্যেই আসব।'—এই ব'লে তিনি উঠলেন। আমি তাঁর পেছনে পেছনে দরজা পর্যন্ত এলুম। তিনি প্রথম সিঁড়িটায় যখন পা দিয়েছেন তখন পেছন থেকে আমি জিজ্ঞাসা করলুম—'আমি নিজেই যদি আজকালের মধ্যে টাকা যোগাড় করতে পারি?'

'সে কি? তুমি কি ক'রে টাকা যোগাড় করবে, জয়া?—' মিসেস গুপ্ত খুবই অবাক হলেন।

বললুম, 'মরবার সময় আমার মা কিছু সম্পত্তি দিয়ে গেছে আমাকে। সেটা বিক্রি করলে, মোটা টাকা না হোক, কিছু টাকা নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে।' সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে নামতে তিনি বললেন, 'দেখি, ডক্টর মিত্র যদি না দেন, তা হ'লে তোমার সম্পত্তি-বিক্রির কথা ভাবা যাবে।'

বেলা বারোটা বাজল, মামা এখনো ফিরলেন না। এতক্ষণ তিনি বাইরে গিয়ে কি করছেন? খুব দরকারী কাজ না থাকলে মামা ছুটির দিনে বাইরে যান না। গেলেও দু-এক ঘণ্টার মধ্যেই ফিরে আসেন। আজ তা হ'লে তিনি এত দেরি করছেন কেন? নন্তুদার জন্যে তিনি কি তবে উকিল-ব্যারিস্টার ঠিক করতে গেছেন? বিশ্বাস হয় না আমার।

মিসেস গুপ্ত চ'লে যাওয়ার পরে আমি লাইব্রেরি-ঘরে ব'সে ছিলাম। এ মাসের বাংলা মাসিক কাগজগুলো উল্টে-পাল্টে দেখছিলাম আমি।

বড় বড় ছুটো মাসিক কাগজে দেখলুম বড়মামার লেখা রয়েছে। আমি কবে লিখব? লেখাপড়া করবার সুযোগ পেলে আমি কেন বড়মামার চেয়ে ভাল লিখতে পারব না? কিন্তু ইস্কুলে ভর্তি হওয়ার পথ পাচ্ছি কই? বড়মামা ইস্কুলের মাইনে দেবেন ব'লে আমার একেবারেই বিশ্বাস হয় না।

একটু আগেই আমি যে মায়ের সম্পত্তির কথা সবিতা গুপ্তের কাছে উল্লেখ করেছিলাম, মনে আছে কি তোর, রত্না? সম্পত্তি মানে, সেই সোনার ফ্রেমটার কথাই আমি ভাবছিলাম। সোনার ফ্রেম দিয়ে মা যে বাবার ফোটোখানা বাঁধিয়ে রেখেছিলেন, তার খবর তো তোকে আগের চিঠিতেই জানিয়েছিলুম। এখন ইস্কুলের মাইনে যোগাবার জন্যে ফ্রেমটা বেচে ফেলবার ব্যবস্থা করা যায় কি? তা ছাড়া আমার অন্য কোন পথ ছিল না। মা মারা যাওয়ার পরে বাবার কাছ থেকেও কোন টাকা আসে নি। তাঁর সঙ্গে চিঠিপত্রের আদান-প্রদানও ছিল না।

একটু পরে সিঁড়িতে মামার পায়ের শব্দ পেলুম। তিনি আসছেন। কার উদ্দেশ্যে তিনি যেন বাক্যবাণ বর্ষণ করতে করতে উপরে উঠে আসছিলেন। আমি বেরিয়ে এলুম লাইব্রেরি-ঘর থেকে। জিজ্ঞাসা করলুম, 'কি হয়েছে মামা?'

'ঐ স্কাউণ্ড্রেলটার কাণ্ড দেখ্! ওকে খুব দিয়েছি।'

'কাকে দিলে?'

'তোর বাবা—হরিদাসকে।'

'কি দিলে? মানে—'

'মনি-অর্ডারটা ফেরত পাঠিয়ে দিলুম। তোর নামে সে দু শো টাকা পাঠিয়েছিল। আমরা কেন নিতে যাব তার টাকা? আমরা কি ওর কাছে ভিক্ষে করতে গেছি? কেন, জয়া কি তার মামার বাড়িতে খেতে পাচ্ছে না? তুই কি বলিস, জয়া? মনি-অর্ডার ফেরত দিয়ে ভাল করি নি?'

'খুব ভাল করেছ। কিন্তু তোমার এত দেরি হ'ল কেন? এমন ভাবে অনিয়ম করলে তোমার যে স্বাস্থ্য ভেঙে পড়বে মামা।'

লাইব্রেরি-ঘরে ঢুকে মামা বললেন, 'সি. আই. ডি. পুলিসের বড় সাহেব আমায় ডেকে পাঠিয়েছিলেন। তাঁকে কি ব'লে এলুম জানিস্?'

'না।'

পা থেকে মোজা খুলতে খুলতে মামা বললেন, 'তাঁকে বললুম যে, নন্তু আমার ছেলে নয়। ঠিক বলি নি?'

'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ, মামা।'

বললুম সাহেবকে, 'ফাঁসি দাও ওকে। আমার তাতে কিছু এসে-যাবে না। তোরা ভেবেছিস যে, আমি চোখের জল ফেলব? বোকা! জল এত শস্তা নয়। এক ফোঁটা জলও আমি নষ্ট করব না।'

'তুমি ঠিক বলেছ, মামা। এবার চান ক'রে নাও। মামীমার শরীরটা আজ খুবই খারাপ। অসময়ে খেয়ে তোমার শরীর যদি আবার ভেঙে পড়ে, তা হ'লে সংসারটাকে সামলাবে কে?'

গায়ের জামাটা খুলে আমার হাতে দিয়ে মামা এবার শান্ত সুরে বললেন, 'আমার শরীর যদি কোনদিন ভেঙে পড়ে তা হ'লে জানবি, এর জন্যে দায়ী নন্তু।'

'আমরা তো তাই জানি, তুমি স্বীকার কর না-কর। আচ্ছা, উকিল-ব্যারিস্টার লাগালে—'

কথা শুনে মামা একরকম তেড়ে এলেন আমার দিকে। এসে বললেন, 'নন্তু আমাদের কেউ নয়।'

আলোচনাটা অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেবার জন্যে মামাকে আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'আচ্ছা, মনি-অর্ডারের কুপনটা তুমি পড় নি? বাবা কি একটা লাইনও লেখেন নি?'

বড়মামা সহসা আমায় তাঁর বুকের কাছে টেনে নিয়ে বললেন,

'এখানে তোকে কেউ যত্ন করে না, যত্ন করবার মত নেইও কেউ। বাবার কাছে যাবি, জয়া?'

'না মামা। তোমাদের কাছেই তো আমি খুব ভাল আছি।'

'মিছে কথা বললি? সেদিন তোকে অমন ক'রে মারলুম, তবু তুই বলছিস, এখানে ভাল আছিস?'

'হ্যাঁ মামা, তবু বলছি এখানে আমি ভাল আছি। কেষ্টনগর থেকে তুমি যদি কুড়িয়ে না নিয়ে আসতে, তা হ'লে আজ আমি কোথায় থাকতুম?'

কাপড়ের কোঁচা দিয়ে বড়মামা চোখ মুছলেন। মামা তবু বলেন যে, নন্তুদার জন্যে তিনি নাকি এক ফোঁটা জলও নষ্ট করতে রাজী নন!

সেই দিনই বিকেলবেলা ঝরনা এল। আমার সঙ্গে ওর আগে একদিন দেখা হয়েছিল। আমার ঘরে ব'সেই দুজনে গল্প করছিলাম। আমার ইস্কুলে ভর্তি হবার কথা নিয়ে খানিকক্ষণ আলোচনার পরে ঝরনা উঠে গিয়ে হঠাৎ ঘরের দরজাটা দিলে বন্ধ ক'রে।

জিজ্ঞাসা করলুম, 'ব্যাপার কি, দরজা বন্ধ করলে যে?'

'একটা গোপনীয় কথা আছে। নন্তুদাকে তো তুমি খুব ভালবাসতে?' —ঝরনা এসে বসল আমার গা ঘেঁষে।

বললুম, 'হ্যাঁ, ভালবাসতুম। তবে, এসব চুরি-ডাকাতির ব্যাপারটা তার আমার একেবারেই ভাল লাগে নি।'

'সে কি!'—ঝরনা যেন আকাশ থেকে প'ড়ে পুনরায় বললে, 'দেশের স্বাধীনতার জন্যে ব্যাঙ্ক থেকে দু লাখ টাকা নেওয়াকে ডাকাতি বলে না। তাও তো টাকাটা কাজে লাগল না, ধরা প'ড়ে গেল। একে ডাকাতি বল তুমি?'

'হ্যাঁ ভাই। প্রয়োজন যত বড় হোক, ডাকাতিকে ডাকাতি ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। তা ছাড়া নন্তুদার এখন লেখাপড়া

করার বয়স, স্বাধীনতার জন্যে ডাকাতি করতে যাওয়া তার উচিত হয় নি।'

আমার কথা শুনে ঝরনা একেবারে চুপ ক'রে গেল। একটু বাদেই আমি ওকে বললুম, 'আমার কথা ছেড়ে দাও, আমি তো পাড়াগাঁ থেকে এসেছি। কিন্তু তুমি তো তোমার গোপনীয় কথাটা বললে না, ভাই?'

'কি ক'রে বলি? তোমাকে বিশ্বাস করি কি ক'রে?'

'নন্তুদার কথা তুমি আমায় নির্ভয়ে বলতে পার।'

এর মধ্যে ঝরনা বার কয়েক জানলার কাছে গিয়ে রাস্তার দিকে কি যেন দেখে এল। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'তোমার সঙ্গে কেউ এসেছে নাকি?'

'হ্যাঁ, নন্তুদাদের দলের লোক। জান তো টাকার অভাব বলেই ওরা নন্তুদার জন্যে উকিল-ব্যারিস্টার রাখতে পারে নি।'

ঝরনার কথা শুনে তক্ষুনি আমি বললুম, 'মামা কিন্তু মকদ্দমার জন্যে এক পয়সাও খরচ করবেন না।'

'জানি, দলের লোকেরাও তাই জানে। কিন্তু নন্তুদাকে কি ক'রে সাহায্য করা যায় সেইটেই এখন আমাদের ভাবতে হবে। টাকা তো কম লাগবে না!'—জানলা দিয়ে রাস্তার দিকে চেয়ে ঝরনা তার গলার স্বর নীচু ক'রে আবার বললে, 'নন্তুদা জানতে চেয়েছে যে, তোমার মামীমার গহনাগুলো মকদ্দমার খরচের জন্যে ব্যবহার করা যায় কি না?'

'মামীমাকে তা হ'লে আমি জিজ্ঞাসা ক'রে আসি।'—এই ব'লে আমি উঠতে যাচ্ছিলাম। ঝরনা আমায় টেনে ধ'রে রাখল, উঠতে না দিয়ে বললে, 'তুমি বড্ড ছেলেমানুষ ভাই। জিজ্ঞাসা করতে গেলে চার দিকে হৈ-চৈ প'ড়ে যাবে। তোমার মামাকে তো আর কারো চিনতে বাকি নেই।'

'তবে?'—এমন ভাবে প্রশ্নটা আমি করলুম যেন আমি নিজেই আজ একটা অসহায় অবস্থার মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়েছি। বোধ হয় এমন

অবস্থা থেকে উদ্ধার করবার জন্যেই ঝরনা আমায় বলল, 'কাউকে কোন কথা জানিয়ে দরকার নেই। মামীমার আলমারির চাবিটা কোথায় ?'

ঝরনার কণ্ঠস্বরে বিন্দুমাত্র অস্বাভাবিকতার সুর শোনা গেল না। যতটা সম্ভব আমার নিজের মনের অবস্থাটা ওকে জানতে না দিয়ে বললুম, 'চাবিটা মামীমার বালিশের তলায় থাকে।'

'নিয়ে আসতে পার ?'—জিজ্ঞাসা করল ঝরনা।

'পারি। কিন্তু চাবি দিয়ে কি করবে ?'

'আমি কিছুই করব না। তোমাকেই আলমারিটা তাঁর খুলতে হবে।'

'কেন ?'

'গহনার বাক্সটা আমাদের চাই।'

আমি কিছু বলার আগেই দেখলাম যে, দলের লোকটি মাঝে মাঝে জানলা দিয়ে উঁকিঝুঁকি মারছে। আমার ভয় করতে লাগল। আমি চুপ ক'রে আছি দেখে ঝরনা জিজ্ঞাসা করল, 'এটুকু কাজ কি তুমি নন্তুদার জন্যে করতে পারবে না ?'

'না।'

'কেন ?'

'আমি চুরি করতে পারব না।'—আমার জবাবের মধ্যে যে নৈতিক জোর রয়েছে ঝরনার বুঝতে তা একটুও কষ্ট হ'ল না। জানলার বাইরে দাঁড়িয়ে দলের লোকটি আমার কথা শুনতে পেয়েছে। শুনতে পেয়েছে ব'লেই সে বললে, 'বড্ড দেরি হয়ে যাচ্ছে। তোমাদের কথা কি শেষ হয় নি ?'

'কথা শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু কাজটা হ'ল না।'—ঝরনার কণ্ঠস্বরে হতাশার পরিমাণ প্রচুর।

ঘরের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে লোকটি তখন বললে, 'নন্তুকে তা হ'লে

বাঁচানো গেল না। আশ্চর্য, সবাই খেয়ে-দেয়ে নাকে তেল দিয়ে ঘুমবে, আর আমরা কেবল বনবাদাড়ে ইংরেজের গুলি খেয়ে মরব! চ'লে এস ঝরনা—'

আমি বললুম, 'একটু দাঁড়াও।'—ঝরনাকে দাঁড়াতে ব'লে আমি চ'লে এলুম মামীমার ঘরে। মামীমা অবিশ্যি তখন ঘরে ছিলেন না। আমার ট্রাঙ্কটা মামীমার তক্তাপোশের তলায় এনে রাখা হয়েছিল কদিন আগে।

একটু পরে আমার নিজের ঘরে ফিরে এসে ঝরনাকে বললুম, 'এই ফোটোখানা আমার বাবার। মা এই ফোটোখানা বাঁধিয়েছিলেন সোনা দিয়ে। অনেকটা সোনা আছে এতে। এটা বেচে কি তোমরা নন্তুদার জন্যে উকিল-ব্যারিস্টার রাখতে পারবে না?'

'নিশ্চয়, নিশ্চয়। দেখি।'—বাইরে থেকে জানলা দিয়ে হাত বাড়াল দলের লোকটি। ঝরনা ফোটোখানা গলিয়ে দিল তার হাতে। মুহূর্তের মধ্যে সে সোনার ফ্রেমটা খুলে নিয়ে বাবার ফোটোটা ছুঁড়ে ফেলে দিল ঘরের দিকে। তারপর সে বললে, 'ঝরনা, আমি যাচ্ছি। উপস্থিত এইটেতেই অনেক কাজ হবে।'

লোকটি অন্তর্হিত হয়ে গেল।

ঝরনাও গেল। গেল এক ঘণ্টা পরে।

রাত বোধ হয় আটটা হবে। আমি মামার লাইব্রেরি-ঘরে গিয়ে বসলাম। তিনি বেড়াতে বেরিয়েছেন। সাড়ে আটটার মধ্যেই ফিরে আসবেন। ইস্কুলে ভর্তি হবার আর তো কোন রাস্তা নেই। অতএব, আমি নিজেই আজ মামাকে অনুরোধ করব ব'লে মনে মনে ঠিক ক'রে রাখলাম। বাবার টাকা তো মামা নিজেই আজ ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছেন। বিকেলবেলা ঝরনা এসে আমার শেষ সম্পত্তিটুকুও নিয়ে গেল। সোনার ফ্রেমটা দিয়ে দিলুম ব'লে আমার বিন্দুমাত্র অনুতাপ আসে নি। নন্তুদা যদি মুক্তি পায়, তা হ'লে আমার অনুতাপ করার

কোন কারণই থাকবে না। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার চেয়ে সেদিন নন্তুদার মুক্তির মূল্য আমার কাছে ছিল অনেক বেশী।

সাড়ে আটটার সময় মামা বাড়ি ফিরলেন। সিঁড়ি দিয়ে তিনি ওপরে উঠছেন। বড্ড ভয় করতে লাগল। আমার অনুরোধ যদি তিনি না রাখেন? লাইব্রেরি-ঘরে মামার মন এবং চেহারা যেত বদলে। একতলার সাংসারিক মামার সঙ্গে যে দোতলার জ্ঞানতপস্বীর একেবারেই মিল ছিল না—সে কথা তো তোকে আগের চিঠিতেই জানিয়েছি। আজ সেই বিশ্বাসটুকুর ওপর নির্ভর ক'রে মামার কাছে আমার আর্জিটা পেশ করব ব'লে আমি মনে মনে শক্তি সঞ্চয় করতে লাগলাম।

মামা এলেন। কোন কথা বললেন না আমার সঙ্গে। সোজা গিয়ে ব'সে পড়লেন চেয়ারে। কেম্‌ব্রিজ ইতিহাসের বেশ মোটা একটা ভ্যলুম খোলাই প'ড়ে ছিল টেবিলের ওপর। তিনি সেই বইখানার মধ্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন। আমি চেয়ে রইলাম মামার মুখের দিকে। আমার মনে হ'ল, মামার মন আজ ইতিহাসের বইতে আবদ্ধ নেই।

আমার আন্দাজ মিথ্যে হ'ল না। একটু পরেই তিনি আমায় ডাকলেন, 'জয়া—'

'আসছি মামা।' আমি তাঁর বাঁ দিকে গিয়ে দাঁড়ালুম। আমার ঘাড়ে হাত রেখে তিনি বললেন, 'কাল থেকে তুই ইস্কুলে পড়তে যাবি।'

'কোন্ ইস্কুলে?'—কথাটা সত্যি কি না পরীক্ষা ক'রে দেখবার জন্যেই প্রশ্নটা আমি করলুম।

'বিধানচন্দ্র বালিকা বিদ্যালয়ে। মিসেস গুপ্তর ওখানে আমি গিয়েছিলাম। টাকাপয়সার ব্যবস্থা সব আমি ক'রে দিয়েছি। একটা বছর তোর শুধু শুধু নষ্ট হ'ল!'

'তা হোক, আর তো নষ্ট হওয়ার ভয় রইল না।'

'আমারই দোষ। যার লেখাপড়া হওয়ার নয়, তার জন্যে কত টাকাই না নষ্ট করলুম! যাক, আমার আর দুঃখ নেই। ছেলের অভাব

বোধ হয় তুইই মেটাতে পারবি। দিনকাল বদলে যাচ্ছে, জয়া। ছেলেদের সমান হচ্ছে মেয়েরাও।'

'কেবল সমানই হচ্ছে? তাদের কি মেয়েরা ছাড়িয়ে যেতে পারছে না, মামা?'

'পারবে, নিশ্চয়ই পারবে।'—সহসা মামা চিন্তার মধ্যে ডুবে গেলেন। আমি চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলাম তাঁর পাশেই। একটু পরেই পা টিপে টিপে আমি ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলাম। মামা ডাকলেন আমায়, 'জয়া—'

ঘুরে দাঁড়িয়ে জবাব দিলুম, 'এই যে মামা।'

মামার মুখের দিকে চেয়ে দেখলুম যে, তিনি এ ঘরে এখন উপস্থিত নেই। কি যেন তিনি চিন্তা করছেন খুব গভীরভাবে।

আমি চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলুম। হঠাৎ মামা কথা বলতে লাগলেন। কথা ঠিক নয়, বক্তৃতা। মনে হ'ল, তিনি যেন তাঁর ক্লাসের ছাত্রদের উদ্দেশ ক'রে বলছেন, 'নন্তু স্বাধীনতা চায়, আমি চাই নে? কিন্তু স্বাধীনতার জন্যে নন্তু যা করেছে, আমি তা করতে পারি নে। শাসক-ইংরেজ আর সভ্য-ইংরেজের মধ্যে অনেক তফাত। ইংরেজদের তোরা ভয় করিস, আমি করি নে। পাশ্চাত্ত্য-সভ্যতার আলো যদি ওরা না জ্বালত, তা হ'লে হিন্দুস্থানের হিন্দী-অন্ধকার দূর হ'ত কি ক'রে? জয়া, বাইরের শত্রু এসে কোন সভ্যতাই নষ্ট করতে পারে না। প্রথমে সভ্যতা নষ্ট করে ভেতরের শত্রু। তা ছাড়া, জাতি যদি প্রথমে আত্মহত্যা না করে, তা হ'লে বিদেশী শত্রু এসে ঘাড়ের ওপর চেপে বসতে পারেও না। সে যাক। আমি কেবল তোদের এইটুকুই বলতে চাই যে, নন্তু আমাদের কেউ নয়।'—এই পর্যন্ত ব'লে মামা সহসা বক্তৃতা দিলেন বন্ধ ক'রে। দু হাতের মধ্যে মাথা গুঁজে তিনি ব'সে রইলেন, একটি কথাও আর বললেন না।

আমি নিঃশব্দে সেখান থেকে বেরিয়ে এলাম।

পরের দিন মামা নিজেই আমায় ইস্কুলে নিয়ে গিয়ে ভর্তি ক'রে দিয়ে এলেন। পার্স থেকে গুনে গুনে টাকা বার করলেন তিনি। এক মুহূর্তের জন্যেও তাঁর হাত কাঁপল না। আমি ভর্তি হয়ে গেলুম। মাত্র এক দিনের মধ্যে মামা আমার ওপর এতটা স্নেহশীল হয়ে উঠলেন কি ক'রে? এ সম্বন্ধে আমি অনেক ভেবেছি। একটা কারণ ছাড়া, দ্বিতীয় কারণ আমি খুঁজে পাই নি। লেখাপড়াকে মামা দেবতার চেয়েও বেশী ভালবাসতেন। নন্তুদা তাঁকে হতাশ করেছে ব'লেই হয়তো তিনি তাঁর সবটুকু স্নেহ সেদিন আমার ওপর ঢেলে দিয়েছিলেন।

আমার নতুন জীবন আরম্ভ হ'ল। ইস্কুলে যেতে শুরু করলুম। ইস্কুলে ভর্তি হওয়ার পরের দিন মামা আমায় বললেন, 'আজ থেকে তোকে আর বাজারে যেতে হবে না। আমি একলাই বাজার ক'রে নিয়ে আসব।'

'কেন মামা?'

'এখন থেকে তোকে লেখাপড়া করতে হবে। এদিককার কাজও তো তোর অনেক!'

'তা হোক। এদিককার কাজ করব, বাজার করব এবং লেখাপড়াও করব।'—এই ব'লে আমি বাজারের ব্যাগটা হাতে নিয়ে বাইরের দরজার দিকে এগিয়ে গেলুম।

মামা বললেন, 'বেশ, আজ চল আমার সঙ্গে। কাল থেকে তোর আর যাওয়ার দরকার হবে না।'

বাজারের দিকে হাঁটতে হাঁটতে মামা বলতে লাগলেন, 'পরীক্ষায় কিন্তু তোর প্রথম হয়ে পাস করা চাই, জয়া। মামার মুখরক্ষা করতে পারবি তো?'—প্রশ্নটা ক'রে তিনি আমার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন বাজারের ফটকের সামনে। আমিও মামার চোখের দিকে সোজাভাবে চেয়ে গম্ভীরভাবেই বললাম, 'তোমার কোন ভাবনা নেই, মামা। তুমি দেখো, আমি তোমার মুখরক্ষা করবই।'

'সাবাস, সাবাস!'—বলতে বলতে মামা ঢুকে পড়লেন বাজারে। মাছের দোকানের সামনে এসে তিনি যেন তাঁর মনের কথাটা ব্যক্ত করবার জন্যে বললেন, 'তুই তো হাজার হ'লেও মেয়েমানুষ। মেয়েমানুষের কাছে কী আর আশা করা যায়, বল্?'

'কী এবং কতটা তুমি আশা কর বল?'—পাল্টা প্রশ্ন করলাম আমি। আমার প্রশ্নটার জবাব না দিয়ে মামা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন।

মামার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলবার কারণটা বুঝতে আমার অসুবিধে হ'ল না।

এক সপ্তাহ পরে মিসেস সবিতা গুপ্তকে মামা ডেকে পাঠালেন। সেদিনটা ছিল রবিবার। তিনি এসে বসলেন লাইব্রেরি-ঘরে। সেখানে আমিও ছিলুম। মামা মিসেস গুপ্তের হাতে টাইপ-করা একটা চিঠি দিয়ে বললেন, 'আমি আপনাদের ইস্কুলের সঙ্গে আর কোন যোগাযোগ রাখতে চাই নে। সভাপতির পদ থেকে আমি স'রে দাঁড়ালুম।'

'কেন বলুন তো?'—জিজ্ঞাসা করলেন মিসেস গুপ্ত।

মামা তক্ষুনি জবাব দিলেন না। তিনি পশ্চিম দিকের শেল্ফের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। মেঝে থেকে একেবারে সিলিং পর্যন্ত থাক-ভর্তি বই। এদিককার বইগুলো ইতিহাসের নয়, সবই শিক্ষা সম্পর্কে। দু-একখানা বই টেনে নিয়ে মামা উল্টেপাল্টে দেখতে লাগলেন। কি যেন তিনি ভাবছিলেন।

একটু পরে ডক্টর যাদব মিত্র এসে ব'সে পড়লেন তাঁর চেয়ারে। মিসেস গুপ্তের দিকে চেয়ে তিনি বললেন, 'অসহযোগ আন্দোলনের পরেই আমার উচিত ছিল বাংলা দেশের সব শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন করা।'

'কেন, ডক্টর মিত্র?'—জিজ্ঞাসা করলেন মিসেস গুপ্ত।

এবার মামা উত্তর দিতে দেরি করলেন না, বললেন, 'শিক্ষার প্রতি

মানুষের আর সম্ভ্রমবোধ নেই। আমার বিশ্বাস, আর বিশ-বাইশ বছরের মধ্যে শিক্ষার মূলগত অর্থ যাবে বদলে। এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলো রাজনীতি চর্চার আখড়া হয়ে উঠবে।'

'আর একটু ব্যাখ্যা ক'রে বলুন।'—অনুরোধ জানিয়ে মিসেস গুপ্ত পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'উনবিংশ শতাব্দীর ট্র্যাডিশন ক্রমে ক্রমে উঠে যাচ্ছে ব'লে কি আপনি ভয় পাচ্ছেন, ডক্টর মিত্র?'

'ব্যক্তিগত ভাবে আমার ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই। মিসেস গুপ্ত, আপনি এইমাত্র ট্র্যাডিশনের কথা বলছিলেন না? দেখুন, বর্বর যুগ থেকে এ পর্যন্ত মানুষ যত রকমের শিক্ষা-ব্যবস্থা উদ্ভাবন করেছিল তার মধ্যে দুটো উপাদান ছিল অত্যাবশ্যক—একটা ট্র্যাডিশন এবং অপরটা হচ্ছে টেকনিক। আজ পর্যন্ত আমরা ট্র্যাডিশনকেই বেশী প্রাধান্য দিয়ে এসেছি। এটা তর্কের বিষয় নয়, এটা ঐতিহাসিক সত্য। আজ আমরা কি দেখছি? সমাজের কোন স্বাধীন অস্তিত্ব নেই। সমস্ত ক্ষমতা গিয়ে কেন্দ্রীভূত হচ্ছে রাজনীতির হাতে। অতএব, শিক্ষা আর সত্যিকার শিক্ষা থাকছে না। অসহযোগ আন্দোলন ভাল কি খারাপ, তা নিয়ে আলোচনা করব না। কিন্তু অসহযোগ আন্দোলনের মধ্যে আমি ভবিষ্যৎ মানুষের মনের একটা স্পষ্ট ছবি দেখতে পেয়েছি। আমায় আপনারা মুক্তি দিন, মিসেস গুপ্ত।'

মিসেস গুপ্ত বললেন, 'সারা ভারতবর্ষের প্রত্যেকেই তো আজ ইংরেজের বিরুদ্ধে ধর্মঘট ঘোষণা করেছে। প্রত্যক্ষভাবে না করলেও, মনে মনে যে করেছে সে সম্বন্ধে আর ভুল নেই।'

মিসেস গুপ্তের কথা শোনবার পরে মামা বার কয়েক ঘরের মধ্যেই পায়চারি করলেন। তারপরে তিনি বললেন, 'ইংরেজ এ দেশে চিরদিন থাকতে পারবে না। আমরা ধর্মঘট না করলেও ওরা চ'লে যাবে। চ'লে যেতে বাধ্য হবে।' দেওয়ালে টাঙানো ভারতবর্ষের মানচিত্রটার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন মামা। তিনি চেয়ে ছিলেন

বাংলা দেশের দিকে। তারপরে তিনি যখন আমাদের দিকে মুখ ঘোরালেন, আমরা তখন দেখলুম যে, মামার সমস্ত মুখখানার ওপরে ভীষণ এক শোকের ছায়া পড়েছে। মনে হয়, তিনি যেন শোকের ছায়াটাকে কুড়িয়ে নিয়ে এলেন মানচিত্রের বাংলা দেশ থেকে।

মিসেস গুপ্তকে লক্ষ্য ক'রে তিনি বললেন, 'একবার যখন শিক্ষার ইজ্জত নিয়ে মাঠে ময়দানে হুল্লোড় আরম্ভ হয়েছে, তখন আমরা আর পারব না এর ইজ্জত বাঁচিয়ে রাখতে। মিসেস গুপ্ত, ভারতবর্ষের এতে কতটা ক্ষতি হবে বলতে পারি নে, কিন্তু বাংলা দেশের ক্ষতি আর কোনদিনই পূরণ হবে না।'

'তার মানে ?'—মিসেস গুপ্ত একটু চমকে উঠে পুনরায় প্রশ্ন করলেন, 'তার মানে কি, ডক্টর মিত্র ? বাংলা দেশ কি ভারতবর্ষের চেয়েও বড় ?'

'গায়ে-পায়ে বড় না বটে, কিন্তু বাংলার সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য—। থাক্, এ নিয়ে আর আলোচনা করবার দরকার নেই। মিসেস গুপ্ত, কোনরকম আলোচনার দ্বারাই আমরা আর বাংলার সর্বনাশ ঠেকাতে পারব না। অতএব আমায় আপনারা ছুটি দিন। নমস্কার।'

সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাবার সময় মিসেস গুপ্ত আমায় বললেন, 'তোমার মামা ইংরেজদের বড্ড বেশী ভালবাসেন।'

'হ্যাঁ, মামা নন্তুদার ঠিক উল্টো। কাল পার্কের মীটিংয়ে কি হয়েছিল জানেন ?'

'কি হয়েছিল ?'

'নন্তুদার মকদ্দমার খরচ তোলবার জন্যে পার্কে একটা মীটিং হয়েছিল। ছেলে আর মেয়েদের কি ভিড়! মঞ্চের ওপর নন্তুদার একটা ফোটো টাঙানো হ'ল। ছেলেরা সব চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলতে লাগল যে, নন্তুদার জন্যে ওরা সব জীবন দেবে, রক্ত দেবে ইত্যাদি। কিন্তু উকিল-ব্যারিস্টাররা রক্ত আর জীবন নিয়ে কি করবেন ? তাঁরা চান টাকা। রক্তের চেয়ে যে টাকার দাম বেশী তা অবিশ্যি মেয়েরা সব জানত।

ছেলেদের চেঁচানো থেমে যেতেই মেয়েরা সব নন্তুদার ফোটোর দিকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে সোনার গহনা ফেলতে লাগল। উঃ, সে কত গহনা!'

এই পর্যন্ত শুনে মিসেস গুপ্ত বললেন, 'সোনার বাংলার এই তো হ'ল আসল ইতিহাস! তোমার মামা লেখেন কি? লেখেন তো কতকগুলো খ্রীষ্টাব্দ আর তারিখ। জয়া, স্বাধীন ভারতবর্ষে বাংলার নন্তুরাই তো সব সোনার সিংহাসনে বসবে।'

'আপনি বোধ হয় ঠিকই বলেছেন। কিন্তু পার্কের ঘটনা সব শুনুন। ভিড় ঠেলে আমি একেবারে মঞ্চের সামনে গিয়ে দাঁড়ালুম। ছেলেরা রক্ত দেবার জন্যে আবার চিৎকার শুরু করল, আর মেয়েরা ছুঁড়তে লাগল সোনার চুড়ি, আংটি, কানের দুল—বৃষ্টির মত সব পড়তে লাগল মঞ্চের চারদিক দিয়ে। এত সোনা জীবনে আমি কখনো দেখি নি, সবিতাদি। ইচ্ছে করছিল, হাত দিয়ে সোনার জিনিসগুলো একটু ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখি। ওমা, ঠিক এই সময় একটা মস্ত বড় সোনার হার এসে ছিটকে পড়ল আমার হাতের ওপর। হাতের ওপর লেগে প'ড়ে গেল মাটিতে। অন্য কেউ দেখতে পায় নি, কারণ সবাই তখন ছুটছে। পুলিসেরা সব পার্কের মধ্যে ঢুকে প'ড়ে লাঠি মারছে। বে-আইনী সভা। আমি তাড়াতাড়ি হারটা মাটি থেকে তুলে নিলুম। পলকের মধ্যে লুকিয়েও ফেললুম। এখন কি করি? সবাই তো সব কিছু ফেলে পালিয়ে যাচ্ছে। নন্তুদার ফোটোখানা পর্যন্ত ফেলে গেল ওরা! পুলিস এখুনি লাঠি মেরে ফোটোখানা হয়তো ফাটিয়ে ফেলবে। বড্ড মুশকিলেই প'ড়ে গেলুম আমি। নন্তুদার প্রতি ছেলেদের যদি বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা থাকত, তা হ'লে সোনার গহনাগুলো ফেলে দিয়েও ফোটোখানা নিয়ে পালিয়ে যেত ওরা। তা যখন ওরা করল না, আমিই শেষ পর্যন্ত নন্তুদার ছবিখানা নিয়ে ওখান থেকে দিলুম এক ছুট। পার্কের পেছন দিকের রাস্তায় পুলিস কেউ ছিল না ব'লে আমার পালিয়ে আসতে অসুবিধে হ'ল না।'

'সোনার হারটা কি করলে?'—জিজ্ঞাসা করলেন সবিতাদি।

বললুম, 'আমার কাছেই আছে।'

'নস্তুর দলের লোকদের কাছে পাঠিয়ে দাও নি কেন?'

'ওমা, পাঠিয়ে দেব কি ক'রে, নস্তুদার দলের লোকদের তো আমি চিনি না। ভাবছি, ঝরনার কাছেই পাঠিয়ে দেব। ছুপুরবেলা আপনাদের বাড়ি আমি যেতুমই।'

আমার কথা শুনে মিসেস গুপ্ত বেশ খানিকটা অবাক হয়ে আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'অপরের সোনার হার ঝরনা নেবে কেন? তা ছাড়া এসব বৈপ্লবিক দলের সঙ্গে ঝরনার তো কোন সম্পর্কও নেই।'

'ওমা, সে কি কথা! হারটা তো ঝরনারই। ঠিকমত ছুঁড়তে পারলে হারটা তো মঞ্চের ওপরে গিয়েই পড়ত। ঝরনার ভাগ্য ভাল ব'লেই ওটা ছিটকে এসে পড়ল একেবারে আমার হাতের কাছে।'

'ঝরনার হার?'—মিসেস গুপ্তের কণ্ঠস্বরে কম্পন, 'ওর বিয়ের জন্মে ছ'ভরি সোনা দিয়ে হারটা আমি গড়িয়ে রেখেছি। জয়া!'

'সবিতাদি।'

'নস্তুর জন্মে ঝরনা কেন যাবে সোনা ছুঁড়তে?'

'এর জবাব তো ঝরনা দিতে পারবে, সবিতাদি।'

'জয়া!'

'বলুন।'

'হারটা আমায় ফিরিয়ে দাও।'

ঠিক এই সময় বাইরের দরজা দিয়ে ঝরনা এসে উপস্থিত হ'ল।"

॥ অষ্টম রাত্রি ॥

"ইস্কুলে ভর্তি হওয়ার পরে কয়েকটা বছর কেটে গেল অতি নিঃশব্দে। নন্তুদার দ্বীপান্তর হয়েছে—বারো বছর তার কাটাতে হবে ইংরেজদের কারাগারে। স্পেশাল ট্রাইবুনালে নন্তুদাদের বিচার হ'ল। যেদিন রায় দেবার কথা, সেদিন মিসেস গুপ্তের সঙ্গে আমিও গিয়েছিলাম আলিপুরের আদালতে। কী অপূর্ব দৃশ্যই না আমি দেখেছিলাম সেদিন!

আজ উনিশ শো সাতচল্লিশ সনে ব'সে মনে হচ্ছে যে, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রামের সরকারী ইতিহাসের কোন একটা পাতায় যদি আদালতের এই দৃশ্যটার বর্ণনা লেখা থাকত, তা হ'লে ইতিহাসের মর্যাদা বাড়ত অনেক বেশী। কেবল মর্যাদা নয়, ইতিহাসের মধ্যে সত্যের আলেখ্য আমরা সবাই দেখতে পেতুম নিঃসন্দেহে। পথের ভুল হয়তো নন্তুদাদের হয়েছিল, কিন্তু আদর্শের মধ্যে কোনও ভুল ছিল না। আজকে তো বাংলা দেশের মেরুদণ্ড ভাঙা—নইলে আমরাই কেবল পারতুম নন্তুদাদের আদর্শের আগুন ইতিহাসের পাতায় এনে লিপিবদ্ধ করতে। জানি, ভারতীয় ঐতিহ্যে হিংসার কোন স্থান নেই। কিন্তু আমার মনে হয়, নন্তুদাদের স্বদেশপ্রেমের ইতিহাস আধুনিক ভারতের সব চেয়ে গর্বের বিষয়। সব চেয়ে দুঃখের কথা যে, ডক্টর যাদব মিত্রের মত ভারতবিখ্যাত ঐতিহাসিকের চোখে এত বড় সম্মানিত সত্য আজও ধরা পড়ল না।

আমরা যখন আদালতে গিয়ে পৌঁছলাম তখন বেলা এগারোটা। আজ যে 'রায়' বেরুবে মামা তা নিশ্চয়ই জানেন। সকাল থেকে তিনি শুয়ে আছেন। চা খেলেন না। আমি চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, 'চা খেলে না কেন, মামা?' তিনি উল্টো দিকে মুখ ক'রে বললেন, 'শরীরটা ভাল নেই। আজ আর চা খাব না।'

'কি হয়েছে তোমার? জ্বর নাকি?'—এই ব'লে আমি ডান

হাতটা মামার কপালের ওপরে রেখে আমিই আবার বললুম, 'গা তো একেবারে ঠাণ্ডা! নাও, চাটুকু খেয়ে নাও, মামা।'

'গা ঠাণ্ডা হ'লে কি হবে, পেটের অবস্থা ভাল না। আজ আর আমায় চা খেতে বলিস না। ইন্ ফ্যাক্ট, আজ আমি কিছুই খাব না। এমন কি, জল পর্যন্ত না। জয়া, কাল আমি কোথায় গিয়েছিলুম, জানিস?'

'তুমি না বললে কি ক'রে জানব, মামা?'

আমার দিকে মুখ ক'রে মামা এবারে গম্ভীর সুরে বললেন, 'পাপ করতে গিয়েছিলাম।' একটু থেমে তিনি আবার বললেন, 'নন্তু আমাদের কেউ না। অপূর্ব ভালই করেছে, আমার সঙ্গে দেখা করে নি।'

'তার মানে?' ব্যাপারটা বুঝতে পেরেও আমি যেন কিছুই বুঝতে পারি নি, এমন ভাব দেখালুম। তিনি থেমে থেমে বলতে লাগলেন, 'এই সময় অপূর্বর সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া ঠিক হয় নি। মনে হ'ল, আমি যে ওর ওখানে যাব তা সে জানত।'

'কি ক'রে জানত? ছোট মামা আই. সি. এস. ব'লে কি ছুনিয়ার সব কিছুই জানেন?'

'দেখ্ জয়া, ওর বাড়িতে ঢুকতে আমি তো কোনদিনই বাধা পাই নি। ছোট ভাই যদি লাটসাহেবও হয় তবুও তার বাড়িতে ঢুকতে আমি কখনও ওর অনুমতি নিতাম না। আর আজকে যখন ওর আলিপুরের বাড়িতে গিয়ে ঢুকলাম, তখন ওর স্টেনো অবনী এসে বলল, 'আপনি বাইরের ঘরে বসুন।' আমার মনে হ'ল, অবনী যেন আমার জন্যেই অপেক্ষা করছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'বাইরের ঘরে বসব কেন, অপূর্ব কি বাড়ি নেই? বউমা?'

'সাহেব আজ কারও সঙ্গে দেখা করবেন না— মেমসাহেব কলকাতায় নেই।'

'অপূর্ব দেখা করবে না কেন?'

'তিনি ব্যস্ত। জরুরী কাজ আছে বলেই তিনি মেমসাহেবকেও কলকাতার বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছেন।'

'ওঃ! বুঝতে পেরেছি। এই ব'লে সেখান থেকে আমি চ'লে এলুম। ভাল করি নি, জয়া?'

'ভাল করেছ, খুবই ভাল করেছ। নন্তুদার জন্যে যখন উকিল-ব্যারিস্টার কাউকে তুমি রাখলে না, তখন ছোটমামার কাছে গিয়ে কোন লাভই হ'ত না। দেখা হ'লে হয়তো ছোটমামা নন্তুদার শাস্তির মাত্রা দিত বাড়িয়ে।'

'হ্যাঁ, যতক্ষণ না সে 'রায়' দিচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত অপূর্ব কেবল বিচারক, আমার ভাই নয়। তোর কি মনে হয়, অপূর্ব নন্তুকে খালাস ক'রে দেবে?'

আমি কোন জবাব দেওয়ার আগে মামীমা দেখি খোঁড়াতে খোঁড়াতে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়িয়েছেন। গত পাঁচ মাসের মধ্যে তিনি বিছানা ছেড়ে বাইরে আসেন নি। নন্তুদা ধরা পড়েছে পাঁচ মাস আগে। বড়-মামার প্রশ্নের জবাব দিলেন মামীমা। তিনি বললেন, 'নন্তু খালাস পাবে না। ঠাকুরপো বিচারক ব'লেই নন্তুর খুব কঠিন শাস্তি হবে।'

মামীমা মামার বিছানার পাশে ব'সে প'ড়ে পুনরায় বলতে লাগলেন, 'ঠাকুরপো যে তোমার ভাই তা তো ইংরেজরা জানত। তবে কেন নন্তুর বিচারের ভার তার হাতে ওরা দিয়েছে?

বড়মামা বললেন, 'প্রথমে কেউ জানত না—'

'তা হোক। নন্তুকে খুব কঠিন শাস্তি দিতে হবে ব'লেই ওরা ঠাকুরপোকে স্পেশাল ট্রাইবুনালের বিচারক ক'রে পাঠিয়েছে। নন্তু মরেছে।'

'মরেছে?'—অদ্ভুত একটা ভঙ্গি ক'রে বড়মামা উঠে বসলেন মামীমার মুখোমুখি হয়ে। মামীমা মামার দিকে চেয়ে বললেন, 'ঠাকুরপো যদি ফাঁসির হুকুম না দেন, তা হ'লেও নন্তু মরবে। নন্তুকে বাঁচাতে পার তুমি।'

'আমি ?'—হাবা লোকের মত বড়মামা কি রকম একটা অদ্ভুত আওয়াজ বার করলেন মুখ দিয়ে। আমাদের কানে আওয়াজটা খুবই কৌতূহলের সৃষ্টি করল—আমি আর মামীমা চুপ ক'রে রইলুম। চেয়ে রইলুম মামার দিকেই। আমি যেন আজ এই প্রথম দেখলুম যে, মামার মুখের ওপরে হঠাৎ-বার্ধক্যের ছাপ পড়েছে। গোল মুখখানার এদিক ওদিকে ভাঁজ দেখা যাচ্ছে স্পষ্টভাবে। নিদ্রাহীনতার নিষ্ঠুর আক্রমণ তাঁর মুখের চামড়াটাকে তামাটে ক'রে তুলেছে। নন্তুদাকে দূরে সরিয়ে দিতে গিয়ে তিনি যেন নন্তুদাকে আরও কাছে টেনে এনেছেন। নন্তু আমাদের কেউ নয়—এই কথাটা মামা প্রতিদিন বার কয়েক আবৃত্তি করতেন বটে ; কিন্তু আজ আমার মনে হ'ল যে, নন্তুদাই ছিল তাঁর সবচেয়ে আপন। নন্তুদাকে ভুলতে গিয়ে তিনি তাকে মনে রেখেছেন সবচেয়ে বেশী।

মিনিট পাঁচেক সবাই আমরা চুপ ক'রে রইলুম। নন্তুদাকে মামা বাঁচাতে পারেন—এমন একটা অদ্ভুত উক্তি শোনবার পরে মামা যেন সাহস ক'রে মামীমাকে দ্বিতীয়বার আর প্রশ্ন করতে পারলেন না।

অনেকক্ষণ পরে মামামাই আবার বললেন, 'নন্তুকে রক্ষা করবার শক্তি আর ঠাকুরপোর নেই—'

'আমারই বা এমন কি শক্তি আছে, যা দিয়ে নন্তুকে আমি আমাদের সংসারে ফিরিয়ে আনতে পারি ?'—মামা এবার জবাব শোনবার জন্যে চেয়ে রইলেন মামীমার মুখের দিকে। মামীমা জবাব দিলেন, 'আমাদের কাছে নন্তু আর ফিরে আসবে না। কিন্তু তুমি ইচ্ছে করলে, সমগ্র জাতির জীবনে নন্তুকে বাঁচিয়ে রাখতে পার। তুমি ঐতিহাসিক। নন্তুদের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস তো তুমিই লিখবে। যে কারণে সিপাহী-বিদ্রোহকে আমরা সমর্থন করি, ঠিক সেই কারণে নন্তুদের স্বদেশপ্রেমকে কি আমরা সমর্থন করতে পারি না ?'

'না।'—এই সংক্ষিপ্ততম জবাবটা ঘরের শূন্যতায় ছুঁড়ে দিয়ে বড়-

মামা ওপাশ ফিরে শুয়ে রইলেন। মামীমা আরও মিনিট দশ পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে কথা বলবার জন্যে প্রবল ভাবে চেষ্টা করলেন। চেষ্টা তাঁর ব্যর্থ হ'ল। বড়মামা একটা কথাও আর বললেন না। ঘরের শূন্যতায় যেন এক বিকটতম নৈঃশব্দ্য আমাদের গলা টিপে মারতে এল। এ নৈঃশব্দ্যের মধ্যে ষড়যন্ত্র রয়েছে। মিরজাফর-জগৎশেঠের ষড়যন্ত্র পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্রে শেষ হয়ে যায় নি—প্রায় দেড় শো বছর পরেও আমি যেন দেখলুম, লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত ভারতবাসীর মনে লক্ষ লক্ষ পলাশী লুকিয়ে রয়েছে ভারতবর্ষকে হারিয়ে দেবার জন্যে।

সেদিন মামার ঘরে আমরা কতক্ষণ যে চুপ ক'রে বসেছিলুম আজ তা আর মনে নেই। সকালবেলা দশটা না বাজতেই আমি বই হাতে ক'রে বেরিয়ে পড়লুম। মামীমাকে কানে কানে ব'লে গেলুম যে, আমি আজ আর ইস্কুলে যাব না। মিসেস সবিতা গুপ্তের সঙ্গে আলিপুরের আদালতে যাব ছোটমামার রায় শুনতে।

আদালতের ঘরটায় খুবই ভিড় জমেছে। উকিলদের ভিড়ই সব চেয়ে বেশী। নন্তুদাদের দলের লোকেরা নিশ্চয়ই এখানে কেউ আসে নি। গুপ্ত পুলিসরা চোখ রেখেছে প্রত্যেকের আসা-যাওয়ার ওপর। বাইরেও দেখলুম, আদালতের চারদিকে সশস্ত্র পুলিস পাহারা দিচ্ছে সতর্ক চোখ মেলে। চারদিকের চাপা উত্তেজনা অনুভব ক'রে মিসেস গুপ্ত আমায় কানে কানে বললেন, 'ভারতবর্ষের নতুন ইতিহাস তৈরি হচ্ছে। জয়া, এ ইতিহাসের নায়ক কে জান? নন্তু।'

'আপনি ঠিকই বলেছেন, সবিতাদি। কিন্তু বড্ড ছেলেমানুষী ইতিহাস এটা। নায়কের বয়স কত জানেন? আঠারো। নন্তুদা ছেলেমানুষ ব'লেই নিজের জীবনটাকে নষ্ট ক'রে ফেললে। কেবল নিজের জীবনটাই নয়, মনে হচ্ছে বড়মামাকেও সে নষ্ট ক'রে দিল বাকী জীবনের জন্যে।'

'তোমার বড়মামার চেয়ে ভারতবর্ষের ইতিহাস বড়। নন্তু হচ্ছে

সেই ইতিহাসের অংশ, কিন্তু তোমার বড়মামার অংশ ইতিহাস নয়।'

উকিলদের মধ্যে গুঞ্জন উঠল। আসছেন—স্পেশাল ট্রাইবুনালের বিচারক আসছেন। আসামী নন্তু মিত্রের ছোটকাকা হচ্ছেন বিচারক অপূর্ব মিত্র, আই. সি. এস.। তিনি আসছেন। তিনি আসবার আগে আসামীরা এল। কাঠগড়ার সামনের দিকে রেলিং ঘেঁষে এসে দাঁড়াল নন্তুদা। এই ক মাসের মধ্যে নন্তুদার চেহারা গেছে বদলে। প্রথম দৃষ্টিতে নন্তুদাকে আমি চিনতে পারি নি।

ছোটমামা একটু পরেই এসে তাঁর চেয়ারে ব'সে পড়লেন। তিনি এলেন পেছনের দরজা দিয়ে।

চেয়ারে ব'সে প'ড়েই ছোটমামা ফাইল নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। ডাইনে বাঁয়ে কোন দিকেই দৃষ্টি দিলেন না তিনি। রায় পড়তে শুরু করলেন স্পেশাল ট্রাইবুনালের বিচারক। বিচার-ঘরের আবহাওয়া থমথমে হয়ে উঠল। বারো-তেরো জন যুবকের ভবিষ্যৎ তৈরি হচ্ছে ফাইলের কাগজগুলোতে। আমি কিন্তু ছোটমামার একটি কথাও শুনছিলাম না। চেয়ে ছিলুম নন্তুদার দিকে। নন্তুদার মত এমন একটি ভাল ছেলের ভবিষ্যৎ ভেঙে যাচ্ছে। লেখাপড়ায় সে তো ছোট-মামার চেয়েও ভাল ছিল। হঠাৎ দেখি, মিসেস গুপ্ত আমার কানের কাছে মুখ এনে নীচু স্বরে বলতে লাগলেন, 'তোমার ছোটমামা হচ্ছেন ইংরেজদের দালাল, আর নন্তু হচ্ছে পেট্রিয়ট। তোমার ছোটমামারাই হচ্ছেন এ যুগের শিক্ষিত উমিচাঁদ।'

রায় পড়ছেন ছোটমামা। ধীরে ধীরে প্রতিটি শব্দ পরিষ্কারভাবে উচ্চারণ করছেন তিনি। ব্রিটিশ সম্রাট ও তাঁর সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার অপরাধে আসামীরা অভিযুক্ত হয়েছে। অত্যন্ত ঘৃণিত অপরাধ সন্দেহ নেই। ছোটমামার রায় পড়বার মাঝখানে মিসেস গুপ্ত পুনরায় আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিস ফিস ক'রে বলতে

লাগলেন, 'অপরাধ নন্তুদের নয়। অপরাধ হচ্ছে এই সব আই. সি. এস.-দের, যারা মন প্রাণ দিয়ে ইংরেজদের দালালি করছে। যারা দেশের শত্রু, তারা আই. সি. এস. হ'লেও মূর্খ।'

'আপনি ঠিকই বলেছেন, সবিতাদি। কিন্তু ছোটমামা কি বললেন এইমাত্র, শুনলেন ?'

'শুনেছি। নন্তুর বারো বছর জেল হ'ল। জয়া, আদালতে ব'সে আজকে আমরা এই প্রতিজ্ঞা করলুম যে, অপূর্ব মিত্রদের আমরা কখনো ক্ষমা করব না। জয়া—'

বাধা দিয়ে আমি বললুম, 'সবিতাদি, নন্তুদা কি বলছে শুনুন।'

রায় পড়া শেষ হওয়ার পরে ছোটমামা উঠে পড়লেন। তিনি একবারও আসামীদের দিকে চেয়ে দেখেন নি। নন্তুদা এগিয়ে এসে দাঁড়াল ছোটমামার দিকে মুখ ক'রে। তারপর সে বলতে লাগল, 'আমাকে ফাঁসি দিলেন না কেন ? ফাঁসি হওয়ার জন্যে আমি তো সাত দিন থেকে তৈরি হয়ে আছি।'—এই পর্যন্ত ব'লে নন্তুদা তার গলায় সুর চড়িয়ে আবার বলতে লাগল, 'গত সাত দিনে আমার ওজন বেড়েছে কত জানেন ? পাঁচ পাউণ্ড। ফাঁসি যাওয়ার আনন্দে আমার ওজন বেড়ে গেছে ! বন্দে মাতরম্।' নন্তুদা কাঠগড়ার রেলিংয়ের সঙ্গে বুক ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আমরা সবাই দেখলুম যে, নন্তুদার বুকের ছাতি সত্যি সত্যি চওড়া হয়ে গেছে। ওজন তার বেড়েছে নিশ্চয়ই। দেশের জন্যে মরতে হ'বে বলে সমস্ত দেহের ওপর স্বাস্থ্যের রঙ উঠেছে ফুটে। আমি ভাবলুম, নন্তুদা সত্যি সত্যি দেশকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে। ভাই রত্না, আজ তো আমার তিরিশ পেরিয়ে গেছে। ভালবাসার কথা শুনলে মনে মনে আমি হাসতুম। আমার বিশ্বাস ছিল যে, স্বার্থের জন্যে কিংবা দৈহিক কারণে মানুষ ভালবাসা কথাটা ব্যবহার করে। যে-মানুষকে সারা জীবন শূন্যতার সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়, যাদের ভবিষ্যৎ মৃত্যুর অপরিজ্ঞাত অন্ধকারে সীমাবদ্ধ, তারা ভালবাসা কথাটা ব্যবহার করে

কেন? নিজেদের ফাঁকি দেওয়ার জন্যে? মৃত্যু অনিবার্য ব'লেই মানুষ বোধ হয় ভালবাসা কথাটা আবিষ্কার করেছে। নইলে? নইলে কি হ'ত বলা যায় না। কিন্তু আজ এই তিরিশ বছরের অভিজ্ঞতার ঢিবির ওপর দাঁড়িয়ে যখন সেই আদালতের ঘরটির মধ্যে দৃষ্টি ফেলি তখন মনে হয়, নন্তুদা মিথ্যে নয়, মিথ্যে নয় তার ভালবাসা। দেশকে এমন ক'রে ভালবাসতে না পারলে ফাঁসির স্বপ্নে তার ওজন বাড়ত না।

নন্তুদা অন্তর্হিত হ'ল, হ'ল বারো বছরের জন্যে। এ দৃশ্যের পরে আবার যখন যবনিকা উঠবে তখন আমরা হয়তো নন্তুদাকে আর চিনতে পারব না, সেও পারবে না আমাদের চিনতে। পৃথিবীর বয়স বাড়বে, নতুন বিপ্লবের আগুনে নন্তুদাদের চেনা-পৃথিবীর রঙ যাবে বদলে।

আদালতের ভিড় ঠেলে আমি আর মিসেস গুপ্ত বেরিয়ে এলুম আলিপুরের রাস্তায়। ট্রাম-রাস্তার কাছাকাছি আসতেই একটা ট্যাক্সি এসে আমাদের পাশে দাঁড়াল। গাড়ি থেকে মুখ বার ক'রে কে একজন বললেন, 'তাড়াতাড়ি উঠে আসুন, এখানেও গুপ্ত পুলিসের চোখ আছে।'

মিসেস গুপ্ত একটু ইতস্তত করছিলেন। আমি বললুম, 'চলুন সবিতাদি, কোন ভয় নেই। উনি তো নন্তুদাদের দলের লোক।'

'তুমি চিনলে কি ক'রে, জয়া?'

'ঝরনার সঙ্গে উনি একদিন আমাদের ওখানে গিয়েছিলেন। সোনার ফ্রেম দিয়ে বাবার একটা ছবি বাঁধানো ছিল, সেই ফ্রেমটা আমি ওঁকে দিয়েছিলাম। আমার লাখ টাকা থাকলে সেদিন তাও দিতাম।'

এর মধ্যেই আমরা ট্যাক্সিতে উঠে বসেছি। গাড়ির ভদ্রলোকটি জিজ্ঞাসা করলেন, 'নন্তুর কি হ'ল? ফাঁসি হয়েছে নাকি?'

'না, বারো বছর জেল হয়েছে।'—জবাব দিলেন সবিতাদি।

'ওঃ! তাই নাকি? আচ্ছা, নমস্কার। আমি এইখানেই নেমে যাচ্ছি। দশটা টাকা রইল, ট্যাক্সি ভাড়া দিয়ে দেবেন।'—এই ব'লে

ভদ্রলোকটি ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে হরিশ মুখার্জি রোডের মোড়ে নেমে গেলেন।

মিসেস গুপ্ত বললেন ট্যাক্সিওয়ালাকে, 'জলদি চলিয়ে সর্দারজী।' তাঁর মুখের দিকে চেয়ে আমি খুবই অবাক হয়ে গেলুম। কি যেন তিনি খুব গভীরভাবে চিন্তা করছিলেন। বিপ্লবী যুবকদের তিনি ভালবাসেন। ভালবাসেন বাংলার এই স্বাধীনতা-সংগ্রামকে। সেই জন্যেই সম্ভবত তিনি নন্তুদাদের শাস্তির কথা ভেবে মনে মনে কষ্ট পাচ্ছিলেন।

হরিশ মুখার্জি রোডের দিকে গাড়ি ঘুরতেই মিসেস গুপ্ত বললেন, 'তোমাকে পরে আমি পৌঁছে দেব। আগে আমার ওখানেই যাক।' আমি কোন কথা বললুম না। মিসেস গুপ্তই একটু পরে আবার আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'ঝরনা বুঝি এই লোকটিকে তোমাদের ওখানে নিয়ে গিয়েছিল ?'

'হ্যাঁ।'

'কেন ?'

'মামীমার সোনার গহনাগুলো চাইতে।'

'তোমার মামীমা জানতেন ?'

'না। তাঁকে আমি কিছু বলি নি, গহনাও দিই নি।'

একটু পরেই আমরা ঝরনাদের বাড়িতে এসে পৌঁছে গেলুম। ট্যাক্সিওয়ালাকে টাকা দিয়ে মিসেস গুপ্ত আমাকে বললেন, 'তোমার সামনে ঝরনাকে আমি দু-চারটে প্রশ্ন করব, প্রশ্ন করব তোমাকেও। আশা করি তুমি মিথ্যে বলবে না।'

'ওমা, সে কি কথা! মিথ্যে কথা বলা মহাপাপ—তা তো আমি কেষ্টনগরের ইস্কুলেই প'ড়ে এসেছি। না সবিতাদি, মিথ্যে আমি বলব না। তা ছাড়া, আপনি যখন নন্তুদাকে ভালবাসেন তখন ঝরনারই বা কি দোষ ? নন্তুদার মত ছেলেকে সব মেয়েই ভালবাসবে যদি সুযোগ পায়।'

দোতলায় উঠতে উঠতে একেবারে ওপরের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে মিসেস গুপ্ত বললেন, 'নন্তকে ভালবেসে লাভ কি? তার তো আর কোন ভবিষ্যৎ নেই। নন্ত পেট্রিয়ট হতে পারে, কিন্তু স্বামী হতে পারে কি?'

ঠিক এই সময় আমরা শুনতে পেলুম, কে যেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। দুজনেই একসঙ্গে চোখ ঘোরালুম ডান দিকে। খোলা জানলার মধ্যে দিয়ে আমরা দুজনে যে-দৃশ্য দেখলুম তাতে মনে হ'ল যে, ঝরনাই মিসেস গুপ্তের শেষ প্রশ্নটার জবাব দেওয়ার চেষ্টা করছে। নন্তদা স্বামী হওয়ার যোগ্য কি না তার জবাব তো আমি দিতে পারতুম না।

ঝরনা কোথা থেকে যে নন্তদার একটা ফোটো যোগাড় করেছে আমরা তা জানি না। আমরা দেখলুম যে টেবিলের ওপরে নন্তদার ফোটোখানা রয়েছে আর ঝরনা তার সামনে মাথা নীচু ক'রে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। নন্তদার যে বারো বছরের জেল হয়েছে---সে খবর কেউ নিশ্চয় এর মধ্যেই ঝরনার কাছে পৌঁছে দিয়ে গেছে।

আমি আর সবিতাদি একেবারে ওপরের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে রইলুম। দাঁড়িয়ে রইলুম আর দুজনে চেয়ে রইলুম দুজনের দিকে। মনে হ'ল, সবিতাদি যেন আমার চোখের মধ্যে ঝরনার মনের কথা সব খুঁজে বেড়াচ্ছেন।

সন্ধ্যের পরেই আমি বাড়ি ফিরে এলুম। পা টিপে টিপে পার হলুম সামনের উঠোন। কেউ কোথাও নেই। কাউকে দেখতে পেলুম না। ঘরের দরজা সব ভেতর থেকে বন্ধ। রান্নাঘরে নামীনাথ দেওয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে ঘন ঘন হাই তুলছে। তার সামনে গিয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'ব্যাপার কি, নামীনাথ? ওঁরা সব কোথায়? রান্না-বান্নার ব্যবস্থা নেই কেন?'

'ডালভাত সকালেই রান্না ক'রে রেখেছি। এ বেলা আর হাতপা নাড়াতে ইচ্ছে করছে না, দিদিমণি। তা ছাড়া, মা তো সেই দুপুরবেলা

থেকে ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে রেখেছেন, খুলছেন না। এক বেলা না খেলে কি হয়, দিদিমণি? তোমার খুব খিদে লেগেছে নাকি?'

'খিদে? না, নামীনাথ। মামা কোথায়?'

'ওপরের লাইব্রেরি-ঘরেই আছেন। সারাদিন ধ'রে তো তিনি কেবল লিখেই চলেছেন।'

'কি লিখছেন তিনি, নামীনাথ? ইতিহাস নাকি?'

আমার প্রশ্ন শুনে নামীনাথ হেসে ফেলল। হাসতে হাসতে সে জবাব দিল, 'বড়বাবু কি লিখছেন তা যদি আমি বুঝতে পারতুম, আমার তবে ভাত রাঁধতে হবে কেন, দিদি? আমি তো নাম সই করতে জানি না।'

আমার ভুল বুঝতে পেরে আমি তাড়াতাড়ি বললুম, 'তুমি ঠিকই বলেছ, নামীনাথ। গুচ্ছের খানিক লেখাপড়া শিখে লাভ কি?'

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে নামীনাথ মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, 'লেখা-পড়ার মত এত বড় জিনিস দুনিয়ায় আর কিছু নেই, দিদি। বড়বাবু এত বেশী লেখাপড়া শিখেছেন ব'লেই তো আজ এত বড় ব্যথা তিনি ভুলে থাকতে পারছেন।'

রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলুম আমি। সারা বাড়িটার ওপর অন্ধকার নেমে এসেছে। এ অন্ধকার মৃত্যুর মত নির্দয় এবং কঠিন। বারো বছর পরে নন্তুদা হয়তো ফিরে আসবে, কিন্তু সে-নন্তুদার সঙ্গে এ বাড়ির আর কোন পরিচয় থাকবে না। আজকের নন্তুদার মৃত্যু হ'ল আলিপুরের আদালতে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে যদি সে বাঁচতে পারে, তবে হয়তো আজকের এই মৃত্যুর ক্ষতিপূরণ হবে, নিশ্চয়ই হবে। হবে কি?

দোতলায় উঠতে লাগলুম আমি। সিঁড়িতে আলো নেই আজ। আলো লাইব্রেরি-ঘরেও নেই। মামা কি তবে অন্ধকারে ব'সে আছেন? সুইচ টিপে আলো জ্বালালুম আমি। না, মামা এখানে

নেই। টেবিলের ওপরে কতকগুলো কাগজ ছড়ানো রয়েছে। মামা বোধ হয় সারাদিন ব'সে প্রবন্ধ লিখছিলেন। আজ প্রবন্ধ লিখবার দিনই বটে! প্রবন্ধটা বাংলায় লেখা ব'লে আমি একটা কাগজ হাতে তুলে নিলুম। কি লিখছেন মামা? ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্তুতিগান না কি? মামার চেয়ারে ব'সে প্রবন্ধটার ওপর চোখ বুলতে লাগলাম। সেদিন আমি প্রবন্ধটার অনেক কথাই বুঝতে পারি নি বটে, কিন্তু দু-চারটে কথা আমার আজও মনে আছে। বাঙালীদের সম্বন্ধে মামার খুব উঁচু ধারণা ছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, বাঙালীরা গত দেড় শো বছরের মধ্যে এমন একটি সাংস্কৃতিক-প্যাটার্ন তৈরি করেছে, যার মান সর্বভারতীয় সংস্কৃতির চেয়ে ছিল উঁচু। ইংরেজের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। তাদের সাহায্য ছাড়া আমরা পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার জ্ঞানবিজ্ঞান এ দেশে আমদানি করতে পারতুম না। ইংরেজদের কাছে দাসত্ব ক'রেও আমরা কখনও দাস হই নি। দাস যদি ব'নে যেতুম, তা হ'লে আমরা বড় হতে পারতুম না, ইত্যাদি। প্রবন্ধটা পড়তে পড়তে কখন যে আমি টেবিলের ওপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম টের পাই নি। ঘুম থেকে তুলে দেবার লোক নেই আজ।

হঠাৎ আমার ঘুম ভাঙল। দেওয়াল-ঘড়িতে টুং-টুং ক'রে দুটো বাজল। রাত দুটো। মামার বিছানা খালি। লাইব্রেরি-ঘরই ছিল মামার শোবার ঘর। চেয়ার থেকে উঠে গিয়ে আমি বিছানাটা টিপে টিপে পরীক্ষা করতে লাগলুম। ঘুমের ঘোর কেটে যেতে হঠাৎ আমি নিজের মনে প্রশ্ন করলুম, কি পরীক্ষা করছি আমি? তোশকের তলায় তো মামা লুকিয়ে থাকতে পারেন না! বইয়ের শেল্‌ফগুলোর পেছনে উঁকি দিয়ে দেখলুম, না, মামা সেখানেও নেই। ভয় করতে লাগল আমার। এত রাত্রে মামা কোথায় গেলেন?

নীচে নেমে এলুম আমি। রান্নাঘরে এখনও আলো জ্বলছে কেন? রান্নাঘরে গিয়ে দেখি যে, নামীনাথ ঠিক তেমনিভাবে দেওয়ালের গায়ে

হেলান দিয়ে ব'সে রাত জাগছে। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'ব্যাপার কি? ঘুমতে যাও নি কেন?'

'একটা রাত না ঘুমলে কি হয়, দিদি?'—জিজ্ঞাসা করল নামীনাথ।

'একটা রাত না ঘুমলে কিছুই হয় না জানি। কিন্তু জেগে আছ কেন?'

প্রশ্নটার জবাব দিল নামীনাথ। দিল একটু বাদেই। সে বললে, 'আজকের রাতটা নন্তু দাদাও জেগে আছে।'

'কেন?'

'সবচেয়ে কষ্টের রাত আজকেই। তার পরে অভ্যেস হয়ে গেলে জেলের জীবন আর খারাপ মনে হবে না। দিদি, নন্তুদা আমার কোলেই মানুষ হয়েছে। ওর জন্মের পরে মা তো বিছানায় শুয়ে ছিলেন ছ-মাস। এখন থেকে ওকে জেলের ভাত খেতে হবে। শক্ত ভাত সে কোন-দিনও খেতে পারত না। এখন? বারোটা বছর—'

এই পর্যন্ত ব'লে নামীনাথ মাথা নীচু করল।

রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলুম। মনে হ'ল, সারা বাড়িটাই বুঝি লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদছে। মামীমা ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে রেখেছেন। মামাও বোধ হয় আজ মামীমার ঘরে গিয়ে পারিবারিক কান্নার অংশ গ্রহণ করছেন। সবাই হয়তো নন্তুদার সঙ্গে সঙ্গে রাত জাগছেন আজ। আমি—কেবল আমিই আজ চোখের জল ফেলতে পারছি না। মনে হচ্ছে, নন্তুদা শহীদ হয়েছে—তার জন্যে আমরা যেন গৌরব বোধ করছি। পরাধীন ভারতবর্ষের মুক্তির কথা আমরা কেউ ভাবি নি, নন্তুদা ভেবেছে। সবিতাদি বোধ হয় ঠিকই বলেছেন যে, ভারতবর্ষ যেদিন স্বাধীন হবে সেদিন নন্তুদারাই পাবে সবচেয়ে বড় এবং উঁচু আসন।

উঠোনের ডান দিকে এসে দাঁড়ালুম আমি। ঠাকুরঘরের দিকে চোখ পড়ল আমার। দরজা বন্ধ বটে, কিন্তু ফাঁক দিয়ে আলো আসছে

দেখলুম। এত রাত্রে ঠাকুরঘরে আলো কেন? এ বাড়ির সর্বত্র আজ অন্ধকার, আলো আছে কেবল ঠাকুর-ঘরেই। আমি ভাবলুম, মামীমা বোধ হয় আজ ঠাকুর-ঘর থেকে বেরুন নি। মনের কথা সব তিনি ভগবানের কাছে নিবেদন ক'রে দিচ্ছেন আজ। কালকের জন্যে তিনি আর একটি কথাও রাখবেন না। মামীমা ইস্কুলে-কলেজে পড়েন নি বটে, কিন্তু ভগবানের ওপর নির্ভর করবার শিক্ষা তিনি পেয়েছেন। সেই জন্যে কোন দুঃখই তাঁকে আজও ভেঙেচুরে ফেলতে পারে নি। ম'রেও বেঁচে রয়েছেন মামীমা।

ঠাকুর-ঘরের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম আমি। দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখতে গিয়ে দু পা পেছনে স'রে এলুম আমি। মামীমা সেখানে নেই। পুজোয় বসেছেন ভারতবিখ্যাত ঐতিহাসিক ডক্টর যাদব মিত্র।

নন্তুদা জেল খাটতে চ'লে যাওয়ার পরে হরিশ মুখার্জি রোডের বাড়িটা যেন গোটা পৃথিবী থেকে আলাদা হয়ে গেল। মনে হ'ত, দিনের বেলাতেও এ বাড়িটা অন্ধকার-আব্রু দিয়ে ঢাকা। কয়েকটা বছর পর্যন্ত কাউকে হাসতে দেখলুম না, কারো মুখ থেকে শুনলুম না একটাও হাসির কথা। মামা, মামীমার সঙ্গে সঙ্গে বাড়িটার প্রত্যেকটা ইটও বুঝি গম্ভীর হয়ে আছে! মামা প্রতিদিনই ভোর রাত্রে ঘুম থেকে ওঠেন। ঠিক পাঁচটা বাজবার সঙ্গে সঙ্গে পড়তে বসেন। এক ঘণ্টা লেখাপড়া করবার পরে তিনি চ'লে যান বাজারে। আজকাল তিনি কাউকে আর সঙ্গে নেন না, নিজেই বাজার ব'য়ে নিয়ে আসেন বাড়িতে। কেউ কোন কথা বলবার প্রয়োজন বোধ করে না; কেমন যেন মেসিনের মত সংসারের সব কাজ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ হয়ে যায়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে সূর্য কোনদিন অস্ত যাবে কি না জানি না, কিন্তু ডক্টর যাদব মিত্রের সংসারে সূর্য চিরদিনের জন্যে অস্ত গেল।

প্রবেশিকা এবং আই. এ. পরীক্ষায় বৃত্তি পেয়েছি। মামা একদিন জানতে চেয়েছিলেন যে, তাঁর মুখ আমি রক্ষা করতে পারব কি না। তাঁর মুখ আমি রক্ষা করেছি। দর্শনশাস্ত্রে অনার্স নিয়ে আমি এবার ভর্তি হলুম কলেজে।

পেছন দিকে দৃষ্টি দেওয়ার সময় নেই আর। দৃষ্টি দিতে গেলেই মনটা যেন ভেঙে চুরমার হয়ে যেতে চায়। বাবার কথা তাই ইচ্ছে ক'রে মনে আনতে চাই না, স্মরণ করবার চেষ্টা করি না ভবতোষকেও। এতগুলো বছরের ব্যবধানে ভবতোষের চেহারাটাও যেন আবছা হয়ে এসেছে। হঠাৎ চোখের সামনে এসে পড়লে আমি বোধ হয় এক দৃষ্টিতে ওকে চিনতে পারব না। চেনবার রাস্তা তো বন্ধ ক'রে দিয়েছে ভবতোষ নিজেই। একটা চিঠি পর্যন্ত সে লেখে নি! ডাক-টিকিটের পয়সার অভাব ঘটতে পারে ব'লে আমি ওকে দশটা টাকাও দিয়ে এসেছিলাম।

আজ প্রথম যখন কলেজের ফটক দিয়ে ক্লাসে যাচ্ছিলুম, তখন হঠাৎ যেন আমার মনে হ'ল যে, সেই দশ টাকার নোটখানার বুঝি হাত-পা গজিয়েছে! যোয়ানমর্দ পুরুষের মত নোটখানা যেন বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কলেজের বারান্দায়। ভবতোষের চেহারার সঙ্গে তার অদ্ভুত সাদৃশ্য রয়েছে। ভবতোষ নয় তো?

ভবতোষই বটে। কেষ্টনগরের ভবতোষ কেবল সাবালক হয় নি, সুন্দরও হয়েছে। বলিষ্ঠতার সৌন্দর্য যেন ওর মধ্যে সৃষ্টি করেছে এক বিশেষ ধরনের ব্যক্তিত্ব, যার আকর্ষণ অনুভব করতে আমার এক মিনিটও লাগল না। প্রথম দর্শনেই মনে হ'ল যে, ভবতোষের ওপর নির্ভর করা চলে। কেবল নির্ভর করা নয়, আমি বোধ হয় ওর সঙ্গে পালিয়ে যেতেও পারি। ও পাশে থাকলে আমি সারা জীবন হাসি-মুখে সহস্র দুঃখের মধ্যেও বেঁচে থাকতে পারি। ভবতোষকে দেখলে যে-কোন মেয়েরই উচ্ছৃঙ্খল হওয়ার লোভ আসে মনে।

কলেজের বারান্দায় আমি আর উঠলুম না। আমাকে দেখে ভবতোষই নেমে এল নীচে। সদ্য-কেনা একটা শক্ত মলাটের খাতা ওর হাতে ছিল। বুঝলুম, ভবতোষও এসেছে আমাদের কলেজে পড়তে।

আমরা ছুজন ছুজনের দিকে চেয়ে রইলুম। কেউ যেন সাহস ক'রে প্রথমে কথা কইতে পারছি না। কে আগে কথা কইবে? দোষ তো ভবতোষের, এতগুলো বছরের মধ্যে সে আমার খবর নেয় নি একদিনের জন্তেও তবে কেন আমি ওর সঙ্গে কথা কইব প্রথম? যে-লোকটা এতদিন পর্যন্ত আমায় ভুলে থাকতে পেরেছে, সে তো ভবিষ্যতে আবার আমায় ভুলে যেতে পারে! আমি তাই ওর সামনে থেকে স'রে যাওয়ার চেষ্টা করলুম। পাশ কাটিয়ে ওপরে উঠবার জন্তে সিঁড়িতে পা দিলুম। ভবতোষ আমার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'আমায় কি তুমি চিনতে পার নি, জয়া?'

এক মুহূর্তের জন্তে মনে হ'ল যে বলি, চিনতে পারি নি। কেবল তাই নয়, আরো বলবার ইচ্ছে হ'ল যে, ভবিষ্যতেও চিনতে চাই না। ভাই রত্না, সেদিন যদি সাহস ক'রে এই কথাগুলো ব'লে দিয়ে ক্লাসে পালিয়ে যেতুম তা হ'লে হয়তো আজ আমায় এ চিঠি লিখতে হ'ত না। কিন্তু পৃথিবীতে এমন কোন্ মেয়ে জন্মেছে যে, ভবতোষের মুখের দিকে চেয়ে অমন কথা বলতে পারত? আমিও শেষ পর্যন্ত পারলুম না। ভবতোষের বলিষ্ঠতাকে উপেক্ষা করা অসম্ভব হয়ে উঠল। সিঁড়ি থেকে নেমে এলুম নীচে। বললুম, 'চিনতে পেরেছি, কিন্তু—।' চুপ ক'রে রইলুম আমি। ভবতোষ একটু পরেই জিজ্ঞাসা করল, 'আমার ওপর রাগ করেছ, না?'

'যাক, সে কথা শুনে আর কি করবে? কেমন আছ? বাড়ির সবাই কেমন আছেন?'—প্রশ্ন করতে করতে আমি চ'লে গেলুম অনেকগুলো বছর পেছনে। কেষ্টনগর শহর আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল অত্যন্ত স্পষ্টভাবে। গোটা শহরটার মধ্যে আর কাউকে

আমি দেখতে পাচ্ছি না, ভবতোষই কেবল দাঁড়িয়ে আছে সারা শহরটাকে আড়াল ক'রে। আমার কাছে ভবতোষ যে-কেউ একজন নয়, ভবতোষ হিরো। আমার নারীত্বের মর্যাদা ভবতোষের দৃষ্টির মধ্যে দেখলুম অপরূপ মহিমায় নতুন এক অর্থ নিয়ে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। ফিলজফির বইগুলো বহন ক'রে কলেজের সিঁড়ি দিয়ে আমি কোন্ গন্তব্যে পৌঁছুবার আয়োজন করছি? সিঁড়ির নিচে দাঁড়িয়ে এই মুহূর্তে আমার মনে হ'ল যে, ভবতোষ কেবল প্রিয় নয়, প্রিয়তম। সারা দুনিয়ার ফিলজফির মধ্যে যা পেতুম না, ভবতোষের দৃষ্টির মধ্যে তা পেয়েছি। আমি নারী। আমার দেহের মধ্যে অকস্মাৎ সৃষ্টি-রহস্যের আলোড়ন শুরু হ'ল। আমি চাইলুম, ফিলজফির বইটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ভবতোষের বলিষ্ঠ হাতের ওপর নির্ভর করতে। ভবতোষের দেহটাকে আর পরপুরুষের দেহ ব'লে মনে হচ্ছে না। আমি আড়াল খুঁজতে লাগলুম। কলেজের সামনে ভিড় জমছে। মান অভিমান ভুলে গিয়ে আমি বললুম, 'আজ আর ক্লাসে যাব না। চল, আজ অন্য কোথাও যাই।'

'হ্যাঁ, তাই ভাল। এক দিনের পড়ার ক্ষতি অন্য একদিন পুষিয়ে নেওয়া যাবে।'

'পড়ার ক্ষতিকে আমি ক্ষতিই মনে করি না। তা ছাড়া তোমার কি মনে হয় না, আজকের এই দেখা হওয়ার মত এত বড় একটা লাভের কাছে কোন ক্ষতিকে আর ক্ষতি মনে হচ্ছে না?'

ভবতোষ সোজাসুজি কোন জবাব দিল না। একটু হেসে সে বললে, 'তোমার মত আমি তো লেখাপড়ায় ব্রিলিয়াণ্ট নই। তা হোক, চল। আজ আর আমরা ক্ষতির কথা ভাবব না।'

আমরা কলেজের ফটক দিয়ে বেরিয়ে এলুম রাস্তায়। আজ আর হরিশ মুখার্জি রোডে ফেরবার তাড়া নেই। বাসে উঠে বললুম, 'ভবতোষ, আজ আর সন্ধ্যের আগে বাড়ি ফিরব না। সমস্তটা দিন আমরা গল্প ক'রে কাটাব।'

আমার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে ভবতোষ জিজ্ঞাসা করল, 'মামা কিংবা মামীমা কিছু বলবেন না তো ?'

'না।' একটু ভেবে নিয়ে আমিই আবার বললুম, 'নন্তুদার জেল হওয়ার পরে মামার বাড়ির সবাই কেমন নির্বাক ভাবে জীবন কাটাচ্ছেন। আমি কি করি বা কি খাই তা নিয়ে কেউ কোন প্রশ্ন করেন না। এমন একটা পরিবেশে আমি হাঁপিয়ে উঠেছি, ভবতোষ। কতদিন ইচ্ছে ক'রে রাত আটটার পরে বাড়ি ফিরেছি। আমি চাইতুম যে, কেউ যেন কিছু একটা প্রশ্ন করেন। কিন্তু কারো মুখ দিয়ে একটা কথাও বেরয় নি। এবার আমি কথা বলার লোক পেলুম। আমি যদি অন্যায় করি, তা হ'লে তুমি আমায় খুব বকবে। বকুনি খাওয়ার জন্যে আমি আজ চার বছর ধ'রে অপেক্ষা করছি।'

আমি দেখলুম, আমার কথা শুনে ভবতোষ হেসে ফেলল। আমার মনের গোপন কান্না ভবতোষ শুনতে পেল না।

ধর্মতলা দিয়ে বাসটা বেরিয়ে এল চৌরঙ্গীর দিকে। অনেকক্ষণ পর্যন্ত আমরা চুপ ক'রে ব'সে ছিলুম। আমার মনের মধ্যে কথার ঝড় উঠেছে। কোন্ কথা আগে বলব, কোন্ কথা পরে ? ভবতোষ তো আমার ওপরের ক্লাসে পড়ত, এখানে তবে কেন সে আমার সঙ্গে এক ক্লাসে পড়তে এসেছে ? বোধ হয় কোন কারণে ওর এক বছর পরীক্ষা দেওয়া হয় নি। অনেক কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ এক সময়ে ভবতোষকে আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'এতদিন তুমি আমায় চিঠি দাও নি কেন ? জান, প্রত্যেকদিন আমি স্কুল থেকে ফিরে এসে মামীমাকে জিজ্ঞাসা করতুম যে, আমার কোন চিঠি এসেছে কি না। কেন চিঠি লেখ নি, ভবতোষ ? তোমার বাবা বুঝি বারণ করেছিলেন ?'

'না।'—ভবতোষের স্বর খুব গম্ভীর হয়ে এল। আমি আর দ্বিতীয় কোন প্রশ্ন করলুম না। ব'সে রইলুম চুপ ক'রে। একটু পরে ভবতোষ বললে, 'বাবা মারা গেছেন প্রায় তিন বছর হ'ল। আর—'

'আর কি, ভবতোষ ?'—মুহূর্তের মধ্যে ভয়ে আমার মুখ শুকিয়ে গেল।

'আর মা মারা গেছেন প্রায় আড়াই বছর আগে।'—এই পর্যন্ত ব'লে ভবতোষ চুপ ক'রে রইল। এর পরে ওকে কোন্ কথা জিজ্ঞাসা করব ? চুপ ক'রে ভাবতে লাগলুম অনেক কথা। ভবতোষের হাতের ওপর হাত রাখলুম আমি। ওকে সান্ত্বনা দেওয়ার মত ভাষা কই আমার ?

ভবতোষ একটু হেসে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কেন আমায় চিঠি দাও নি ? খোঁজ কর নি আমি বেঁচে আছি কি না।'

'হ্যাঁ, অনুযোগ তুমি দিতে পার বটে। কিন্তু আমি কি ক'রে জানব যে, তোমার ওপর দিয়ে এত বড় বিপদ গেছে ? ভবতোষ, এতগুলো বছর কার কাছে ছিলে ? অত বড় একটা বাড়িতে একা একা তোমার ভয় করত না ?'

'আমি তো বাড়িতে ছিলুম না। হস্টেলে ছিলুম। যে বছর বাবা মারা যান সেই বছর আমি পরীক্ষা দিতে পারি নি।'

'তোমায় দেখাশোনা করত কে ?'

'ফাদার হেন্‌রী।'

'ফাদার হেন্‌রী ?'

'হ্যাঁ। কোনও আত্মীয়স্বজন আসেন নি আমার খোঁজ নিতে।'

'আমায় কেন লেখ নি, ভবতোষ ? আমি গিয়ে তোমার ঘর-সংসার দেখতুম ?'

এবার বেশ জোরে হাসতে হাসতে ভবতোষ বলল, 'তিন বছর আগে ঘর-সংসার দেখবার মত তোমার বয়স ছিল না।'

ভবতোষের পাশে ব'সে আমিও হাসতে লাগলুম।

সমস্তটা দিন আমরা ঘুরে বেড়ালুম গড়ের মাঠের এদিক-ওদিকে। কত অদ্ভুত রকমের কথা শুনলুম এবং শোনালুম। সেই সঙ্গে লক্ষ্য

করলুম যে, ছেলেবেলাকার ভবতোষের সঙ্গে এখনকার ভবতোষের অনেক রকমের পার্থক্য ঘটেছে। মনের গঠনটাও গেছে বদলে। আমাকে চিঠি লেখার জন্যে ও আর বাবার পকেট থেকে পয়সা চুরি ক'রে টিকিট কিনতে পারে না। চুরি করা যে মহাপাপ, তেমন বিশ্বাস ওর মনের মধ্যে দৃঢ় হয়েছে। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'সেই যে আমি তোমায় দশটা টাকা দিয়ে এসেছিলুম তা দিয়ে কি করলে?'

'তুমি চ'লে আসার পরের দিন নোটখানা বাবা নিয়ে নিলেন।'

'কেন?'

'তিনি মনে করেছিলেন যে, ও-টাকা আমি তাঁর পকেট থেকে চুরি করেছি। তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করলেন না যে, তুমি আমায় ডাক-টিকিট কেনবার জন্যে টাকা দিয়েছ। বাবা কি রকম রাগী মানুষ ছিলেন জান তো?'

'তা আর জানি না? মা গো! তিনি বোধ হয় তোমায় খুব শাস্তি দিয়েছিলেন, না ভবতোষ?'

'হ্যাঁ, সেই মোটা লাঠিটা তিনি আমার পিঠের ওপরে ভাঙলেন।'

'তাই নাকি? পিঠের ওপর না জানি—'

কথাটা শেষ করতে না দিয়ে ভবতোষ বলল, 'হ্যাঁ, পিঠের ঘাগুলো শুকোতে অনেক দিন লেগেছিল। কিন্তু তাতেও আমি খুব বেশী ব্যথা পাই নি। ও-রকম দু-চারটে লাঠি তিনি আমার পিঠে ভাঙলেও আমি সহ্য করতে পারতুম। কিন্তু—'

এই পর্যন্ত ব'লে ভবতোষ চুপ ক'রে রইল। আমি বুঝলুম, ওর মনটা ভিজে এসেছে। এ বিষয়ে ওকে আর একটাও প্রশ্ন করা উচিত হবে না। উচিত হয় নি একটা কথাও জিজ্ঞাসা করা।

আমরা নিঃশব্দে হাঁটতে হাঁটতে চ'লে এলুম আউটরাম ঘাটের দিকে। বেশ খানিকটা পথ হাঁটলুম। একটু আগেই সম্ভবত একটা বিদেশী জাহাজ এসে ঘাটের সঙ্গে লেগেছে। ঘাটের কাছে ভিড়

জমেছে খুব। আমরা ঢুকে পড়লুম ইডেন গার্ডেনের মধ্যে। একটু পরেই ভবতোষ বলল, 'বাবা দশটা টাকা নিয়ে যাওয়ার পরেও তোমায় আমি চিঠি লিখতে পারতুম। ফাদার দুবোয়া এবং ফাদার হেন্‌রী আমায় খুব ভালবাসতেন। তাঁদের কাছ থেকে দু-চারটে ডাক-টিকিট আমি অবশ্যই চেয়ে নিতে পারতুম। কিন্তু চাই নি। চাই নি তার কারণ, বাবার কথাগুলো আমার মনে এমন একটা অপমানের আবহাওয়া সৃষ্টি করেছিল যে, তোমার কাছে চিঠি লেখা সম্ভব হয়ে উঠত না। উঠল না এতগুলো বছর। জয়া, চিঠি লিখি নি ব'লে আমরা তো কেউ কাউকে ভুলে যাই নি?'

'কিন্তু বাবার সেই অপমানের কথাগুলো তো বললে না?'

'বাবা বলেছিলেন যে, ডাক-টিকিটের পয়সা যতদিন না রোজগার করতে পারব ততদিন মেয়েদের কাছে চিঠি লিখতে পারব না।'

'মেয়ে বলতে তো আমিই একমাত্র তোমার চেনা মেয়ে, কিন্তু তোমার বাবা বহুবচনে কথা বললেন কেন, ভবতোষ?'

'অমনি ক'রেই কথা বলতেন বাবা।'

আমরা যখন চৌরঙ্গীতে ফিরে এলুম, তখন প্রায় সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। আমাদের বিদায় নেবার সময় হ'ল। আমরা ফিরব উল্টো রাস্তায়। ভবতোষ কলেজের হস্টেলে থাকে। আমি বললুম, 'মামার সঙ্গে তোমার একবার দেখা করা উচিত।' হাসতে হাসতে ভবতোষ জিজ্ঞাসা করল, 'কেন, আবার আমায় মোট বইতে হবে না কি?'

হাসতে হাসতে আমিও জবাব দিলুম, 'তোমার মত বলিষ্ঠ পুরুষেরা যদি মোট না বয় তবে সামাজিক সমস্যার সমাধান হবে কি ক'রে? ভয় পাচ্ছ না কি?'

'কতটুকুই বা তোমার ওজন হবে!'

ভবতোষের কথায় নির্ভরতার প্রতিজ্ঞা রইল।

হরিশ মুখার্জি রোডে ফিরে আসতে সন্ধ্যে পার হয়ে গেল।

নামীনাথ আমার জন্যে বাইরের দরজায় অপেক্ষা করছিল। সন্ধ্যের আগে ফিরে না এলে সে অপেক্ষা ক'রে ব'সে থাকে আমার জন্যে। বিকেলের জলখাবার উনোনের পাশে রেখে দেয় প্রতিদিন। ঠাণ্ডা খাবার নামীনাথ আমাকে কোনদিনই দেয় না। এ বাড়ির ভয়াবহ নৈঃশব্দ্যের মধ্যে একমাত্র নামীনাথকেই ক্ষীণ আওয়াজের মত মনে হয় আমার।

ফটকের সামনে এসে পৌঁছতেই নামীনাথ জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার ভয় করে না, দিদিমণি? সঙ্গে কোন পুরুষমানুষ না নিয়ে সন্ধ্যের পরে তোমার চলাফেরা করা উচিত নয়।'

'আজ আমি একা ছিলুম না রে।'—আমার সুরে আজ খুশির ধ্বনি শুনতে পেল নামীনাথ।

জলখাবার খেয়ে লাইব্রেরি-ঘরে এলুম। হঠাৎ মনে পড়ল মামা একটা কাজ দিয়েছিলেন আমায় আজকে শেষ ক'রে দেবার জন্যে। তাঁর একটা ইংরেজী প্রবন্ধ টাইপ ক'রে বিলেতের একটা কাগজে পাঠিয়ে দিতে হবে। লাইব্রেরিতে এসে দেখলুম, মামা তখনো ফেরেন নি। টাইপ করতে বসলুম আমি।

প্রায় এক ঘণ্টা পরে মামা ফিরে এলেন। এলেন খুব দ্রুতপায়ে। আমি বুঝলুম, তিনি নিশ্চয়ই কোন একটা জরুরী খবর এনেছেন। হয়তো তিনি খবর পেয়েছেন যে, নন্তুদাকে কোন একটা স্বাস্থ্যকর জায়গার জেলে বদলি ক'রে দিয়েছে। ঘুরে ঘুরে লোকের মুখ থেকে তিনি নন্তুদার খবর নিতেন।

লাইব্রেরি-ঘরে ঢুকেই মামা ব'সে পড়লেন চেয়ারে। আমার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেমন আছিস, জয়া?' প্রশ্নটা তিনি এমনভাবে করলেন যেন অনেক দিন তিনি আমায় দেখেন নি।

বললুম, 'ভাল আছি।'

'আজ থেকে তো তোর নতুন ক্লাস শুরু হ'ল?'

'হ্যাঁ, মামা।'

'কেমন লাগল প্রফেসর সেনের লেকচার?'

'প্রফেসর সেন? মানে—খুব ভালই লাগল।' ভয়ে আমার মুখ শুকিয়ে গেল। মামা আমার বিপদের কথা বুঝতে পারলেন না। তিনিই আবার বললেন, 'শঙ্করাচার্যের ওপর অনেক কাজ করেছেন ডক্টর সেন। তোর কথা আমি তাঁকে বলেছি। তাঁর একটি লেকচারও যেন বাদ না যায়। বিশেষ মনোযোগ দিয়ে শুনবি। জয়া—'

'কিছু বলবে না কি? থেমে গেলে কেন, মামা?' বড়মামা চোখ বুজে হঠাৎ যেন ধ্যানে বসলেন। ব্যাপার কি? আমার বিস্ময় কাটতে না কাটতে বড়মামা চোখ খুললেন। সোজা হয়ে বসলেন তিনি। মামা বললেন, 'লেখাপড়ার চেয়ে বড় জিনিস পৃথিবীতে আর কিছু নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও তোর দায়িত্ব আমি আর বেশীদিন নিতে পারব না। বিয়ে তোকে করতেই হবে।'

দুম্ ক'রে যেন মাথার ওপরে পাঁচ শো পাউণ্ড ওজনের একটা বোমা পড়ল। আমার জবাব শোনবার জন্যে মামা আমার মুখের দিকে চেয়েছিলেন। আমি বললুম, 'বিয়ে তো করতেই হবে।'

'হ্যাঁ, আমি একটি পাত্র ঠিকও ক'রে ফেলেছি। কাল তাকে আমি এখানে চা খেতে ডেকেছি।'

'খুব খুশী হলুম, মামা।'

'হ্যাঁ, ছেলেটি খুব ভাল। এ বছরই সে অ্যাটর্নি হবে। পরীক্ষা দেবে। বীরেশের বাবা জগদীশ আমার ক্লাস-ফ্রেণ্ড। সে একজন মস্ত বড় শেয়ার-ব্রোকার। এমন ছেলের সঙ্গে বিয়ে হ'লে সব মেয়েই খুশী হবে।'—তৃপ্তির হাসি হাসলেন মামা।

আমি বললুম, 'সেজন্যে আমি খুশী হই নি কিন্তু।'

'অ্যাঁ? তার মানে?'—মামার মুখের রঙ বদলাতে লাগল।

আমি জবাব দিলুম, 'খুশী হয়েছি এই জন্যে যে, তোমার ঘাড় থেকে

একটা মস্তবড় বোঝা নেমে যাবে। কিন্তু তোমার ঘাড় থেকে নামলেই কি ওজন আমার কমবে? এযাবৎকাল বাংলার সমাজজীবনে মেয়েরা কেবল বোঝা ব'লেই গণ্য হয়ে এসেছে। কিন্তু এখন থেকে নিয়ম বদলালো। পুরুষদেরই কেবল স্ত্রী বেছে নেবার অধিকার থাকবে না, মেয়েদেরও অধিকার থাকবে স্বামী বেছে নেবার। মামা, তুমি ভারত-বিখ্যাত ঐতিহাসিক—ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাজ যে বদলে যাচ্ছে তা কি তুমি দেখতে পাচ্ছ না?'

চোখের মণি দুটো ওপর দিকে তুলে মামা প্রশ্ন করলেন, 'কি রকম? একটা নমুনা দেখা।'

টাইপ-রাইটারের সামনেই আমি ব'সে ছিলুম। সেটাকে দেখিয়ে মামাকে জিজ্ঞাসা করলুম, 'এটা কি কেবল কলমের কাজ কমিয়ে দেবার জন্যে আবিষ্কৃত হয়েছে? না। টাইপ-রাইটার আবিষ্কৃত হওয়ার পরে মেয়েরা সব অফিসে ঢুকেছে কাজ করতে। তাতে কি সামাজিক বিধিব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটে নি? প্রতিটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে যে সমাজের পরিবর্তন ঘটছে, তা তুমি কিছুতেই অস্বীকার করতে পার না। অতএব—'

'অতএব বীরেশ কাল চা খেতে আসবে না, এই তো?'

'আসবেন। চা খাওয়ার সঙ্গে সমাজতত্ত্বের কি সম্পর্ক? তিনি আসুন। আসবে ভবতোষও।'

'ভবতোষ? সে কে?'—মামার চোখে সন্দেহের দৃষ্টি।

আমি বললুম, 'কেষ্টনগরে আমাদের পাশের বাড়িতে থাকত। তোমার মালপত্তর সব মাথায় ক'রে ও তুলে দিয়েছিল গাড়িতে। মনে পড়ে?'

ঘটনাটা যেন মৌর্যদের আমলে ঘটেছিল এমন ভাব দেখিয়ে বড়-মামা চেয়ার থেকে উঠে গিয়ে শেল্‌ফের সামনে দাঁড়িয়ে ভারত-ইতিহাসের বড় বড় বইগুলো সব নাড়াচাড়া করতে লাগলেন।

বিজ্ঞানের আলোয় ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্ধকার দূর হয়ে যাচ্ছে ব'লে কি বড়মামার জ্ঞানের মাটিতে ফাটল ধরল ?

যাকে অতি অনায়াসেই ভুলে যাওয়া যেত, তাকে যেন চিরদিন মনে ক'রে রাখবার জন্যে পাকা বন্দোবস্ত ক'রে এলুম আজ। ভবতোষকে নেমন্তন্ন ক'রে এসেছি। কাল বিকেলে সে চা খেতে আসবে। আসবেন জগদীশবাবুর ছেলে বীরেশবাবুও। এমন একটা কৌতুকপ্রদ পরিবেশের জন্যে বিছানায় শুয়ে আমোদ উপভোগ করতে লাগলুম। ঘুম এল না। মামা এ কি কাণ্ড ক'রে এলেন ? ঘাড়ের বোঝা নামিয়ে দেবার জন্যে তিনি বোধ হয় জগদীশবাবুকে পাকা কথা দিয়েও এসেছেন। মামার কাছে শুনলুম, জগদীশবাবুর খুব ইচ্ছে যে, তাঁর এক মাত্র ছেলের বউ যেন শিক্ষার আলো নিয়ে এ বাড়িতে প্রবেশ করে। ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্ধকার তিনি সহ্য করতে পারেন না। প্রচুর টাকা আছে ব'লে প্রচুর সভ্যতা তিনি আমদানি করেছেন ইয়োরোপ থেকে। স্ত্রী তাঁর মারা যাওয়ার পরে তিনি ইয়োরোপে বেড়াতে যান। ফেরবার মুখে তিনি একজন মেমসাহেবকে বিয়ে ক'রে নিয়ে এলেন কলকাতায়। বীরেশ-বাবুর বয়স তখন ষোল। মামা বললেন, কেবল রূপের প্রতি তাঁর তেমন পক্ষপাতিত্ব নেই। আমার বিদ্যার প্রতি আকর্ষণ তাঁর খুব বেশী। আমার পরীক্ষা-পাসের কৃতিত্বের কথা খবরের কাগজে প্রকাশিত হওয়ার পরে তিনি মামার কাছে বীরেশবাবুর বিয়ের প্রস্তাব উত্থাপন করেন।

পরের দিন মামার লাইব্রেরি-ঘরে চা খাওয়ার ব্যবস্থা হ'ল। চৌরঙ্গীর এক হোটেল থেকে খাবার আনবার বন্দোবস্ত ক'রে এলেন মামা নিজেই। খাবার এবং চা পরিবেশন করবার জন্যে সেখান থেকে লোকও আসবে একজন। বিকেলবেলার দিকে মামা বললেন, 'ডক্টর সেনকেও চা খেতে ডেকেছি। ভাল ক'রে পরিচয় হওয়ার সুযোগ পাবি তুই। তোর মামীমা কোথায় রে, জয়া ?'

'তিনি তো বাড়ি নেই। ফিরতে তাঁর রাত হবে।'

'কেন? কোথায় গেছেন তিনি?'

'দক্ষিণেশ্বর।'

'যাওয়াই উচিত তাঁর।'—এই ব'লে মামা লাইব্রেরি-ঘরে পায়চারি করতে লাগলেন। একটু পরেই তিনি আবার বললেন, 'ঘরের দেবতা আজকাল আর পুজো পান না।'

'তোমার তো তাতে সুবিধেই হয়েছে, মামা। বাজারে গিয়ে ফল কিনতে হয় না। তোমরা তো ভাবো, পুজোটা কেবল অশিক্ষিত মেয়েছেলেদের ব্যাপার।'

'পুজো-আচ্চার মধ্যে ধর্মপালনের সুযোগ কতটুকু আছে আমি তা জানি না।'

'পুজো-আচ্চার মধ্যেই তো আমাদের ধর্মের মূল নিহিত আছে। পুজোকে বাদ দিলে ধর্ম বাঁচে না। মামা, এ কথা কি তুমি স্বীকার কর না যে, ধর্ম না বাঁচলে কৃষ্টিও বাঁচে না? যে কোন বড় সভ্যতার মেরুদণ্ডই তো হচ্ছে আধ্যাত্মিকতা। তাই নয় কি?'

'ভেবে দেখব।'

'এতে ভেবে দেখবার কি আছে?'

'আছে বই কি, জয়া। 'ডগমা'-র প্রতি আমার চিরকালের অবিশ্বাস রয়েছে।'

'এইখানে পাশ্চাত্ত্য-সভ্যতার নতুন বিজ্ঞান তোমায় ঠকিয়েছে, মামা।'

'এ কথা কেন বলছিস রে?'

'বলছি এই জন্যে যে, 'ডগমা' ছাড়া ধর্ম কখনো বাঁচতেই পারে না। সত্যিকারের ইয়োরোপ তো বেঁচে আছে ধর্মের মধ্যেই। বিজ্ঞান নিয়ে কতকগুলো লোক মাতামাতি করছে বটে, তাতে আসল ইয়োরোপ বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে নি—তোমরাই কেবল ভুল দেখছ। ফুটপাথের

ছু-চারটে ভিখিরী দেখে তোমরা যদি সারা দেশটাকেই গরীব মনে কর, তা হ'লে তোমাদেরই ভুল হবে। ইয়োরোপের সভ্যতা কেবল বিজ্ঞান-আশ্রিত নয়, ধর্ম-আশ্রিতও বটে।'

দরজার বাইরে হাততালির শব্দ পেলুম। হঠাৎ দেখলুম যে, সাহেবী পোশাক প'রে কে এক ভদ্রলোক হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকছেন। বুঝলুম, ইনি নিশ্চয়ই বীরেশবাবুর বাবা জগদীশ রায়। তাঁকে দেখে বড়মামা একটু অপ্রস্তুত বোধ করলেন। এতটা সময় তর্ক করা তাঁর উচিত হয় নি। ভাবী শ্বশুর আসছেন, আমার ভাল ক'রে সাজসজ্জা করা উচিত ছিল। মামা আজ ছুপুরবেলা বাজার থেকে এক টিন পাউডার কিনে এনেছেন। পকেটে ক'রে লুকিয়ে নিয়ে এসেছিলেন টিনটা। আমি যখন স্নানঘরে ঢুকেছিলাম মামা তখন টিনটা রেখে দিয়ে এসেছিলেন আমার ঘরে। খাবার টেবিলে আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'তুমি কি একটা পাউডারের টিন কিনে এনেছ ?'

'পাউডার ?'—হাসবার চেষ্টা করতে করতে তিনিই আবার বললেন, 'পাগল না কি ! পাউডার মানে—'

'থাক্, মামা। এখন আর কথা ব'লো না, গলায় ভাত আটকে যাবে।'

জগদীশবাবু ঘরে ঢুকতেই মামা আমার দিকে চেয়ে বলতে লাগলেন, 'আরে এস এস জগদীশ ! যা তো জয়া, কাপড়-চোপড় বদলে আয়। বুঝলে জগদীশ, জয়া মা আমার ফরসাই ছিল। পাউডারের টিনটা তোর ঘরেই আছে। যা, তাড়াতাড়ি আসিস। বীরেশ এল না কেন হে ? লজ্জা পেল নাকি ?'—এক নিশ্বাসে মামা ছু রকমের কথা আমাদের ছুজনকে ব'লে ফেললেন। আমি দেখলুম, জগদীশবাবু মুখ টিপে টিপে হাসছেন। হাসতে হাসতেই তিনি মামাকে বললেন, 'বীরেশ একটু বাদেই আসবে।'

আমি বেরিয়ে আসছিলাম ঘর থেকে, এমন সময় মামা আমাকেই

এবার বললেন, 'তোর মামীমার বেনারসী শাড়িটা আমি বাক্স থেকে খুলে রেখে এসেছি তোর বিছানার ওপর।'—এই পর্যন্ত ব'লে তিনি উঠে এসে আমার কানের কাছে মুখ এনে নীচু স্বরে আবার বললেন, 'এক শিশি আলতা কিনে এনেছি। কেবল মুখের দিকে নজর দিলে চলবে না, পায়ের দিকেও নজর দিতে হবে, বুঝলি?'

'বুঝেছি, মামা। কিন্তু সেজেগুজে কি হবে! যা দেখবার তা তো এর মধ্যে উনি দেখে নিয়েছেন!'

জগদীশবাবু পুনরায় হাততালি দিতে দিতে মামার দিকে চেয়ে বললেন, 'জয়া-মার বিদ্যা বেনারসী শাড়ির চেয়েও সুন্দর, বুঝলে যাদব?'

'তা আর বুঝি নি!'—বড়মামার মুখের ওপর আনন্দের রঙ লেগে রইল। কি মনে ক'রে আমি জগদীশবাবুর পায়ের ধুলো নিয়ে ফেললুম। তিনি আমার মাথায় হাত রেখে বললেন, 'বিদ্যাই হচ্ছে ভগবান। অতএব তুমি ভগবানের আশীর্বাদ লাভ করেছ।'

ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম আমি। সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে নামতে অনুভব করলুম যে, আমার সারা দেহ ও মনের ওপর দিয়ে অদ্ভুত ধরনের একটা মিষ্টি পুলকের হাওয়া ব'য়ে যাচ্ছে। মামার বাড়িতে এতগুলো বছর রইলুম বটে, কিন্তু রইলুম একজন অতিথির মত। স্নেহ এবং ভালবাসার দুর্ভিক্ষের মধ্যে আমি এতগুলো বছর কাটিয়ে দিলাম বিনা প্রতিবাদে। জগদীশবাবু আজ যেন প্রথম এই দুর্ভিক্ষ ঘোচাতে এসে উপস্থিত হলেন মামার লাইব্রেরি-ঘরে। হাজার হাজার বইগুলোর প্রতিটি পাতাও যেন ভিজে উঠল জগদীশবাবুর স্নেহের বাষ্পে।

চৌরঙ্গীর হোটেল থেকে খাবার নিয়ে লোক এসেছে। মামার লাইব্রেরি-ঘরে টেবিল পাতাই ছিল। ওরা সব খাবার নিয়ে ওপরে উঠে গেল। একটু পরে বীরেশবাবুও এলেন। হয়তো ভবতোষও এক্ষুনি এসে যাবে। নামীনাথ দেখলুম, দাঁড়িয়ে আছে বাইরের দরজার কাছে।

নামীনাথের চোখে হতাশার ছায়া। ওরই চোখের ওপর দিয়ে কত রকমের খাবার লাইব্রেরি-ঘরে চ'লে গেল। আমি ওকে ডেকে বললুম, 'আরও একজন অতিথি আসবে। তুই বাইরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাক্। আমি হাতমুখটা একটু ধুয়ে আসি।'

'অতিথি কে, দিদিমণি ?'

'ভবতোষ—সে-ই হচ্ছে আসল অতিথি।'

আমার কথার সুর শুনে নামীনাথ হেসে ফেললে।

ঘরে এসে দরজা বন্ধ করলুম আমি। দেখলুম, আমার বিছানার ওপর মামীমার পুরনো একটা লাল বেনারসী শাড়ি প'ড়ে রয়েছে।

আয়না খুঁজতে লাগলুম। নিজেকে আমি তেমন ক'রে কোনদিনও দেখি নি। আজকে ভাল ক'রে নিজেকে দেখবার ইচ্ছে হ'ল প্রবল। মামার বাড়িতে বড় আয়না ছিল না। বারো ইঞ্চি মাপের ছোট একটা আয়না ছিল। সেটাই ব্যবহার করত সবাই। সেই আয়নাটা দেখলুম আমার ঘরেই রয়েছে। টেবিলের ওপর আয়নাটাকে রেখে নিজের মুখ দেখবার চেষ্টা করতে লাগলুম আমি। আয়নাটাকে বড্ড ছোট্ট মনে হ'ল আজ। আমি চেয়েছিলাম, আমার সবটুকু যেন আয়নাতে ভেসে ওঠে। কোন কিছুই যেন গোপন না থাকে। ভবতোষকে যেদিন আমি আমার সবটুকু দেব, সেদিন যেন কোন কিছুই আমার কাছে অজ্ঞাত না থাকে। হিসেব ক'রে জেনেশুনেই আমি ওকে সবটুকু দিতে চাই।

বাইরে থেকে নামীনাথ ডাকছিল, 'দিদিমণি, দরজা খোল।'

আয়না থেকে চোখ সরাতে গিয়ে হঠাৎ যেন আমার মনে হ'ল, ভবতোষের মুখটাও বুঝি আয়নার ওপর ভেসে উঠেছে। চোখ দুটো ওর চিনতে আমার ভুল হ'ল না। দৃষ্টির সবটুকুই ওর স্বচ্ছ নয়। দৃষ্টিতে ওর অন্ধকার রয়েছে। এই অন্ধকারের মধ্যে ভবতোষ লুকিয়ে রেখেছে ওর জীবনের সবচেয়ে প্রিয়তম সত্য। ভয় পেলুম আমি। চোখ

ছটোই তো সমস্ত দেহমনের আলো। চোখ যদি ব্যাধি-আক্রান্ত হয়, তা হ'লে দেহমনের ব্যাধিও ধরা পড়ে। ভবতোষ নিজেকে পুরোপুরি ভাবে আমার কাছে খুলে দেয় নি।

দরজা খুলে দিলুম। নামীনাথ ভবতোষকে নিয়ে এসেছে আমারই ঘরের সামনে। আমি বললুম, 'এস।'

'এটাই বুঝি তোমার ঘর ?'—জিজ্ঞাসা করল ভবতোষ।

'হ্যাঁ, কেবল ঘর নয়, এটাই আমার জগৎ। তুমি এস, ভবতোষ। এখানে প্রবেশ করতে কারও অনুমতি লাগে না।'

আমার ঘরে ঢুকে ভবতোষ অবাক হয়ে গেছে। বসবার মত এক ইঞ্চি জায়গা নেই এখানে। সবটুকু খালি-জায়গা বই দিয়ে ভর্তি। ভবতোষ বললে, 'ইলেক্‌ট্রিসিটি পুড়িয়ে পুড়িয়ে বুঝি সারা রাত জেগে বই পড় ?'

'ইলেক্‌ট্রিসিটির সঙ্গে সঙ্গে বোধ হয় নিজের কপালও পুড়িয়েছি, ভবতোষ।'

'কেন ? এমন কথা বলছ কেন, জয়া ?'

'এত বেশী প'ড়ে ফেলেছি যে, সংসারের কোন কিছুই আর সহজ-সত্য ব'লে বিশ্বাস করতে পারি না। সব জিনিস মাথা দিয়ে বুঝতে গিয়ে মনের অস্তিত্ব যেন সব ধুয়ে মুছে গেছে। সংসারে সুখে-স্বচ্ছন্দে বাস করবার জন্যে মাথার ওপরে বইয়ের বোঝা ব'য়ে বেড়িয়ে লাভ কি ?'

'আপাতত তোমার এই বইগুলোর ওপরেই ব'সে পড়ি, কি বল ?'

'তাতেও আমার মাথার বোঝা কমবে না।'

নামীনাথ ঘরের বাইরে থেকে বললে, 'দিদিমণি, বাবু তোমায় লাইব্রেরি-ঘরে ডাকছেন।'

'যাচ্ছি।'—ভবতোষকে বললুম, 'কাল যখন তোমায় নেমন্তন্ন করলুম, তখন আমি জানতুমই না যে, মামা এদিকে এক কাণ্ড ক'রে ব'সে আছেন। তুমি শুনলে হয়তো আমায় ভুল বুঝবে।'

'তুমি যদি ঠিকমত বোঝাতে পার, তা হ'লে ভুল বুঝব কেন?'

'ভুল বুঝবার ভয় আছে, তুমি পুরুষমানুষ কিনা।'—এই পর্যন্ত ব'লে মিনিট দুই চুপ ক'রে রইলুম আমি। তারপর বিয়ের ব্যাপারটাকে হেসে উড়িয়ে দেবার ভঙ্গি ক'রে বললুম, 'মামা তাঁর ঘাড় থেকে বোঝা নামাবার জন্যে তাঁর এক বন্ধুকে ডেকে নিয়ে এসেছেন চা খাওয়াতে। বন্ধু তাঁর একলা আসেন নি, বন্ধুর ছেলেও এসেছেন সঙ্গে। মামার খুব ইচ্ছে, ছেলেটির সঙ্গে আমার বিয়ে হয়। আমার ইচ্ছের সঙ্গে যে মামার ইচ্ছে মিলবে না, তা তিনি এখনও বুঝতে পারেন নি।'

'মিললেই বা ক্ষতি কি?'—প্রশ্ন করার সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল ভবতোষ।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'কোথায় যাচ্ছ?'

'চা খেতে লাইব্রেরি-ঘরে। চল, তোমার মামার সঙ্গে নতুন ক'রে পরিচয় করিয়ে দেবে।'

ভবতোষকে সঙ্গে নিয়ে আমি এলুম লাইব্রেরি-ঘরে। ভবতোষকে আমি পরিচয় করিয়ে দিলুম সবার সঙ্গে। চায়ের টেবিলে আমরা সবাই এসে বসলুম। আমি ইচ্ছে ক'রেই বসলুম এসে বীরেশবাবুর পাশে। ডক্টর সেনের পাশে বসল ভবতোষ। আমার বসবার ব্যবস্থা দেখে মামা খুশী হলেন খুব। কেবল বীরেশবাবুর পাশে বসবার জন্যেই মামা খুশী হলেন না, ভবতোষ আমার থেকে দূরতম চেয়ারে বসল ব'লেও তিনি খুশী হলেন।

আলোচনা শুরু হ'ল। ডক্টর সেন বললেন, 'ওরিয়েন্টাল সোসাইটির জার্নালে তোমার লেখাটা পড়লুম সেদিন, যাদব। তোমার কি সত্যি সত্যি বিশ্বাস যে, সর্বভারতীয় কৃষ্টির চেয়ে বাংলার কৃষ্টি উন্নততর? মানে সুপিরিয়র?'

দেওয়ালে টাঙানো ভারতবর্ষের মানচিত্রটার দিকে মামা চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। ভারতবিখ্যাত ঐতিহাসিকের মতামত যে কতটা

মূল্যবান, ঘরের নৈঃশব্দ্য থেকে আমাদের তা বুঝতে অসুবিধা হ'ল না। দার্শনিক ডক্টর সেন অসীম ধৈর্যসহকারে চুপ ক'রে ব'সে রইলেন মামার উত্তর শোনবার জন্যে। শেয়ার-ব্রোকার জগদীশবাবু বড়মামার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কালচারের বাংলা অনুবাদ কি কৃষ্টি?'

অ্যান্টি-ক্লাইমাক্সের কৌতুক উপভোগ করবার জন্যে প্রত্যেকেই যেন একটু নড়েচড়ে বসলেন।

শেয়ার-ব্রোকার জগদীশবাবুর প্রশ্নের জবাব দিলেন না মামা। তিনি ডক্টর সেনের দিকে চেয়ে বললেন, 'পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার আলোয় যে বাংলার সমাজ-জীবনের অন্ধকার অনেকটা দূর হয়েছে, সে সম্বন্ধে আজ আর কেউ সন্দেহ প্রকাশ করতে পারে না। যে কারণেই হোক আমরাই প্রথম ওদের সভ্যতাকে আমন্ত্রণ ক'রে ঘরে এনেছি। এই যে চেয়ার টেবিলগুলো দেখছ, এ তো ওদের কাছ থেকেই নেওয়া। ইংরেজী ভাষা শিখেছি ব'লেই বাংলা ভাষার এত উন্নতি হয়েছে আজ। ডক্টর সেন, আমার বিশ্বাস, গত দেড় শো বছরে বাংলার কৃষ্টি এমন একটা বিশেষ রূপ নিয়ে গ'ড়ে উঠেছে, যার মান সর্বভারতীয় কৃষ্টির চেয়ে উন্নততর। আমি প্রথমে বাঙালী, তার পরে ভারতীয়। আমি যদি বাঙালী হিসেবে বাঁচতে না পারি তা হ'লে কেবল ভারতীয় হয়ে বাঁচতে চাই না। বাংলার এই বিশেষ কৃষ্টিটুকু যদি না রইল তবে হনলুলু, লণ্ডন কিংবা বোম্বাই সবই তো আমার কাছে এক হয়ে গেল। কথাগুলো তোমাদের কাছে খুবই কঠিন শোনাচ্ছে। কঠিন হ'লেও সত্য।'

ডক্টর সেন বললেন, 'মানুষ তো আজ গোটা পৃথিবীটাকে এক রাষ্ট্র হিসেবে কল্পনা করতে শুরু করেছে। মানুষ কল্পনা করছে যে, এমন একদিন আসবে যখন এই সব একাধিক বিভিন্ন রাষ্ট্রের সীমানা সব মুছে গিয়ে গোটা পৃথিবীটাই এক হয়ে যাবে। এমন একটা কল্পনা যখন বাস্তবে রূপান্তরিত হচ্ছে তখন তুমি চাইছ বাংলার চারদিকে উঁচু উঁচু প্রাচীর তুলে দিতে। কি দরকার মানুষকে খাঁচার মধ্যে ভ'রে

রাখবার? খাঁচার মধ্যে যত ভাল খাদ্যই থাক্ না কেন, খাঁচা তো চিরকাল খাঁচাই থাকবে। কৃষ্টির খাঁচা তো আরও ভয়ঙ্কর! পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ না থাকলে আমরা তো কখনই বড় হতে পারব না।'

'ডক্টর সেন, পৃথিবীটা যেদিন একপৃথিবী হয়ে যাবে সেদিন মানব-সভ্যতার বিলুপ্তি ঘটবে অনিবার্যভাবে। বিজ্ঞানের উন্নতি হচ্ছে ব'লেই তোমরা একপৃথিবীর কথা কল্পনা করছ। কিন্তু আমার বিশ্বাস, আসলে ঠিক এর উল্টোটাই ঘটবে। না ঘটলে বুঝতে হবে, আমরা মরলুম। ডক্টর সেন, একটু আগে তুমি পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগের কথা বলছিলে না?'

'হ্যাঁ, বলছিলুম।'

'যোগাযোগের সেতুগুলো কি তুমি দেখতে পাচ্ছ না? চৈতন্যদেব ছুটো হাত বাড়িয়ে রেখেছেন কেন? কাকে টানতে চান তিনি? রামকৃষ্ণ কি? রবীন্দ্রনাথের মধ্যে দিয়ে বাংলা কি তার কৃষ্টির কথা প্রচার করে নি? বাঙালী রবীন্দ্রনাথ যা পেরেছেন, গুজরাটী রবীন্দ্রনাথ কি তা পারতেন?'

প্রশ্ন ক'রে মামা চেয়ে রইলেন ডক্টর সেনের দিকে। কি ভাবছিলেন দার্শনিক ডক্টর সেন? শঙ্করাচার্যকে সর্বভারতীয় পরিচ্ছদে আবৃত ক'রে বাংলার বৈশিষ্ট্যকে ধূলিসাৎ করা যায় কি না? রামানুজকে দক্ষিণেশ্বরে টেনে আনলে ভক্তির রাস্তা সমতল থাকত বটে, কিন্তু বাঙালী রামকৃষ্ণের কথামৃতের ভাষা যেত বদলে। মামার বিশ্বাসের রাস্তা ধ'রে আমিও যেন পথ হাঁটতে লাগলুম। হাঁটছি আর চিন্তা করছি। কোন্ ভাষায় চিন্তা করছি আমি? বাংলা। মনে হ'ল বাংলা ভাষার অমৃত-সমুদ্রে আমি যেন অবগাহন ক'রে উঠলুম। জীবনে এই প্রথম আমি বড়মামার ধ্যানের রাজ্যে প্রবেশ করলুম। তিনি কেবল ঐতিহাসিক নন, তিনি ষোল-আনা বাঙালী। কেবল ষোল-আনা বাঙালী নন, তিনি সাধক। বাংলাকে বাঁচিয়ে রাখবার মহাসাধনায় তিনি জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত খরচ

করছেন। মামার এই বিশেষ রূপটি আমি কোনদিনই দেখতে পাই নি। আজ দেখতে পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করলাম। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার একটা বিরাট অংশ হচ্ছেন আমার বড়মামা ডক্টর যাদবচন্দ্র মিত্র। বাঙালী-বড়মামার কৃষ্টির আলোয় নন্তুদার চেহারাটা যেন আমি আজ খুব পরিষ্কারভাবে দেখতে পেলুম। মনে হ'ল, নন্তুদা ভুয়ো, তার স্বদেশপ্রেমের মধ্যে এক রত্তিও প্রেম নেই। প্রেমের অর্থ নন্তুদারা জানে না। তাই ওরা ব্যাঙ্ক লুঠ করতে গেছে। খুন করতে গেছে দু-চারটে জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটকে। কতকগুলো পথভ্রষ্ট দুধের শিশু কলসি কলসি তাড়ি খেয়েছে দুধ মনে ক'রে। ওরা মাতাল, ওরা সাধক নয়। আমার প্রথম যৌবনের নায়কের তালিকা থেকে ওরা সব অন্তর্হিত হ'ল। তালিকার মাঝখানে দাঁড়িয়ে রইলেন একমাত্র বড়মামা। সত্যিকারের হিরো তো তিনিই।

আলোচনা থেমে গেছে। ইতিহাস ও দর্শনের রাজ্য থেকে ওঁরা দুজন বেরিয়ে এলেন। চৌরঙ্গীর হোটেল থেকে খাবার এসেছে। ওঁরা সব মনোযোগ দিয়ে এবার খাবার খেতে লাগলেন। বাদাম-মেশানো কেকের টুকরো মুখে পুরে দিয়ে ডক্টর সেন বললেন, 'আর কোথাও না হোক, বিলিতী সভ্যতার স্বাদ পাওয়া যাচ্ছে এই কেকগুলোর মধ্যে। ওরা চ'লে গেলে, আমরা কেবল শেক্সপিয়ারকেই রাখব না, কেক-পেস্ট্রিও রেখে দেব।' তাঁর কথা শুনে শেয়ার-ব্রোকার জগদীশবাবু খুশী হলেন খুব। তাঁর ঘরে কেবল শেক্সপিয়ার এবং কেক্-পেস্ট্রিই নেই, বিলিতী বউ-ও আছেন।

চা খাওয়া শেষ হতে প্রায় রাত আটটা বাজল। বীরেশবাবু এসে অবধি চুপ ক'রে ব'সে ছিলেন। চা খাওয়া শেষ হয়ে যাচ্ছে দেখে আমি তাঁকে বললুম, 'আপনি তো চুপ ক'রে রইলেন। আজকের সন্ধ্যেটা বোধ হয় আপনার কাছে খুব বোরিং লাগল ?'

আমার দিকে মুখ ঘুরিয়ে বীরেশবাবু নীচু সুরে বললেন, 'বাবা কেন

যে আমায় হঠাৎ এখানে ডেকে নিয়ে এলেন আমি তা ঠিক বুঝতে পারলুম না। আপনারাই বা হঠাৎ চা-পার্টির আয়োজন করলেন কেন? যাদববাবুর জন্মদিন না কি?'

বীরেশবাবুর কথা শুনে মনে হ'ল, তিনি তাঁর বিয়ের ব্যাপারটার কিছুই জানেন না। কি বলব ভাবছিলুম। ভেতরের ব্যাপারটা এই সুযোগে তাঁকে ব'লে দেওয়াই ভাল। কথার মধ্যে ইঙ্গিত দিয়ে বললুম, 'বোধ হয় কোন গুরুতর কারণে মামা আপনাদের দুজনকে চা খেতে ডেকেছেন।'

'সেই কারণটাই তো এখনও বুঝতে পারছি না।'

'এতগুলো পুরুষমানুষের মধ্যে আমাকে দেখে আপনার কি কোন সন্দেহ জাগছে না মনে?'

'সন্দেহ? না। কেন?'

'আমাকে দেখাবার জন্যে মামা আপনাদের আজ চা খেতে ডেকেছিলেন। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, আপনাদের আমি কিছুই দেখাতে পারলুম না।'

'কেন? দেখার আর বাকি রইল কি?'

'বাকি রইল পাউডারের টিন, আলতার শিশি আর বেনারসী শাড়ি।'

আমার কথা শুনে বীরেশবাবু হাসতে হাসতে বললেন, 'কিন্তু—কিন্তু বাবা একটা মস্ত বড় ভুল করেছেন। আমার বোধ হয় অন্য কাউকে বিয়ে করতে হবে।'

'আমারও—মানে আমি অন্য একজনকে ভালবাসি।'

'বাঁচলুম আমি।' বলল বীরেশবাবু।

'আমিও।'

'আসুন না, আমরা দুজনে দুজনার মনের কথা ব্যক্ত করি।'

'এখন থাক্। বুড়োমানুষেরা দুটো ধাক্কা একসঙ্গে সহ্য করতে পারবেন না। নন্তুদার কথা ভেবে ভেবে মামার স্বাস্থ্য তো ভেঙে

চৌচির হয়ে গেছে। আমি ভাবছি, আমার কথাটা মামাকে আমি জানাব দু-চার দিন পরে।'

'আমিও তা হ'লে আমার কথাটা বাবাকে জানাব সুযোগ-সুবিধে বুঝে।' বীরেশবাবু শক্ত হলেন।

'আপনার পরীক্ষার ফল বুঝি বেরয় নি?'

'না। ফল বেরুবার পরে যখন একেবারে কাজ শুরু করব, তখন না হয় বাবাকে খবরটা জানাব।'

'এর চেয়ে ভাল ব্যবস্থার কথা ভাবাই যায় না। উপার্জন করতে শুরু করলে অভিভাবকদের সব কথাই অগ্রাহ্য করা যায়।'

'আপনিও উপার্জনের কথা ভাবছেন না কি?'

'এম. এ. পাসের পরে কলেজে চাকরি নেব।'

'বিয়ের কি হবে? মানে, যাঁকে ভালবাসেন তাঁর সঙ্গে বিয়ে হবে কবে?'

হঠাৎ সামনের দিকে চেয়ে দেখি যে, মামা এবং জগদীশবাবু কথা বন্ধ ক'রে আমাদের দিকে চেয়ে আছেন। তাঁদের দৃষ্টিতে খুশির সংবাদ। মামা এবার জগদীশবাবুকে বললেন, 'জগদীশ, জয়ার সঙ্গে বীরেশের বিয়ের প্রস্তাব তা হ'লে আজ আমি সামাজিকভাবে উপস্থিত করছি। তোমার কোন আপত্তি নেই তো?'

'আপত্তি?'—জগদীশবাবু একটু হেসে বললেন, 'আমি তো জয়া-মাকে ঘরে তোলবার জন্যে অনেক দিন থেকে অপেক্ষা করছি।'

মুখ ঘুরিয়ে ডক্টর সেন মামাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'জয়া কি তবে দর্শনশাস্ত্রে অনার্স নিয়ে বি. এ. পড়বে না?'

'পড়বে। বিয়ের পরে কি বি. এ. পড়া যায় না?'—বললেন জগদীশবাবু।

মামা এবার আমার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোর কোন অমত নেই তো, জয়া?'

'জবাবটা কি এক্ষুনি দিতে হবে, মামা ?'

জগদীশবাবু বিপদ থেকে রক্ষা করলেন আমায়। তিনি বললেন, 'না, এক্ষুনি দেওয়ার দরকার নেই। কাল পরশু যখন হয় দিলেই চলবে। না দিলেও আমরা কেউ আপত্তি করব না। ছেলে এবং মেয়ে ছজনেই বড় হয়েছে। স্বামী কিংবা স্ত্রী বেছে নেবার স্বাধীনতা ওদের ছজনেরই রইল।'

জগদীশবাবুর কথা শুনে বড়মামা গম্ভীর হয়ে গেলেন। ভবতোষের দিকে দৃষ্টি দিলুম আমি। সে তো ঘরে ঢোকবার সময় থেকেই গম্ভীর হয়ে আছে। জগদীশবাবুর কথা শুনে সেও দেখলুম খানিকটা নড়াচড়া করছে। আর এক পেয়ালা চা খাওয়ার জন্মে ভবতোষ ব্যগ্র হয়ে উঠেছে। কেবল ভবতোষ নয়, এক এক ক'রে প্রত্যেকেই আর এক পেয়ালা চা খাবার জন্মে উৎসুক হয়ে উঠলেন।

বীরেশবাবু পুনরায় আমার কানের কাছে মুখ এনে বলতে লাগলেন, 'আপনাকে ধন্যবাদ। আমায় আজ বাঁচিয়েছেন আপনি। কি বিপদেই না প'ড়ে গিয়েছিলুম। যাক, এখন তো দম ফেলবার সময় পাওয়া গেল।'

বীরেশবাবুর কথায় ছেলেমানুষী সুর শুনতে পেলুম। বুঝলুম, বিয়ে করবার মত মনটা তাঁর আজও সাংসারিক গাম্ভীর্যে ভারী হয়ে ওঠে নি। একটু পরেই আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'বিয়ে করবেন তো আপনি, বাবাকে এত ভয় পান কেন ? মনের কথা তাঁকে খুলে বলেন না কেন ?'

'বলি না তার কারণ, মেয়েটিকে বাবা সামাজিকভাবে ঘরে তুলতে আপত্তি করবেন।'

'কেন ?'—কৌতূহল আমার বাড়ল।

বীরেশবাবু সোজাসুজি জবাব দিলেন না। জবাবটা আদৌ দেবেন কি না তাই নিয়ে তিনি ভাবতে বসলেন। আমি তাই তাঁকে বললুম, 'থাক্, আপনাকে আর বিব্রত করতে চাই নে।'

'না না, আমি একটুও বিব্রত বোধ করছি না। মেয়েটি আমাদের সমান ঘর নয়। তা ছাড়া মেয়েটি সাধু বোসের দলের সঙ্গে নেচে বেড়ায় ব'লে বাবার আপত্তি উঠবে। মেয়েটি নাচ শিখেছে চমৎকার।'

আমাদের আলোচনায় বাধা পড়ল। ঘরে ঢুকে প্রথমেই আমি লক্ষ্য করেছিলুম যে, জগদীশবাবু টেবিলের ওপরে একটা গহনার বাক্স রাখলেন। সেটা এবার হাতে নিয়ে তিনি মামাকে বললেন, 'আজ একেবারে আশীর্বাদ ক'রে যাব ব'লে তৈরী হয়ে এসেছিলুম। কিন্তু জয়া-মার যখন আপত্তি উঠেছে, তখন বাক্সটা ফিরিয়ে নিয়ে চললুম—'

বাধা দিয়ে আমি বললুম, 'আপত্তির কথা আমি তুলি নি। আমি কেবল ভেবে দেখবার জন্যে একটু সময় চেয়েছিলুম।'

আমার কথা শুনে ভবতোষ এবং বীরেশবাবু দুজনেই খানিকটা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। কেউ কোন কথা বলবার আগে ভবতোষ বলল, 'আমি এবারে চলি।'

বীরেশবাবুও সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'আমাদেরও এবার যাওয়ার সময় হ'ল।'

ভবতোষের দিকে চেয়ে ডক্টর সেন জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কোন্ ইয়ারে পড়ছ?'

ভবতোষ বলল, 'থার্ড ইয়ারে।'

'অনার্স আছে?'

'আছে, দর্শনশাস্ত্রেই।'

'ও, তা হ'লে দেখছি তুমি আমারই ছাত্র!'—ডক্টর সেন আরও কি যেন ভবতোষকে জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলেন। চা-পার্টিতে ভবতোষের উপস্থিতির কোন একটা অর্থ খুঁজে বার করতে পারেন নি ব'লেই বোধ হয় তিনি আবার ওকে প্রশ্ন করবেন ব'লে ভাবছিলেন। তাঁর মনের ভাব বুঝতে পেরেই আমি বললুম, 'কেষ্টনগরে ওরা আমাদের পাশের বাড়িতে থাকত। মামার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল।'

'ওঃ, বুঝতে পেরেছি।'—বলতে বলতে ডক্টর সেনও উঠে পড়লেন। সবাই উঠে পড়লেন, বড়মামাই কেবল চুপ ক'রে ব'সে রইলেন চেয়ারে। মনে হ'ল, তিনি আর এখানে উপস্থিত নেই। তিনি তাঁর ধ্যানের রাজ্যে প্রবেশ করেছেন। আমিই তাই মামাকে বললুম, 'ওঁরা সব চ'লে যাচ্ছেন, মামা।'

'কি ঠিক হ'ল?'—মামা ফিরে এলেন তাঁর ধ্যানের রাজ্য থেকে।

'আপাতত কিছুই ঠিক হ'ল না।'—ব'লে জগদীশবাবুই আবার বললেন, 'এবার চলি, যাদব। মা জয়া, একদিন এসো আমার বাড়িতে। কবে যাবে বললে আমি গাড়ি পাঠাব।'

'আপনাকে খবর দেব। মামীমাকে সঙ্গে নিয়েই যাব।'

'বেশ তো, কাল সন্ধ্যেবেলা?'—প্রশ্ন করলেন জগদীশবাবু।

আমি কিছু বলবার আগে বীরেশবাবু বললেন, 'কাল সন্ধ্যেবেলা আমি বাড়ি থাকব না, বাবা।'

'কেন, কোথায় যাচ্ছ?'

'নিউ এম্পায়ারে। সাধু বোসের দল নাচ দেখাবে কাল। আমি টিকিট কিনেছি।'

আমি বললুম, 'অন্য একদিন হবে, আমি খবর দেব।'

সব দিক থেকে সবারই বিপদ কাটল। সবাই একসঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। সকলের পেছনে গেল ভবতোষ। মামার মনে সন্দেহ জাগতে পারে ব'লেই আমি ভবতোষের সঙ্গে একটি কথাও বললুম না। আমি বুঝলুম, ওর মনের আকাশে মেঘ জমেছে। আজ সারাটা রাত দুঃখের বারিপাতে কষ্ট পাবে ভবতোষ। কাল দেখা না হওয়া পর্যন্ত সবটুকু মেঘ ওর দূর হবে না।

সবাই চ'লে যাওয়ার পরেও মামা ব'সে রইলেন চুপ ক'রে। কি করব ভাবছিলাম। মামার সামনে দাঁড়িয়ে মনে হ'ল, সত্যিই আমার ওজন বেড়েছে। আমি বোঝার মত প'ড়ে আছি মামার ঘাড়ের ওপর।

চৈতন্যের বাংলায় আমিই কেবল প্রেমের স্পর্শ পেলুম না। কৃষ্ণনগরের কুড়নো মেয়ে বৃত্তি পেলে কি হবে, বাংলায় সমাজে আমার কোন স্থান নেই। জগদীশবাবু আজ আমার জন্যে স্থানের ব্যবস্থা করতে এসেছিলেন। কিন্তু নিজের মনঃস্থির করবার আগেই বীরেশবাবুর মনের খবর আমি পেলুম। আজকের পার্টিতে এতগুলো চায়ের পেয়ালার মধ্যে আমার ভবিষ্যৎ জীবনের সত্য-আলেখ্য যেন ফুটে বেরুল পরিষ্কারভাবে। আলেখ্যটি স্বাভাবিক নয়—ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ চায়ের পেয়ালায় যেন সেটি ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। সেই রাত্রেই আবার আমার মনে হ'ল, ভবতোষকে আমি পুরোপুরি পাই নি।

মামাকে বললুম, 'তোমার কোন ভয় নেই। বীরেশবাবুর সঙ্গে বিয়ে যদি না হয়, তা হ'লে আমি নিজেই নিজের একটা ব্যবস্থা ক'রে নিতে পারব।'

'কি ব্যবস্থা? চাকরি-বাকরি করবি না কি?'

'যদি করি, তাতে তোমার আপত্তি কি? অর্থনীতির সঙ্গে সমাজতত্ত্বের নিবিড় সম্পর্ক। অর্থের সংস্থান হয়ে গেলেই সামাজিক সমস্যাটা আর সমস্যাই থাকবে না। আর বিয়ে যদি করি, তা হ'লে ভবতোষকেই করব।'—শেষ পর্যন্ত সাহস ক'রে কথাটা ব'লেই ফেললুম মামাকে।

'তার মানে?'—মামা সোজা হয়ে উঠে বসলেন, 'তার মানে কি, জয়া? ভবতোষের তো চালচুলো কিছুই নেই?'

'আমরা সব তৈরি ক'রে নিতে পারব, মামা। এতে যদি তোমার আপত্তি থাকে, তা হ'লে আমায় তুমি কলেজের হস্টেলে পাঠিয়ে দাও। বৃত্তির টাকায় সবটা খরচ কুলোবে না জানি—'

কথা শেষ করতে দিলেন না মামা। তিনি তাঁর স্বর খুবই নরম ক'রে বলতে লাগলেন, 'খরচ কুলোবে না, তবু তুই যাবি? তুই চ'লে গেলে আমার কি উপায় হবে? অন্ধের হাতে লাঠি না থাকলে অন্ধের তো পথ চলা হবে না। জয়া, নষ্ট গেছে, যাক। কিন্তু তুই যাবি কেন?

তোর কি মনে পড়ে না, বাজার থেকে আমার জন্যে তুই কইমাছ কিনে আনতিস? সেই কইমাছের ঝোল খেয়ে আমি কলেজে পড়াতে যেতুম। আমার সব ইংরিজী প্রবন্ধগুলো তুই টাইপ না ক'রে দিলে আজও আমি সেগুলো বিলেতের কাগজে পাঠাতে পারি না। আমাদের হিন্দু-পরিবারে আধ্যাত্মিকতার অভাব ঘটেছে ব'লে তুই আমায় কতদিন অনুযোগ দিয়েছিস। শুনবি জয়া, তুই যদি আমায় চোখে আঙুল দিয়ে এত বড় অভাবটাকে দেখিয়ে না দিতিস, তা হ'লে আজও আমি দরিদ্র হয়ে থাকতুম। যে-দেশের ইতিহাসে আমি আধ্যাত্মিকতা দেখতে পাই নি, তেমন ইতিহাস লিখে কি লাভ হ'ত, জয়া? বল্, কি লাভ হ'ত?'

মামার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল।

মামার ঘর থেকে যখন নীচে নেমে এলুম, রাত তখন দশটা। মামা আর রাত্রে খাবেন না। চায়ের সঙ্গে বেশী ক'রে খেয়ে নিয়েছেন তিনি। রাত্রে রান্না করতে মামা বারণ ক'রে দিয়েছিলেন। মামীমা তো রাত্রে কেবল একটু দুধ খান, সেই সঙ্গে প্রসাদ। নামীনাথ এক বেলা বিশ্রাম পাবে ব'লে মামা মনে মনে খুশী হয়েছেন।

নীচে নেমে আসতেই দেখি, নামীনাথ দাঁড়িয়ে রয়েছে। সে বলল, 'হাত মুখ ধুয়ে এস। রাত তো কম হয় নি।'

বললুম, 'আজ আর রাত্রে খাব না। তুই বিশ্রাম করতে যাস নি কেন?'

'সারাটা বিকেলই তো বিশ্রাম করেছি। কি কি খেলে?'

'কেক, পেস্ট্রি, প্যাটিস—'

'কি রকম দেখতে? কি ক'রে তৈরি করতে হয় তুমি জান?'

'ওসব বড় হোটেলের বাবুর্চিরা জানে। খুব পেট ভ'রে খেয়েছি আজ।'

আমার কথা শুনে নামীনাথ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। আমি চ'লে গেলুম নিজের ঘরে।

খানিকক্ষণ পরে স্নান-ঘরে যাওয়ার জন্যে বাইরে বেরুতে দেখি, রান্নাঘরে আলো জ্বলছে। উঁকি দিয়ে দেখতে গেলুম আমি। নামীনাথকে দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলুম। সে একটা বড় ডেকচিতে মাছ, তরকারি সব ঢেলে ফেলছে। রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকলুম আমি। জিজ্ঞাসা করলুম, 'কি করছিস রে? রাত্রিবেলা রান্না করেছিলি না কি?'

'করেছিলুম। বড় হোটেলের রান্না খেয়ে তোমার তো আর খিদে নেই। জয়াদি, তোমরা কেন বাবুর্চি রাখ না? আমি তো রাঁধতে জানি না।'

নামীনাথের মনের কথা বুঝলুম আমি। চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলুম রান্নাঘরে। ভাত, মাছের ঝোল আর তরকারি-ভর্তি ডেকচিটা হাতে নিয়ে নামীনাথ আমার সামনে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'কোথায় যাচ্ছিস?'

'রাস্তায়। ডাস্টবিনের কাছে দুটো ভিখিরী ব'সে আছে। আমার রান্না ভিখিরীদের খুব ভাল লাগবে, দিদিমণি।'—এই ব'লে নামীনাথ বাইরের ফটক দিয়ে বেরিয়ে গেল রাস্তায়।"

কুমারী জয়া বসু কলমটা ফেলে রাখলেন চিঠি-লেখা কাগজগুলোর ওপর। বিছানার একটা অংশে প'ড়ে রইল জীবনের অনেকগুলো বছর। কার্শিয়ংয়ে তাঁর অষ্টম রাত্রি কাটছে। আজ তিনি পরিশ্রান্ত, সমস্তটা রাত কাটল তাঁর চিঠি লিখতে। অনেকটা পথ তিনি আজ অতিক্রম করেছেন। কৈশোর পেরিয়ে গেল, এল যৌবন। যৌবনের প্রথম সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে তিনি দেখতে পেলেন ভবতোষকে। ভবতোষের পেছনে দাঁড়াল এসে বীরেশ। জীবন ও জগতের অগণিত রহস্য আজ ভিড় জমিয়েছে জয়া বসুর চতুর্দিকে। কোন রহস্যকেই তিনি আর ভয় করেন না। জীবন থেকে পালিয়ে যাওয়ার বিন্দুমাত্র লোভ আসে নি। ভবতোষের সঙ্গে তিনি পথ হাঁটবার স্বপ্ন দেখতে লাগলেন।

রাত শেষ হয়ে গেছে। প্রত্যুষের নরম আলো জানলার ফাঁক

দিয়ে ঘরে এসে পড়ল। কুমারী জয়া বসু চিঠি লেখা বন্ধ ক'রে ঘরের জানলাগুলো খুলে দিলেন সব। আলোর প্রতি আকর্ষণ তাঁর বাড়ছে। জানলায় দাঁড়িয়ে ঘন ঘন নিশ্বাস টানতে লাগলেন তিনি। বোধ হয় ফুটো ফুসফুস আদিম উদ্যমে শক্তি সঞ্চয় করছে। মৃত্যুর মুহূর্তটি তিনি দেখতে পেয়েছিলেন ব'লে সময়ের অভাব তিনি অনুভব করেছিলেন কার্শিয়ংয়ের প্রথম রাত্রে। আজ আর অভাবের কথা মনে পড়ে না। মৃত্যুকে তিনি অনেক দূরে ঠেলে দিয়েছেন। জগতের কোন এক অদৃশ্য পথ দিয়ে আরও অনেকগুলো বছরের আয়ু এসে কুমারী জয়া বসুর মধ্যে সৃষ্টি করেছে নবতম রোমাঞ্চের আস্বাদন। জীবনটাকে নতুন ক'রে জানবার মহা আগ্রহে প্রত্যূষের নরম আলোয় তিনি অবগাহন করলেন। জীবন থেকে পালিয়ে যাওয়ার আর তিনি প্রয়োজন বোধ করলেন না।

দরজায় মৃদু করাঘাত। নিশীথ নিশ্চয়ই সকালের চা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। দরজা খুলে দিলেন জয়া বসু। ট্রে হাতে ক'রে নিয়ে এসে নিশীথ দাঁড়াল জয়া বসুর সামনে। তিনি দেখলেন, নিশীথ কেবল চা আনে নি, হালকা এরারুটের দুখানা বিস্কুটও এনেছে। নিশীথ বলল, "এখন থেকে খালি পেটে আর চা খেতে পাবে না।"

"কেন ?"—জিজ্ঞাসা করলেন জয়া বসু।

"খালি পেটে চা খেলে লিভার খারাপ হয়।"

"এ ব্যবস্থা কে করল ?"

"ডাক্তার প্রধান। না, তুমি আপত্তি করতে পারবে না। মদ ছেড়েছ ব'লে খালি পেটে চা খাবে তা কিছুতেই হয় না।"

নিশীথের কথা শুনে জয়া বসু হাসতে হাসতে বললেন, "কলকাতার লোকেরা কেউ জানবে না যে, আমি এত বেশী ভাল হয়ে গেছি।"

"ভাল হ'লেই চলবে, খুব বেশী ভাল হওয়ার দরকার নেই, দিদিমণি। তোমাকে দিয়ে দু দিকেই ভয় আছে।"

"দু দিক মানে ?"

"খারাপ যখন হতে আরম্ভ করলে, তখন দেখলুম তুমি কত নীচে নেমে যাচ্ছ। আবার ভাল হতে আরম্ভ করলে হয়তো একদিন বাড়ি-ঘর সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে সেণ্ট হেলেনের ওই আশ্রমে গিয়ে ঢুকে পড়তে পার।"

"কে এল রে ?"

"দেখছি।"—নিশীথ বেরিয়ে গেল করিডোরের দিকে।

একটু বাদেই নিশীথ ফিরে এসে বলল, "অমিতাভবাবু এসেছেন। বসবার ঘরেই উনি বসেছেন।"

"অসুখ নিয়েই এল না কি ? ঠাণ্ডা লাগে নি তো রে ? যা না নিশীথ, আমার এই গরম শালটা দিয়ে ওকে ঢেকে দিয়ে আয়— বেচারার একটা হাত নেই। নিশীথ, চ'লে যাচ্ছিস ? শালটা নিয়ে গেলি নে ? অমিতাভর ঠাণ্ডা লাগবে যে !"

জয়া বসুর অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারলে না নিশীথ। দরজার ও-পাশ থেকে ফিরে এসে শালটা ও নিয়ে গেল। অমিতাভর প্রতি নিশীথ আজও একটু প্রসন্ন হ'ল না। নিশীথ যদি প্রসন্ন না হয়, তা হ'লে জয়া বসুই ব্যথা পান সবচেয়ে বেশী।

গ্রেট কোটের ওপর শালটা জড়িয়ে অমিতাভ ব'সে ছিল। দুদিন অসুখে ভুগে মুখটা বেশ খানিকটা শুকিয়ে গেছে। কিন্তু চোখটা ওর উজ্জ্বল হয়েছে খুব বেশী। পাথরের চোখটাকে আর রুক্ষ কঠিন ব'লে মনে হয় না। কি এক নতুন ভাষা যেন ওর পাথরের চোখ দিয়ে ব্যক্ত হবার জন্যে ছটফট করছে। কুমারী জয়া বসু আজ অসীম আগ্রহ সহকারে চেয়ে রইলেন অমিতাভ সেনের পাথরের চোখের দিকে। পাঁচ দশ মিনিট কেউ কোন কথা কইল না।

পাহাড়ের ফাঁক দিয়ে সূর্য উঠে আসছে ওপর দিকে। ঘরের মধ্যে ক্রমে ক্রমে রোদের উত্তাপ বাড়তে লাগল। ভাল লাগছে জয়া বসুর চুপ ক'রে ব'সে থাকতে।

নিশীথ কফি নিয়ে এল। অমিতাভ সেন যে কফি খেতে ভালবাসে নিশীথ তা জানে। ট্রে থেকে কফির পেয়ালা তুলে নিয়ে জয়া বসু বললেন, "ঠাণ্ডায় একেবারে বরফ হয়ে গেছ, কফিটুকু খেয়ে নাও।"

কথা বলল না অমিতাভ। এক হাতে পেয়ালাটা তুলে নিয়ে কফি খেতে লাগল সে। জয়া বসু নিঃশব্দে চেয়ে রইলেন অমিতাভর দিকে।

কফি খাওয়া শেষ হওয়ার পরে জয়া বসু জিজ্ঞাসা করলেন, "হঠাৎ তুমি কার্শিয়ংয়ে এলে কেন? ছবি আঁকাও ছেড়ে দিয়েছ, তোমার অন্ন জুটবে কি ক'রে?"

"তোমার সঙ্গে দেখা করতেই আমি এখানে এসেছি। আর হয়তো দেখা হবে না, কাল আমি ফিরে যাচ্ছি কলকাতায়।"

"তার পর?"

"সাত তারিখে আমি বোম্বে রওনা হব। জাহাজ ছাড়বে বারো তারিখে।"

"জাহাজ? কোথায় যাচ্ছ তুমি?"

"ফরাসী দেশে।"

"টিকিট কাটা হয়ে গেছে?"

"হ্যাঁ। চন্দননগরের পৈতৃক বাড়িটা আর নেই। বাড়িটা বেচে দেবার পরে মনে হচ্ছে, ভারতবর্ষের সঙ্গে আমার আর যোগাযোগ রইল না। যেটুকু বন্ধন আমার ছিল তা তো তুমি নিজেই কেটে ফেলে দিয়ে চ'লে এলে কার্শিয়ংয়ে। ভারতবর্ষের মাটি থেকে আলগা হতে না পারলে আমি আর ছবি আঁকতেও পারব না, জয়া। অন্নসংস্থানের কথা ভাবি নে, একটা মানুষ—কোন দিক থেকে ব্যবস্থা একটা হয়েই যাবে।"

"ভারতবর্ষের মাটির ওপর তোমার কোন আকর্ষণ নেই। শিল্পীর মুখ থেকে এমন কথা শুনব ব'লে আশা করি নি।"

অমিতাভ তার ওই পাথরের চোখটাকে জয়া বসুর মুখের দিকে

ঘুরিয়ে বলল, "জয়া, আমায় তুমি ক্ষমা কর, আমায় তুমি বিদায় দাও।" —এই ব'লে অমিতাভ সেন উঠে পড়ল। শালটা এক হাত দিয়ে ভাঁজ করতে করতে সে পুনরায় বলল, "আমার এই বিকৃত দেহটাকে ঢাকবার জন্যে এত ভাল একটা শালের কোন প্রয়োজন ছিল না। তোমায় ধন্যবাদ, এই কয়েক মুহূর্তের উত্তাপ আমি সারা জীবন ধ'রে রাখবার চেষ্টা করব।"

মিস জয়া বসুর দেহের উত্তাপ ক্রমে ক্রমে কমতে লাগল। এমন একটা পরিস্থিতির যে সৃষ্টি হতে পারে, আগে তা তিনি ভাবতে পারেন নি। অমিতাভর মধ্যে তিনি নবজীবনের স্পন্দন অনুভব করেছিলেন। ভাঙাচোরা জীবনটাকে আবার তিনি নূতন ভাবে সাজাবার স্বপ্ন দেখছিলেন। এখন তিনি বুঝতে পারলেন, শুরুতেই অমিতাভ সব শেষ ক'রে দিয়ে যাচ্ছে। এক রকম মরিয়া হয়েই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "আমার একটা কথা রাখবে ?"

"বল, শুনি।"—অমিতাভ ফিরে এল জয়া বসুর কাছে।

"তুমি যেয়ো না। ভারতবর্ষের মাটিকে তুমি ভালবাসবার চেষ্টা কর। জীবনে যা তুমি পাও নি, মাটিতে তা তুমি পাবে। তোমার শিল্পের শেকড় তো মাটিতেই, আর—"

"আর কি ?"—জিজ্ঞাসা করল অমিতাভ।

জয়া বসু ভাবতে লাগলেন। এমন সময় বাইরে থেকে নিশীথ বলল, "দিদিমণি, ডাক্তার সাহেব এসেছেন।"

একটু চমকে উঠে জয়া বসু বললেন, "এখানেই আসতে বল্। অমিতাভ, শালটা গায়ে দিয়ে ব'স। তোমার ঠাণ্ডা লাগবে যে।" —জয়া বসু নিজেই উঠে গিয়ে অমিতাভর গায়ে শালটা জড়িয়ে দিতে লাগলেন।

॥ নবম রাত্রি ॥

"দিনগুলো দীর্ঘ মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে চব্বিশ ঘণ্টার পরেও আরও অনেকগুলো ঘণ্টা প্রতিটি দিনকে দীর্ঘতর ক'রে তুলছে। কুড়ি বছর বয়সেই হাঁপিয়ে পড়ছি পথ এগুতে। কি হবে পথ এগিয়ে? দেখবার আর আছে কি? অনুভূতি-রাজ্যে যেন জীবন ও জগতের সংখ্যাহীন অভিজ্ঞতার ভিড় জমেছে! কোন অভিজ্ঞতার মধ্যেই আনন্দ-লোকের অস্তিত্ব নেই। খাওয়া-পরা ঘুমনোর জগতে যদি মানুষ তার আনন্দ-লোকের সন্ধান না পেয়ে থাকে, তা হ'লে অদ্বয়ের অনুসন্ধানে তার আগ্রহ তো বাড়বেই।

মামীমার কেবল আগ্রহই বাড়ে নি, তিনি এমন এক জগতে বাস করছেন যেখানে পৌঁছতে হ'লে সাধনা করতে হয়। সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েও তিনি সংসারে আছেন। আগের চেয়ে স্বাস্থ্য তাঁর অনেক ভাল হয়েছে। কোন সমস্যাকে তিনি আর এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন না। সমস্যাকে কেবল সমস্যার স্তরেই সমাধান করবার চেষ্টা করেন তিনি। নন্তুদার জেল হ'ল ব'লে একদিন মামীমা সংসারটাকে অন্ধকার দেখেছিলেন। আজও নন্তুদা জেল খাটছে, কিন্তু তাঁর দৃষ্টিতে আর অন্ধকার নেই। আমার কাছে তিনি অন্তত তাই বলেন। তিনি আরও বলেন যে, দুঃখ-কষ্টের ভয় থেকে তাঁর মনের মুক্তি ঘটেছে চিরদিনের জন্যে। এ মুক্তির পথ তিনি কেমন ক'রে কোথায় খুঁজে পেলেন তার হদিস আমি পাই নি। দোতলার লাইব্রেরি-ঘরে মামা যা সারাজীবন চেষ্টা ক'রেও খুঁজে পেলেন না, মামীমা কি তা মাত্র কয়েক বছরের চেষ্টায় একতলার ঠাকুর-ঘরে ব'সেই পেয়ে গেলেন? এ পাওয়ার মূলে সত্যিই কি কোন সত্য আছে?

রত্না, এ চিঠি তোকে লিখছি আমি প্রায় দশ বছর পরে। আজ তোর কেবল বয়স বাড়ে নি, তোর অহংকারও পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

কেবল দৈহিক সৌন্দর্যকে কেন্দ্র ক'রে যে-আর্ট তোর নৃত্যকলায় সর্বপ্রধান আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল তার মৃত্যু ঘটেছে তোর মুখের পোড়া চামড়ার অন্তরালে। কোন আর্টই কেবল শৈলী আর আঙ্গিকের জোড়া পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না।

বি. এ. পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে, তখনো ফল বেরয় নি। নিজের ঘরেই শুয়ে ছিলুম। কলেজে যেতে হয় না ব'লে বাড়ি থেকে বেরুই নি কদিন। সকালের দিকেই মামীমা এলেন আমার ঘরে, জিজ্ঞাসা করলেন, 'নিজেকে নিয়ে এ কি রকমের পরীক্ষা করছিস, জয়া ?'

'এ কথা কেন বলছ, মামীমা ?'

'আমি একা বলব কেন, সবাই বলছে। খাওয়াদাওয়া ছেড়ে দিয়েছিস। তার ওপরে মাসের মধ্যে তো পনেরো দিন উপোস করছিস। আয়নাতে গিয়ে নিজের চেহারাটা একবার দেখে আয়—না, না, এসব চলবে না। ধর্মের দিকে যদি মন গিয়ে থাকে, তা হ'লে উপোসের তো একটা মাত্রা থাকবে ?'—মামীমা এসে ব'সে পড়লেন আমার চৌকির ওপর। আমি শুয়ে ছিলুম। তিনি আমার গলার নীচে হাত বুলতে বুলতে হঠাৎ যেন চমকে গিয়ে ব'লে উঠলেন, 'ছি ছি, এখানে যে কিছুই নেই !'

'এখানে মানে ?'—আমার প্রশ্নের মধ্যেও চমকে ওঠার সুর ছিল। মামীমা তাঁর হাতের আঙুল পাঁচটা আমার গায়ের ওপর টিপে টিপে বলতে লাগলেন, 'কই, মাংস কই ? এগুলো কি ? হাড়। এটা কি ? না না বাপু, মেয়েমানুষকে আগে মেয়েমানুষ হতে হবে, তারপর উপোস কর আপত্তি নেই।'

আমি চুপ ক'রে রইলুম। ঘরের নৈঃশব্দ্য ঘন হতে লাগল। সেকেণ্ড গড়িয়ে যেতে লাগল মিনিটের মধ্যে।

তিনি আমার দিকে চেয়ে বলতে লাগলেন, 'সেদিন হঠাৎ আমি

যখন তোর নৈশ-অভিসারের নতুন মানচিত্রটা দেখতে পেলুম তখন আমার কি মনে হ'ল জানিস, জয়া?'

মাথা নেড়ে বললুম, 'না।' এরই মধ্যে ভাষা আমার ভিজে উঠেছে। চোখের কোণায় বোধ হয় দু-এক ফোঁটা জলও এসে থমকে দাঁড়িয়ে গেছে। মামীমার কাছে নিজেকে ধরা না দেওয়ার প্রাণপণ চেষ্টা করছি। বাজার থেকে আট-দশ আনায় কেনা একটা মাটির পুতুলকে যিনি ভগবান মনে করেন, তাঁর কাছে চোখের জল ফেলবার মত বিড়ম্বনা আর কিছুতেই হতে পারে না। কিন্তু মামীমা আমার নৈশ-অভিসারের মানচিত্রটা ক্রমে ক্রমে এমনভাবে খুলতে লাগলেন যার মধ্যে পৌত্তলিকতার চিহ্ন পর্যন্ত রইল না। তাঁর মনের রাজ্যে যেন ক্রম-বিবর্তনের সুস্পষ্ট প্রগতি প্রজাপতির মত পাখা মেলে উড়তে লাগল সেই শেষ লক্ষ্যের দিকে।

মামীমা বলতে লাগলেন, 'ভগবান তোর দিকে মুখ তুলে চেয়েছেন, তিনি তোকে ডাক দিয়েছেন। মাঝরাতে সেদিন দরজা খুলে তুই যখন বেরিয়ে গেলি, আমি দেখলুম, তোর প্রতি পদক্ষেপে কেবল প্রিয়তমের কাছে পৌঁছবার ব্যাকুলতা নেই, বিহ্বলতাও রয়েছে। তোর গোটা অস্তিত্বটাই যেন গতির মুখে একটা ছোট্ট বিন্দুর মত আলগা হয়ে ছুটে চলেছে তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়বার জন্যে। তিনি তোকে পথ দেখিয়েছেন। তাঁর ব্যাকুলতার অংশই তো তুই। পরের দিন সকালবেলা দেখি যে, আমার ঠাকুরঘরের সামনে কতগুলো কদমফুলের পাপড়ি। কাঁদছিস, জয়া?'

'না মামীমা, তোমার মন দিয়ে আমায় বিচার ক'রো না। ফুলের পাপড়িগুলো হয়তো আমিই তোমার ঠাকুরঘর থেকে নিয়ে এসে ছড়িয়ে দিয়েছি সারা বারান্দায়। কিংবা আসলে সেগুলো ফুলের পাপড়িই নয়, কাগজের টুকরো। তোমার মনে কদমগাছের ছবি আঁকা রয়েছে ব'লে তুমি কাগজের টুকরোকে পাপড়ি মনে করতে পার। তোমার

ঠাকুরঘরে মাঝরাতে লুকিয়ে লুকিয়ে দু-একদিন গেছি ব'লে তুমি কত কথাই না বানিয়ে বানিয়ে বললে !'

'দু-একদিন ? অনেকদিন থেকেই তো দেখছি, আমার ঠাকুর তাঁর শয্যা থেকে উঠে এসে দাঁড়িয়ে আছেন মঞ্চের ওপর। রাত্রিতে পুজোর পরে আমি তাঁকে প্রত্যেক দিনই তো শুইয়ে রেখে আসি। কে তাঁকে ঘুম থেকে প্রতিদিন মাঝরাতে তুলে দেয়, জয়া ?'

'আমি—আমিই তুলে দি। তোমার ঠাকুর সব সময়েই ঘুমিয়ে থাকেন ব'লে আমার সন্দেহ হয়। আমার অভাবের কথা আমি তাঁকে জানাতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আট আনার পুতুল তোমার—'

মামীমা হাসতে লাগলেন ব'লে কথাটা আর শেষ করতে পারলুম না। একটু বাদেই মামীমা বললেন, 'মানুষের জীবনে ঠিক কখন যে সঙ্কট এসে উপস্থিত হয় বলা মুশকিল। তোর মত মেয়েকে এই বয়সে কাঁদতে হবে আমি তা ভাবতেও পারি নি। জয়া, সেদিন মাঝরাতে আমার ঠাকুরঘরে তোকে কাঁদতে দেখে আমার কি মনে হয়েছিল জানিস ?'

'কেঁদেছিলাম ব'লে তো মনে পড়ে না।'—আমার প্রতিবাদের ভাষা কঠিন হয়ে উঠতে লাগল। আমি পুনরায় বললুম, 'সত্যি যদি আমি কেঁদে থাকি, তা হ'লে কেঁদেছি নিজের জন্যে নিশ্চয়ই নয়—'

'তবে ?'—মামীমা এগিয়ে বসলেন আমার দিকে।

আমি বললুম, 'সারা জীবন আমি যাঁদের আশেপাশে বড় হয়ে উঠলুম, তাঁদের জন্যেই হয়তো আমি কেঁদেছি। এঁদের জীবনের আধ্যাত্মিক শূন্যতা আমায় গ্রাস ক'রে ফেলেছে। এ কান্নার মূল তুমি মনোবিজ্ঞানের কোথাও পাবে না। কারণ, এ কান্না আমার নয়, এই গ্রহের। লাঞ্ছিত আত্মার বিমূর্ত-ক্রন্দন।'

মামীমা নেমে গেলেন চৌকি থেকে। ঘরের মধ্যে পায়চারি করবার মত জায়গা ছিল না। তিনি চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন। দাঁড়িয়ে

দাঁড়িয়ে চোখ ঘুরিয়ে ঘরটা দেখতে লাগলেন তিনি। ঘরের কোথাও এতটুকু ফাঁকা জায়গা নেই। ঘরের মধ্যে বই ছাড়া আর কোন কিছুই নেই। মামীমার মুখ দেখে মনে হ'ল, তিনি বইগুলোর প্রতি ক্রমে ক্রমে বিরূপ হয়ে উঠছেন। এ ঘরের হাওয়ায় এত বিষ এল কোথা থেকে? বইগুলোকেই যেন মামীমা বিষ-উৎপাদনের যন্ত্র ব'লে মনে করতে লাগলেন। আমি অপেক্ষা ক'রে ব'সে ছিলুম মামীমার মন্তব্য শোনবার জন্যে।

দরজার দিকে দু'পা এগিয়ে গিয়ে মামীমা জিজ্ঞাসা করলেন, 'ভবতোষকে বসতে দিস কোথায়? বিছানার ওপর নাকি?'

'না মামীমা, এত কাছে আসবার অধিকার আমি ওকে আজও দিই নি।'

'বলিস কি! জন্ম থেকেই তো ভবতোষের সঙ্গে তোর ভাব! আর কতদিন ওকে ওর অধিকার থেকে বঞ্চিত ক'রে রাখবি, জয়া? আমার মনে হয়, তুই ভুল করছিস। ভবতোষ যদি সত্যিই বিলেত যায়, তা হ'লে বিয়ে ক'রেই যাওয়া উচিত।'

'বিলেত রওনা হওয়ার তারিখ ঠিক হয়ে গেছে, কিন্তু বিয়ের ব্যাপারটা এখনো ঠিক হয় নি।'

'তুই কি ওকে আজও কথা দিস নি?'

'কথা দিই নি, কিন্তু দেবার জন্যেই তো কথাটাকে সাজিয়ে গুজিয়ে নিচ্ছি, মামীমা। মেয়েরা তো জীবনে একবারই কথা দিতে পারে। অতএব—'

'অতএব আরও কয়েক হাজার বই না প'ড়ে কথাটিকে তৈরি করতে পারবি না, এই তো?'

আমি হেসে ফেললুম। হাসতে হাসতে বললুম, 'বই পড়া তো আমি আজকাল একরকম ছেড়েই দিয়েছি। সেই জন্যে পরীক্ষাটা আমার ভাল হয় নি, ফল বেরুলেই টের পাবে।'

'আমার ধারণা কিন্তু অন্যরকমের।'

'কি রকমের, মামীমা?'

'আমার বিশ্বাস, তুই ইচ্ছে ক'রেই পরীক্ষাটা খারাপ দিয়েছিস।'

'ইচ্ছা ক'রে কেউ পরীক্ষা খারাপ করে নাকি?'

'কেউ করে না, কিন্তু তুই করেছিস। ভবতোষের ওপরে তুই উঠতে চাস নি। বল্, ঠিক কি না?'

বাইরে থেকে নামীনাথ ডাকলে, 'দিদিমণি, ভবতোষবাবু এসেছেন।'

'এখানেই আসতে বল'—বললেন মামীমা, 'আমি যাচ্ছি। জয়া, বিলেত যাওয়ার আগে ভবতোষের সঙ্গে যদি বিয়ে নাও হয়, কথাটা অন্তত ওকে দিয়ে দিস। এ কথা দেওয়ার মধ্যে সামাজিক বন্ধন কিছু থাকবে না, হয়তো নীতির বন্ধন একটা থাকবে।'

মামীমা চ'লে গেলেন ঘর থেকে। আমি চেয়ারটা টেনে এনে ঘুরিয়ে দিলাম দরজার দিকে। ভবতোষ আজকাল আর ধুতি পরে না। চৌকির ওপর বসতে ওর খুবই অসুবিধে হয়।

ঘরের বাইরে থেকে ভবতোষ জিজ্ঞাসা করল, 'আসতে পারি কি?'

আমি বললুম, 'এস। এত দেরি করলে কেন? বেলা দশটা বেজে গেছে।'

ঘরে ঢুকে ভবতোষ বললে, 'কই, তুমি তো এখনো তৈরি হয়ে নাও নি?'

'সে কি, তৈরি হয়ে থাকার কথা ছিল না কি? আমি তো কিছুই জানি না।'

'পরীক্ষার ফল বেরুবে আজ।'—এই ব'লে ভবতোষ ব'সে পড়্ল।

আমি বললুম, 'ফলের প্রতি আমার আর তেমন লোভ নেই। যা হয় একটা হবেই।'

'তোমার মত ব্রিলিয়্যাণ্ট ছাত্রীর মুখে এমন কথা শোনা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু আমার তো ভয়ে কাল রাত্রিতে ঘুম আসে নি, জয়া।

ফার্স্ট ক্লাস না পেলে বিলেত গিয়ে আমার অসুবিধেই হবে খুব। তা ছাড়া তোমার কাছে হেরে যাওয়ার লজ্জাও তো কম নয়।'

'কিন্তু আমি তো ব্রিলিয়ান্ট নই। পরীক্ষা আমার খুবই খারাপ হয়েছে। তোমার কাছে আমি হেরে যাব সে সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহই নেই। তোমার কাছে হেরে যাওয়াটাই হয়তো স্বাভাবিক হবে। একটু ব'স, আমি এখুনি আসছি।—' এই ব'লে আমি বেরিয়ে এলুম ঘর থেকে। ভবতোষের জন্যে আমি একটা লম্বা-হাতের পুল-ওভার বুনে রেখেছিলুম। বিলেতে গিয়ে ওর গরম কাপড়ের দরকার হবে। রান্নাঘরে এসে দেখলুম, নামীনাথ লুচি ভাজছে। ওকে জিজ্ঞাসা করলুম, 'হ্যাঁরে, পুলওভারটা ইস্ত্রি ক'রে এনেছিস ?'

'হ্যাঁ দিদিমণি, ওই তো কাগজের প্যাকেটে রয়েছে। ইস্ত্রি করতে ধোপাটা বারো আনা নিয়েছে। বেশী নিয়েছে ব'লে প্রায় আধ ঘণ্টা তর্ক করলুম, কিন্তু বারো আনার এক পয়সাও কম নিলে না।'—বললে নামীনাথ।

'তা হোক, ভাল ক'রে ইস্ত্রি করলেই হ'ল। তোকে আমি বারো আনা পয়সা দিয়ে দেব।'

প্যাকেটটা নিয়ে আমি চ'লে আসছিলাম, এমন সময় নামীনাথ লুচি ভাজা বন্ধ ক'রে আমার দিকে ঘুরে বলতে লাগল, 'ব্যাপারটা কি জান দিদিমণি, আজকাল পৃথিবীর হাওয়া গেছে বদলে। পয়সা ছাড়া দুনিয়ায় আর কিছু নেই। পয়সা থাকলে তুমি ভাল, না থাকলে তুমি খারাপ।'

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'এ কথা তোকে কে শেখালে ?'

'শিখতে হয় নি, চব্বিশ ঘণ্টাই তো দেখছি চারদিকে। পয়সা ছাড়া বাবা বিশ্বনাথের কাছেও যাওয়া যায় না। টিকিট কাটতে পয়সা লাগে। দুনিয়ার যা হাল হয়েছে !'

'তুই এসব কথা বিশ্বাস করিস নাকি ?'

'না করলে বাকি জীবনটা আর হাঁড়ি ঠেলব কি ক'রে, দিদিমণি?'

'তুই মরেছিস, নামীনাথ। বুড়ো বয়সে কলকাতার ব্যাধি তোকে আক্রমণ করল! শহর থেকে পালিয়ে যা। মুঙ্গের জেলার পাড়াগাঁয়ে এখনো অনেক শান্তি আছে।'

'শহরের ভিড় কমাবার জন্যে তোমরা তো তা বলবেই। যাক গে। মা তো আজ লক্ষ্মীপুজো করছেন। তুমি কি আজও উপোস করবে না কি? কিছু লাভ নেই। খেয়েদেয়ে নেচে বেড়াও, ওতেই সুখ। তোমার জন্যেও লুচি ভাজছি।'

খুবই অবাক হয়ে গেলাম নামীনাথের কথা শুনে। দাঁড়িয়ে গেলাম একটু। জিজ্ঞাসা করলুম, 'আজ এসব কথা বলছিস কেন রে?'

পিঁড়ি থেকে উঠে দাঁড়াল নামীনাথ। ডান দিকের দেওয়ালে একটা তাক ছিল। উনোনের ধোঁয়া লেগে লেগে তাকটা এত নোংরা হয়ে আছে যে, দেখলে মনে হয় তাকটায় আর এক ইঞ্চিও কাঠ নেই, সবটাই জমাট বাঁধা ময়লা। নামীনাথ হাত বাড়াল সেই দিকে। তাকের ওপরে সব মসলার কৌটো সাজানো রয়েছে। তারই একটা কৌটো থেকে নামীনাথ বার করল জোড়া পোস্টকার্ড। আমার দিকে মুখ ক'রে সে বললে, 'তুমি তো বোধ হয় হিন্দী পড়তে পার না?'

'না। তুই বল্ না ওতে কি লেখা আছে? দেশ থেকে এসেছে নিশ্চয়ই?'

'হ্যাঁ, দেশ থেকেই। আমার সেই দশ বছরের ছেলেটা মারা গেছে।'

'কই, মামীমা কিংবা মামা তো কিছু জানেন না!'

নামীনাথ দু-তিন মিনিট চুপ ক'রে রইল। তারপর সে বললে, 'বিনা চিকিৎসায় মারা গেল। শহর থেকে ডাক্তার আনা যায় নি, অনেক টাকা লাগত। মার কাছে একশোটা টাকা আগাম চেয়েছিলুম। গোলামি যখন করছি তখন টাকা একদিন শোধ হয়ে যেত। কিন্তু মা

বললেন যে, বাবু আর চাকরি করেন না, বুড়ো হয়ে গেছেন, অত টাকা দেওয়ার তাঁর ক্ষমতা নেই।'

কি ব'লে সান্ত্বনা দেব নামীনাথকে! টাকা পেলেও হয়তো ছেলে তার বাঁচত না। মুঙ্গের জেলার পাড়াগাঁয়ে টাকা পৌঁছতে পনেরো-কুড়ি দিন লাগে ব'লে শুনেছি। কিছু একটা বলা দরকার ব'লে ভাবছিলুম, এমন সময় নামীনাথ বললে, 'আমাদের গাঁ থেকে প্রায় তিন ক্রোশ দূরে পাদ্রী সাহেবদের একটা হাসপাতাল আছে। কি ক'রে পাদ্রী সাহেব খবর পেয়ে সাইকেলে ছুটে এসেছিলেন ছেলেটাকে দেখতে। আমার ভাইরা তাঁকে ঘরে ঢুকতে দেয় নি।'

'কেন ঢুকতে দেয় নি?'

'আমরা পাঁড়ে ব্রাহ্মণ, খ্রীষ্টানদের ঘরে ঢোকাতে পারি না। অমনি ক'রেই তো ওরা খ্রীষ্টান ক'রে ফেলে।'

'মরে যাওয়ার চেয়ে খ্রীষ্টান হওয়াই তো ভাল ছিল। এখন আর তো করবার কিছুই নেই। নামীনাথ, আজ আর তোকে রান্না করতে হবে না। ভবতোষবাবুকে বিদায় দিয়ে আসছি, আমিই হেঁসেলের ভার নিলুম।'

'এঁটো জিনিস আজ আর কিছু রান্না হবে না। মা তো বললেন, তুমিও উপোস করবে।'

'সে যা হয় হবে, তুই এবার দেশে যা। টাকার বন্দোবস্ত আমি করব।'—এই ব'লে আমি রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলুম। ভবতোষ ব'সে আছে একলা। হয়তো বিরক্তও হচ্ছে। মামীমাকে খবরটা দেওয়া দরকার। মামীমার কাছ থেকেই তো টাকা নিতে হবে। নইলে ওকে টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি রাখব কি ক'রে? রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আসবার সঙ্গে সঙ্গে আজ যেন আমি প্রথম অনুভব করলুম যে, সংসারের হাজার হাজার প্রতিশ্রুতির মধ্যে টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি রাখা সবচেয়ে কঠিন।

নিজের ঘরে এসে দেখলুম, ভবতোষ একটুও বিরক্ত হয় নি। মনে হ'ল, আমি পরীক্ষা খারাপ দিয়েছি ব'লে সে যেন মনে মনে খানিকটা উল্লসিত হয়ে উঠেছে। ওঠবারই কথা। ভবতোষ তার ভবিষ্যতের স্বপ্ন নিয়ে মত্ত হয়ে আছে। ওকে বড় হতে হবে।

পুলওভারটা ভবতোষের হাতে দিয়ে বললুম, 'বিলেতের ঠাণ্ডায় এটা তোমার কাজে লাগবে।'

'বাঃ! সুন্দর হয়েছে। দাও। বিলেতে যত ঠাণ্ডাই পড়ুক, তোমার উলের উত্তাপ কখনও বরফে পরিণত হবে না।'

'এ উত্তাপ কেবল পশমটাই ধ'রে রাখতে পারবে না, ধ'রে রাখবার জন্যে তোমাকেও চেষ্টা করতে হবে।'

'অনেকগুলো বছর তো কাটল, আমার চেষ্টার মধ্যে কোন অভাব দেখেছ কি?'

'দেখি নি, কারণ আমি দেখতে চাই নি।'

এর পর ভবতোষ আর কোন প্রশ্নই করল না। পুলওভারটা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে হঠাৎ এক সময়ে সে জিজ্ঞাসা করল, 'একটা কথার সত্যি জবাব দেবে?'

'জবাব যদি দিই তা হ'লে মিথ্যে আমি বলব না। বল।'

সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করল না ভবতোষ। সময় নিচ্ছে। পুলওভারটাকে পোষা-কুকুরের মত কোলের ওপর ফেলে রেখে ভবতোষ জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কি আজও আমায় পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পার নি?'

'এ কথা কেন জিজ্ঞাসা করছ, ভবতোষ?'

'করছি এই জন্যে যে, আজও তুমি আমার বিয়ের প্রস্তাবে সম্মতি দাও নি।'

'আজকে দিলুম।'

উত্তেজনায় পুলওভারটাকে ভাল ক'রে ধরতে গিয়ে ভবতোষ আমার ডান হাতটা টেনে তুলে নিল নিজের হাতের মধ্যে। বাধা আমি

দিলুম না। আজকের এই মুহূর্তটিকে অনুষ্ঠানের দিন পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখতে হবে। নইলে কি নিয়ে থাকব আমি? জীবনের সবটুকু পবিত্রতা নিঙড়ে নিয়ে আমি ঢেলে দিতে চাইলুম এই মুহূর্তটার ওপর। অতীত বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ যেন এই মুহূর্তটাকে কেন্দ্র ক'রে সামাজিক শুচিতায় আমার সামনে ঐতিহাসিক হয়ে উঠল। দেশ ও জাতির ইতিহাসের সঙ্গে বাঁধা পড়লুম আমি। সামাজিক দায়িত্ব গ্রহণ করবার জন্যে এবার নিজেকে তৈরি করা ছাড়া আমার হাতে আর কোন কাজই রইল না। ইতিহাসের আলোয় জীবনের একটা অর্থও খুঁজে পাওয়া গেল। হয়তো সত্যিই গেল। সত্যিই গেল কি?

মামীমা এসে উপস্থিত হলেন। পায়ের শব্দে আগেই টের পেয়েছিলুম আমরা যে, তিনি আসছেন। মামীমা বললেন, 'তোমাদের উনি ডাকছেন লাইব্রেরি-ঘরে। ডক্টর সেন এসেছেন।'

আমার চেয়ে ভবতোষই বেশী ব্যস্ত হয়ে উঠল যাওয়ার জন্যে। পরীক্ষার খবর নিয়ে এসেছেন ডক্টর সেন। আমরা দুজনে উঠে এলুম লাইব্রেরি-ঘরে। বড়মামা আরাম-কেদারায় শুয়ে ছিলেন। চেয়ারে ব'সে আজকাল আর তিনি লেখাপড়া করতে পারেন না। ডক্টর সেন দেখলুম উল্টো দিকে মুখ ক'রে ব'সে আছেন। চোখে চশমা নেই। চশমা ছাড়া তিনি তিন হাত দূরের মানুষও দেখতে পান না। টেবিলের ওপর চশমাটা দেখলুম খুলে রেখেছেন ডক্টর সেন। বুঝলুম, তিনি খুব উত্তেজিত হয়েই ছুটে এসেছেন আমাদের বাড়ি।

সামনে এগিয়ে গিয়ে আমি বললুম, 'নমস্কার, সার্।' নমস্কার তিনি গ্রহণ করলেন না। একটু পরে আমি আবার বললুম, 'আমি এসেছি সার্।' এবার ডক্টর সেন হাত বাড়িয়ে চশমাটা খুঁজতে লাগলেন। আমি চশমাটা তাঁর হাতে তুলে দিয়ে বললুম, 'এই যে।'

চশমাটা পরতে তাঁর অনেকক্ষণ সময় লাগল। আমরা চুপ ক'রে ততক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলুম। পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বার ক'রে

তাতে চোখ রেখে তিনি বলতে লাগলেন, 'এমন অসম্ভব ব্যাপার যে ঘটতে পারে তা আমি এখনো বিশ্বাস করতে পারছি না, জয়া। এ কি ক'রে হ'ল ?' ডক্টর সেন চেয়ে রইলেন আমার দিকে। আমি বুঝলুম তিনি ইচ্ছে ক'রেই ভবতোষকে আমল দিচ্ছেন না। আমি এবার জিজ্ঞাসা করলুম, 'কি হয়েছে, সার্ ?'

'তুমি ফার্স্ট ক্লাস পাও নি, পেয়েছে ভবতোষ।'—বললেন ডক্টর সেন। ভবতোষ এবার আমার পেছন থেকে সামনে এসে দাঁড়াল। দেখলুম, হাত দুটো ওর কেমন কেঁপে কেঁপে উঠছে। কি যেন ধরবার জন্যে আঙুলগুলো ওর বড্ড বেশী ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। পুলওভারটা নিশ্চয়ই নয় মনে ক'রে আমি চেয়ে রইলুম ওর হাতের দিকে। একটু বাদেই ভবতোষ ধরল—ডক্টর সেনের হাত থেকে ফস ক'রে কাগজটা টেনে নিয়ে ভবতোষ চোখ বুলিয়ে নিল নম্বরের তালিকাটার ওপর। নিশ্চিন্ত হয়েছে ভবতোষ। সে সত্যিই ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছে। আমি হেরে গেছি ওর কাছে। আমার মনে হ'ল, আমাকে পাওয়ার চেয়ে ফার্স্ট ক্লাস পাওয়াটা বেশী মূল্যবান মনে করে ভবতোষ ঘোষ।

পাখার গতিটা বাড়িয়ে দিয়ে এলুম আমি। বড্ড বেশী ঘেমে গেছে ভবতোষ। ডক্টর সেনের দিকে চেয়ে বললুম, 'ফার্স্ট ক্লাস না পেলে ওর খুব অসুবিধেই হ'ত। পরিশ্রম ও যোগ্যতার উচিত মূল্য পেয়েছে ও। তা ছাড়া আমাদের বিয়ের কথা যখন পাকা হয়ে গেছে, তখন ওর বিদ্যার মান আমার চেয়ে উঁচু হওয়া উচিত। আমি বোধ হয় আর এম. এ. পড়ব না, সার্।'

এবার বড়মামা বললেন, 'এটা তো যুক্তির কথা নয় মা, এটা হচ্ছে গিয়ে হৃদয়াবেগের প্রলাপ। জ্ঞান অর্জনের পথ যেখানে একেবারে খোলা, সেখানে পথটাকে দেখতে না পাওয়ার মত মূর্খতা সংসারে আর কিছুই নেই।'

জবাব দিলুম না। দেওয়ার প্রয়োজন ছিল না। ভবতোষকে নিয়ে

ঘর থেকে বেরিয়ে যাব ভাবছিলাম এমন সময় ডক্টর সেন বললেন, 'তোমার পরীক্ষার খাতা দেখে মনে হ'ল, ইচ্ছে ক'রেই তুমি অনেক ছেলেমানুষি করেছ।'

বড়মামা বললেন, 'লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাচ্ছে। যা এবার, আর তো কোন কাজ রইল না, মামীমার কাছে উপোস করবার কলা-কৌশল সব শিখে নে। ছি ছি, লজ্জায় আমি আর কারো কাছে মুখ দেখাতে পারব না।'

কিন্তু ভবতোষের মুখ আজ গৌরবে উজ্জ্বল। এ উজ্জ্বলতা যেন কোনদিনও হ্রাস না পায় তেমন একটা গভীর আকাঙ্ক্ষা আমার মনের আকাশে ভেসে বেড়াতে লাগল। নারীসুলভ সৌজন্য দিয়ে এ আকাঙ্ক্ষাকে আমি চিরদিন লুকিয়ে রাখব লোকচক্ষুর অন্তরালে।

মামাকে বললুম, 'তুমি কি আজ আমাদের আশীর্বাদ করবে না, মামা?' ভবতোষকে নিয়ে আমি মামার সামনে গিয়ে দাঁড়ালুম। তাঁর পায়ের ধুলো নিলুম আমরা। তিনি আমাদের মাথায় হাত রেখে বললেন, 'ভগবান তোদের মঙ্গল করুন।'

লাইব্রেরি-ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম আমরা। ভাবলুম, এ ভালই হ'ল, নিজেকে নিয়ে পরীক্ষা করবার আর প্রয়োজন নেই। জীবনের অর্থ খুঁজে বার করবার জন্যে বই ঘেঁটে ঘেঁটে হাঁপিয়ে পড়েছিলুম। এবার তার অবসান ঘটল। ভবতোষের বাইরে আমার আর দেখবার কিছু রইল না। ওকে যদি সুখী করতে পারি তা হ'লেই কর্তব্য আমার ফুরলো। পূর্বপুরুষদের বিশ্বাসই আমার বিশ্বাস, তাঁদের ধর্মই আমার ধর্ম। তাঁদের অভাব আজ নিজের অভাব ব'লে স্বীকার ক'রে নিলুম। এঁদেরই একজন যদি আমি হতে পারি, তা হ'লে মামীমার কুসংস্কারকে কুসংস্কার ব'লে সমালোচনা করবার অধিকার আমার কেউ কেড়ে নিতে পারবে না।

আমার ঘরে এসে দেখি, মামীমা আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন।

টেবিল থেকে বইগুলো সরিয়ে দিয়েছেন। ভবতোষের জন্যে লুচি আর বেগুনভাজা নিয়ে এসেছেন মামীমা। আমি মামীমাকে বললুম, 'ভবতোষ ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছে, আমি সেকেণ্ড ক্লাস। আর—'

আমি থেমে গেলুম ব'লে মামীমা এগিয়ে এলেন আমাদের কাছে। ভবতোষ এবার বললে, 'জয়া এবার তার মন স্থির ক'রে ফেলেছে। আমায় কথা দিয়েছে ও।'

মামীমার পায়ের ধুলো নিলুম আমরা। তাঁর মুখে আনন্দের হাসি। ভবতোষ ফার্স্ট ক্লাস না পেলে তাঁর হাসির মধ্যে এতটা আনন্দ থাকত কি না বলা মুশকিল।

ভবতোষ চেয়ারে গিয়ে বসবার আগে আমি প্লেট থেকে লুচি তুলে নিয়ে খেতে লাগলুম। মামীমা অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন আমার দিকে। এরই মধ্যে মুখ থেকে হাসি তাঁর মিলিয়ে গেছে। আমি সব কখানা লুচি অতি অল্প সময়ের মধ্যে খেয়ে শেষ ক'রে ফেললুম। নামীনাথ দরজার পাশে এসে দাঁড়িয়ে ছিল আরও লুচি নিয়ে। ওকে বললুম, 'বাবুর জন্যে একটা নতুন প্লেট নিয়ে আয়। মাগো, কি ক্ষিধেই না পেয়েছিল!'

মামীমা জিজ্ঞাসা করলেন, 'আজ না তোর উপোস করার কথা ছিল, জয়া?'

'লাভ নেই। তোমার ঠাকুর-ঘরের সবটুকুই আমি দেখে নিয়েছি।'

'ওমা, এরই মধ্যে সব দেখে ফেললি? যাক, ভালই হ'ল। ভেবেছিলাম ভবতোষকে আজ এখানে প্রসাদ নিতে বলব। কিন্তু তোর বিশ্বাসের মাটিতে যখন ফাটল ধরেছে তখন ভবতোষই বা দাঁড়ায় কোথায়?'—এই ব'লে মামীমা দরজার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়ালেন। নামীনাথ এসেছে প্লেট নিয়ে। ভবতোষ খেতে বসল। খেতে লাগল নিঃশব্দেই। ভাবলুম, আজকের দিনে মামীমাকে ব্যথা দেওয়া ঠিক হ'ল না। আজ আমরা সবার কাছ থেকেই শুভেচ্ছা চাই।

দেখলুম, মামীমা ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল ঠিক বুঝতে পারলুম না। ভবতোষ নিজে কিছু বুঝেছে কি না জানি না। আজ কদিন থেকে সে ব্যস্ত আছে বিলেত রওনা হওয়ার বন্দোবস্ত করতে। টুকিটাকি জিনিস আমিও ওকে কিনে দিয়েছি। এর মধ্যে একদিন সে কেষ্টনগর থেকে ঘুরে এসেছে। ফাদার দুবোয়ার সঙ্গে দেখা করার দরকার ছিল। পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেছে ব'লে ভবতোষকে তিনি সুখ্যাতিও করেছেন খুব। ফাদার দুবোয়াদের সঙ্গে ভবতোষের কি সম্পর্ক, আমি তার খবর কিছু রাখি না। ভবতোষ নিজে কিছু বলে না ব'লে আমি খবর জানবার চেষ্টাও করি নি। অর্থের ব্যাপারে ভবতোষ যে ফাদার দুবোয়ার ওপর নির্ভরশীল তা আমি ওর মুখ থেকে শুনেছি।

রওনা হওয়ার দিন দুপুরবেলার দিকেই ভবতোষ আমাদের বাড়ি এল। বোম্বে থেকে জাহাজে চেপে যাবে। হাওড়া স্টেশন পর্যন্ত ওর সঙ্গে যাব ব'লে আমি তৈরি হয়েই ছিলুম। আমরা এসে আজ লাইব্রেরি-ঘরে বসলুম। মামা ছিলেন না। তিনি কি একটা বিশেষ জরুরী দরকারে জগদীশবাবুর সঙ্গে দেখা করতে গেছেন তাঁর অফিসে।

ভবতোষ এসেছে খবর পাওয়ার পরে মামীমাও এসে যোগ দিলেন আমাদের সঙ্গে। আমি তো গোড়া থেকেই চুপ ক'রে ব'সে ছিলুম। আজকে তো কথা বলবার দিন নয়। কথা শোনবার দিন। ভবতোষ কথা বলে কম। তাই ওর প্রত্যেকটি কথা আমার মনোযোগ দিয়ে শুনতে হয়।

মামীমা বললেন ভবতোষকে, 'তোমার মধ্যেই এখন জয়ার সবটুকু ভবিষ্যৎ সীমাবদ্ধ হয়ে রইল। জয়া কি এবং কেমন তা বোধ হয় আমার চেয়ে বেশী তুমিই বুঝতে পারবে। যে শুভবুদ্ধি নিয়ে আজ তুমি রওনা হয়ে যাচ্ছ, বিলেত থেকে ফেরবার মুখেও যেন তাতে বিন্দুমাত্র খাদ

না মেশে। তোমাদের মিলনের দিনটি পর্যন্ত যদি বেঁচে থাকি তা হ'লে আমার চেয়ে বেশী সুখী বোধ হয় আর কেউ হবে না।'

এমনি ক'রে মামীমা একই কথা নানা রকম ভাবে ভবতোষকে বলতে লাগলেন। আমি জানি, মামীমা সত্যিই মনে মনে আমাদের ভালবাসেন। মন দিয়ে যাকে একবার তিনি গ্রহণ করেন তাকে আর মাথা দিয়ে বুঝে দেখবার চেষ্টা করেন না। কিন্তু মামার বিচার আসে মাথা থেকে। তাই তিনি আজও ভবতোষকে কাছে টেনে নিতে পারেন নি। ভবতোষ যে ফার্স্ট হয়েছে তেমন সত্যও যেন বড়মামা নিজের মনে স্বীকার ক'রে নেন নি।

লাইব্রেরি-ঘরেই নামীনাথ ভবতোষের জলখাবার নিয়ে এল। আমি দেখলুম, নামীনাথ আজ একটা পরিষ্কার ধুতি পরেছে। গলার পৈতেটাকে সযত্নে সাবান দিয়ে ধুয়ে সাদা করবার চেষ্টা করেছে সে। মাথার ওপরে খাড়া হয়ে আছে হিন্দু-নামীনাথের পরিচয়-পতাকা। টিকির সঙ্গে বাঁধা রয়েছে জুঁইফুলের পাপড়ি।

মামীমা একটু হেসে বললেন, 'প্রায় তিন বছর পরে নামীনাথ এবার দেশে চলল। কলকাতার পাপ সব আজ সে কালীঘাটে গিয়ে ধুয়ে এসেছে। পুজো দিয়ে এসেছে খুব ঘটা ক'রে।'

মামীমার কথা শুনে নামীনাথ মুখ টিপে একটু হাসল। আমি বুঝলুম, নামীনাথ পুজো দিয়েছে তার পাপক্ষালনের জন্যে নয়। ভবতোষের মঙ্গলের জন্যে। মামার বাড়ির সুখ-দুঃখের অংশ নিয়েছে নামীনাথ, কিন্তু ওর সুখ-দুঃখের অংশ নেয় নি কেউ। মামীমা আজও জানেন না যে, নামীনাথের ছেলেটা মারা গেছে বিনা চিকিৎসায়।

খাওয়া শেষ হওয়ার পরে মামীমা বললেন, 'তোমরা ব'সে এবার গল্প কর, আমি যাই। উনি বোধ হয় এক্ষুনি এসে পড়বেন।'

ঘড়ির দিকে চেয়ে ভবতোষ বললে, 'হ্যাঁ, আমারও এবার যাওয়ার সময় হ'ল। নামীনাথ, আমায় একটা ট্যাক্সি ডেকে দিয়ো।'

মামীমা চ'লে গেলেন নীচে। নামীনাথও গেল। ভবতোষ উঠে এসে দাঁড়াল আমার সামনে। হাত দুটো বাড়িয়ে দিল আমার দিকে। হঠাৎ যেন আমার মনে হ'ল, আমি বোধ হয় এই মুহূর্তটির জন্যেই অপেক্ষা ক'রে ব'সে ছিলুম! চোখ থেকে চশমাটা খুলে রেখে দিলুম টেবিলের ওপর। ওই চশমা দিয়ে আমি 'দর্শন' পড়ি, কিন্তু ভবতোষকে দেখবার জন্যে এখন আর চশমাটার দরকার ছিল না। আমি এগিয়ে গেলুম ভবতোষের দিকে, এমন সময় বড়মামা এসে উপস্থিত হলেন লাইব্রেরি-ঘরে।

ভবতোষ বললে, 'আমি এবার চললুম। জয়া আমার সঙ্গে স্টেশন পর্যন্ত যাচ্ছে।'

ভবতোষকে কোন কথা না ব'লে বড়মামা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'একা একা ফিরবি কি ক'রে?'

'বাসে চেপেই চ'লে আসব। স্টেশনে যাওয়ার মত ওর তো আর কেউ নেই।'

লাইব্রেরি-ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে রইলেন বড়মামা। তিনি আমাদের নীচে নেমে যেতে দেখলেন। একেবারে শেষ সিঁড়িতে নেমে আমি ওকে বললুম, 'চল, একবার ঠাকুর-ঘরটা দেখে আসবে। যাওয়ার আগে অন্তত তাঁকে একবার দেখে যাও। মামীমা খুশী হবেন।'

'তুমি? তুমি খুশী হবে না?' ভবতোষের প্রশ্নটা যেন শুনতে পাই নি, এমন ভাব দেখিয়ে নামীনাথকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ট্যাক্সি কি এসে গেছে?'

'হ্যাঁ, মালপত্র সব তুলে দিয়েছি।'

'না না, তুমি সব মাল বইলে কেন?' ভবতোষ যেন একটু অস্বাভাবিক ভাবে ব্যস্ত হয়ে উঠল। হাসতে হাসতে নামীনাথ জবাব দিল, 'যাকে ভালবাসা যায় তার জন্যে মাল বইলে কোন পাপ হয় না। পৈতেটা কেবল পুজোর জন্যেই দরকার হয় না, বাবু। সেবা করতেও পৈতে লাগে।'

মামীমা এসে পেছনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। বাইরের দরজা দিয়ে আমাদের বেরিয়ে যেতে দেখলেন তিনি। ট্যাক্সিতে ওঠবার আগে ভবতোষ পকেট থেকে তিনখানা দশ টাকার নোট বার ক'রে নামীনাথের দিকে এগিয়ে ধরল। নামীনাথ সঙ্কোচ বোধ করছিল হাত বাড়াতে। ভবতোষ তাই বলল, 'জাহাজে উঠলে এ টাকা আমার আর কোন কাজে লাগবে না। আমি সব হিসেব ক'রেই ঘর থেকে বেরিয়েছি। তোমার কথা আমার চিরদিন মনে থাকবে, নামীনাথ।'

ট্যাক্সিতে উঠে কোন কথাই বলতে পারলুম না আমি। রেড রোড যখন পার হয়ে যাচ্ছি তখন আমি ওকে জিজ্ঞাসা করলুম, 'তোমার কি ঠাকুর-দেবতার ওপর বিশ্বাস আছে?'

ভবতোষ জবাব দিতে বেশী দেরি করল না। সে বললে, 'বিশ্বাস বলতে তোমরা কি বোঝ আমি তা জানি না। আমার কাছে বিশ্বাসের একটা নির্দিষ্ট অর্থ আছে। সেটা বিশেষ একটা অনুভূতি কিংবা ভেতরের একটা চিন্তা মাত্র নয়। বিশ্বাস হচ্ছে: ভগবান-স্বীকৃতির সংগ্রাম। তুমি মানো কিনা জানি না যে, বিশ্বাস এবং জীবন দুটো আলাদা অস্তিত্ব নয়, দুটোই এক।'

স্ট্রাণ্ড রোড কখন যে পার হয়ে গেছি টের পাই নি। ভবতোষ যে কেবল বই মুখস্থ ক'রে পরীক্ষায় প্রথম হয় নি তা যেন আমি আজ জানতে পারলুম রেড রোড আর স্ট্রাণ্ড রোডের মাঝামাঝি কোন একটা জায়গায় এসে।

হাওড়া স্টেশনে পৌঁছতে আমাদের একটু দেরিই হয়ে গেল। বাড়ি থেকে আরও আগে রওনা হওয়া উচিত ছিল। ভবতোষের ঘড়িটা বোধ হয় ঠিক নেই। প্ল্যাটফর্মে খুবই ভিড় হয়েছে। বিলেত যাওয়ার প্যাসেঞ্জারও গাড়িতে কম হয় নি। ভবতোষের পাশের কামরার সামনে দাঁড়িয়ে দেখলুম, একটি মেয়ে বেশ জোরে জোরে কাঁদছে। সিঁথির ওপরে প্রচুর সিঁদুর লাগানো রয়েছে। বোধ হয় চার-পাঁচ দিন আগে

এর বিয়ে হয়েছে। ইচ্ছে হ'ল, আমিও ওর মত ক'রে কাঁদি। সত্যিই যদি কাঁদতে পারতুম!

ভবতোষের কামরায় আর কোন প্যাসেঞ্জার ছিল না। জিনিসপত্র সব গুছিয়ে রেখে ভবতোষ বিছানাটা পেতে ফেলল। জলের ফ্লাস্কটা টাঙিয়ে রাখল ব্রাকেটের গায়ে। রেখে সে বলল, 'এবার? এবার তো তোমায় নামতে হবে, জয়া—'

টিকিট-চেকার দরজা দিয়ে উঠে এল ওপরে। মুহূর্তগুলো গ'লে যেতে লাগল লোকচক্ষুর সামনে। আড়াল আমরা পেলুম না। ভবতোষকে বললুম, 'বোম্বে পৌঁছে চিঠি দিও। এবার থেকে তোমার ভালমন্দ কেবল তোমার একলারই ভালমন্দ নয়, আমারও।'

গাড়ি ছাড়বার শেষ ঘণ্টা বাজল। গরম ব'লেই বোধ হয় ভবতোষ গা থেকে শার্টটা খুলতে যাচ্ছিল। গলা পর্যন্ত টেনে তুলতে গিয়ে হঠাৎ সে থেমে গেল। ভবতোষের মুখ দেখতে পেলুম না, বুক দেখতে পেলুম। মুহূর্তের মধ্যে আমার দেহের সবটুকু রক্ত যেন বরফ হয়ে গেল। বোম্বে মেলের এই কামরাটায় বিন্দুমাত্র আর আলো রইল না। আমি কে, আমি কোথায়—কিছুই যেন বুঝতে পারছি না। গাড়িটা ছুটছে, না, দাঁড়িয়ে আছে? ভবতোষই এগিয়ে এল আমার কাছে। সে আমার হাত দুটো নিয়ে তার বুকের ওপর চেপে ধরল। ভবতোষের ভগবান-স্বীকৃতিকে বোধ হয় আমাকে দিয়েও স্বীকার করিয়ে নেবার চেষ্টা করছে সে। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'গলায় তোমার ক্রুশ কেন?'

গাড়িতে টান পড়ল। প্ল্যাটফর্মের চার দিক থেকে ভেসে উঠল কান্নার স্বর। এ কান্নার অংশমাত্রও গাড়ির সঙ্গে যাবে না। সবটুকুই প'ড়ে থাকবে হাওড়া স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে। ভবতোষ আমায় একরকম আলগা ক'রে তুলে নামিয়ে নিয়ে এল গাড়ি থেকে। হাতটা সরিয়ে নিয়ে দু-একবার পরীক্ষা ক'রে দেখল যে, আমি অবলম্বন ছাড়া কেবল

দুটো পায়ের ওপরেই দাঁড়িয়ে থাকতে পারব কি না! তারপর চলন্ত গাড়িতে লাফিয়ে উঠে পড়ল ভবতোষ। দরজায় দাঁড়িয়ে সে ঘোষণা ক'রে গেল, 'আমি রোমান ক্যাথলিক।'

ভবতোষের কথাটা কানে এল, ভবতোষকে দেখতে পেলুম না। চেষ্টা করলেও এ চোখ দিয়ে ভবতোষকে দেখতে পেতুমও না। দৃষ্টি আমার ঝাপসা হয়ে গেছে! গাড়িটা প্ল্যাটফর্মের বাইরে চলে গেল। যে-রুমাল উড়িয়ে ওকে বিদায় দেব ভেবেছিলাম, সেটা আপাতত আমার চোখের জল মোছবার কাজে লাগছে। আমার আবার মনে হ'ল, ভবতোষকে আমি পুরোপুরি পাই নি। রোমান ক্যাথলিক ব'লে নয়, ধর্মের মহিমা ও বুঝতে পারে নি ব'লে।

একটু বাদেই বুঝতে পারলুম, প্ল্যাটফর্মে ভিড় আর নেই। ও-পাশের বেঞ্চিটাতে ব'সে পড়েছিলাম একটু আগেই। আমি জানতুম, আমার দিকে কেউ দৃষ্টি দেবে না, বিব্রত বোধ করবে না কেউ। বিব্রত বোধ করবার মত আমার চেহারা সুন্দর নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি অসুস্থ বোধ করছি। মাথাটা ধ'রে উঠল খুব।

পাশে এসে দাঁড়ালেন বীরেশবাবু। জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি এখানে? এত রোগা হয়ে গেলেন কি ক'রে? অসুখ করেছিল না কি?'

বললুম, 'না। আমি এসেছিলুম ভবতোষকে তুলে দিতে। সে এই গাড়িতেই গেল—বিলেত যাচ্ছে। ভবতোষের কথা আপনার মনে আছে কি?'

'না, মনে নেই। দেখলে হয়তো চিনতে পারতুম।'

ভাবলুম বলি, আমি তো ওকে এতগুলো বছর দেখেও চিনতে পারলুম না। আমি চুপ ক'রে রইলুম ব'লে বীরেশবাবুই আবার বলতে লাগলেন, 'আমিও এসেছিলাম আমার এক মক্কেলের ছেলেকে তুলে দেবার জন্যে। সেও বিলেত যাচ্ছে। চলুন, আমার গাড়িতেই আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।'

উঠে দাঁড়াবার উৎসাহ ছিল খুব, কিন্তু উঠতে পারছিলুম না। পা দুটো কাঁপছিল। আমি তাই তাঁকে বললুম, 'মাথাটা আমার খুব ধরেছে, তেষ্টাও পেয়েছে খুব। বোধ হয় অসুস্থ হয়েই পড়লুম।'

হাসতে হাসতে বীরেশবাবু বললেন, 'ভবতোষবাবু বিলেত থেকে না ফিরে এলে আপনার মাথা ধরা আর সারবে না। চলুন, গাড়ীতে আমার ফ্লাস্কে জল আছে।'

উঠলুম আমি। বীরেশবাবুর সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে চললুম ফটকের দিকে। মাঝে মাঝে বীরেশবাবুর দিকে চেয়ে দেখছিলুম। এই কটা বছরের মধ্যে তাঁর অনেক পরিবর্তন হয়েছে। সেই ছেলেমানুষী হাব-ভাব আর নেই। খুব সাংসারিক এবং চতুর ব'লে মনে হচ্ছে তাঁকে। তিনি এক সময়ে বললেন, 'আমি আর বাবার সঙ্গে থাকি না। চৌরঙ্গী কোর্টে ফ্ল্যাট নিয়েছি। একলাই থাকি সেখানে।'

কিছু একটা বলা উচিত ব'লেই বোধ হয় বললুম, 'আজকাল তা হ'লে পসার আপনার খুব বেড়েছে! নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে গেছেন বলুন।'

'পসার খুব বাড়ে নি, তবে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর ব্যাপারটা বোধ হয় সত্যি। গুটি কয়েক কলকাতার বড়লোক বনেদী মক্কেল আছে আমার। তাঁদের কাজকর্ম ক'রে সারা বছর চ'লে যায়। খুব বেশী পরিশ্রম করতে হয় না, প্রচুর অবসর আছে। আসুন, এই দিক দিয়ে। গাড়িটা আমার সামনেই আছে।'

ডান দিকের রাস্তা ধ'রে আমরা পথ চলতে লাগলুম। আসল কথাটা অনেকক্ষণ আগে থেকেই ভাবছিলুম। কি ক'রে ওঁকে জিজ্ঞাসা করব সঠিকভাবে বুঝে উঠতে পারছিলুম না। গাড়ি-বারান্দাটার কাছে পৌঁছবার আগেই আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'সেই মেয়েটির কি হ'ল?'

'কোন্ মেয়েটি?'—বীরেশবাবু থমকে দাঁড়ালেন।

'আমাকে দেখতে এসে যে-মেয়েটির কথা আপনি উল্লেখ করে-ছিলেন—যে-মেয়েটির নাচ দেখবার জন্যে আপনি টিকিট কেটেছিলেন!'

'সে আমায় ভালবাসে না। কোনদিনই ভালবাসত না। পেছনে বসছেন কেন? এখানে আসুন। গাড়ি তো আমিই চালাব।'

বীরেশবাবুর পাশের সীটেই বসলুম। ফ্লাস্ক থেকে জল খেলুম আমি। আর কিছু খেতে চাই কি না তাও তিনি বার-দুই জিজ্ঞাসা করলেন। মাথা নেড়ে অসম্মতি জানালুম আমি।

হাওড়ার কোলাহল পার হয়ে আসতে আমাদের বেশীক্ষণ সময় লাগল না। ক্রমে ক্রমে আমি সুস্থ বোধ করছি। বীরেশবাবুর সাহচর্যও ভাল লাগছে আমার। সুস্থ, শিক্ষিত এবং নির্ভীক মেজাজের মানুষটিকে আজ যেন আবার নতুন ক'রে ভাল লাগল।

চৌরঙ্গীর দিকে গাড়ি ঘুরিয়ে বীরেশবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'সামনেই তো চৌরঙ্গী কোর্ট, দেখে আসবেন নাকি আমার নতুন সংসার?'

'আজ থাক্, অন্য একদিন আসব।'

'কেন, ভয় পাচ্ছেন নাকি? কোন ভয় নেই, আমি আর কোন-দিনও মেয়েদের প্রেমে পড়ব না। কারণ—'

কারণটা উল্লেখ না ক'রে বীরেশবাবু চৌরঙ্গীর রাস্তা দিয়ে দক্ষিণ দিকে চলতে লাগলেন। বড় হোটেলটার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলুম, 'কই, কারণটা তো বললেন না?'

'আজ থাক্। দ্বিতীয় দিন যখন আবার আপনার সঙ্গে দেখা হবে, আর হবে বোধ হয় আমার বাড়িতেই, তখন আপনাকে বলব। কবে আসছেন বলুন? অবিবাহিত যুবকের ঘরে আসতে যদি সত্যিই আপনার ভয় করে তা হ'লে এখুনি আমায় বলুন, আমি দুজন নেপালী পাহারাওয়ালা ভাড়া ক'রে নিয়ে আসব। শিগগির বলুন, সময় নেই—'

'সময় নেই কেন?'—জিজ্ঞাসা করলুম আমি।

'এই তো আমরা হরিশ মুখার্জি রোডে এসে গেছি। এই রইল আমার কার্ড। ওতে ফোন-নম্বর আছে, আমায় ফোন করবেন, এসে নিয়ে যাব।'

'বেশ, নিশ্চয়ই যাব। ফোন না ক'রেই যাব।'—এই ব'লে গাড়ি থেকে নেমে এলুম আমি। চলেই যাচ্ছিলুম। হঠাৎ তিনি গাড়িতে ব'সেই ডাকলেন আমায়, 'শুনুন, মিস বোস—'

গাড়ির কাছে এগিয়ে এলুম আবার। অদ্ভুত ধরনের একটা প্রশ্ন ক'রে বসলেন তিনি, 'আমার নাম জানেন আপনি?'

'জানি, বীরেশবাবু।'

'কোন্ বীরেশবাবু? অ্যাটর্নি বীরেশবাবু, না, কবি বীরেশ রায়?'

অবাক হয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'আধুনিক কবি বীরেশ রায় কি আপনি?'

বীরেশবাবু হেসে বললেন, 'আজ রাত্রে যে কবিতাটা লিখব তার সুর হবে আপনারই মনের সুর। সে সুর কান্নার। আপনার কান্না আমি শুনতে পেয়েছি। মনে হয়, ভবতোষবাবুকে আপনি পান নি।'

গাড়িতে স্টার্ট দেওয়াই ছিল। বীরেশবাবু গিয়ার টানলেন।"

কার্শিয়ংয়ের নবম রাত্রিটা খারাপ লাগছে না মিস জয়া বসুর। দশ বছর আগের ঘটনাগুলো পরিষ্কার মনে পড়ছে তাঁর। কোন ঘটনাই আজ আর তাঁর মনের মাটিতে দাগ কাটতে পারবে না। মাটি আর নরম নেই। সেদিনের ব্যথা কাল হয়তো আনন্দের উপাদান হয়ে উঠবে।

ঘরের দরজায় খুট ক'রে শব্দ হ'ল। মিস জয়া বসু বিছানায় ব'সেই ডাকলেন, "নিশীথ!"

নিশীথ নয়, ঘরে ঢুকল সাবিত্রী। সে বললে, "উনি শুয়ে পড়েছেন আজ। শরীরটা ওঁর ভাল নেই।"

"তোর শরীরটাই বা এমন কি ভাল ? আমার সঙ্গে সঙ্গে তোরা কেন রাত জাগিস, সাবিত্রী ?"

"তুমি এবার শুয়ে পড়, দিদিমণি। আলোটা নিবিয়ে দিই ?"

"দে।"—এই ব'লে মিস জয়া বসু চিঠি লেখার কাগজগুলো গুছোতে লাগলেন।

॥ দশম রাত্রি ॥

"এম. এ. পড়ছি। বিশ্ববিদ্যালয়ে যাই, বিদ্যা অর্জন করবার জন্যে নয়, সময় কাটাবার জন্যে। লেখাপড়া শেষ ক'রে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরুবার আগেই আমি যেন বেকার হয়ে গেছি। মনে হয়, কিছুই আর জানবার নেই ব'লে কিছু আর করবারও নেই।

মামার বাড়িতেও পরিবর্তন এসেছে। মামার পেনশনের টাকা দিয়ে সংসারের খরচ পুরোপুরি মিটছে না। বিলেতের কাগজে প্রবন্ধ লিখে মামা খানিকটা রোজগার করতেন, সেটাও প্রায় বন্ধ হয়ে এসেছে। দৃষ্টিশক্তি তাঁর আগের চেয়ে এখন অনেক ক'মে গেছে। মাঝে মাঝে আমি তাঁর বক্তব্য লিখে টাইপ ক'রে বিলেতের কাগজে পাঠিয়ে দিই। শ্রুতিলিখনের সাহায্যে নিয়মিতভাবে প্রবন্ধ লেখা আজকাল আর হয়ে উঠছে না।

আমার জন্যেও মামাকে খরচ করতে হচ্ছে। বৃত্তির টাকা নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইনে দিতে হয় তাঁকেই। অনেক দিন মামাকে বলেছি, বাবার কাছে চিঠি লিখতে। প্রথমে তিনি রাজী হন নি। তারপর যখন রাজী হলেন তখন বাবার নামটা তিনি স্মরণ করতে পারলেন না। স্মরণ যখন করলেন তখন তাঁর ঠিকানাটা মামার মনে পড়ল না। বাবার নাম এবং ঠিকানা আমিই তাঁকে মনে করিয়ে দিলুম।

মামার হয়ে আমিই একখানা পোস্ট-কার্ড লিখলুম। মামা নাম সই করলেন। পোস্ট-কার্ড ব'লেই তাতে টাকার কথা তিনি কিছু লিখতে দিলেন না, কেবল তাঁদের কুশল প্রার্থনা ক'রে পোস্ট-কার্ড লেখা শেষ হ'ল। বাবার কাছ থেকে যদি জবাব আসে, তারপর টাকার সাহায্য চেয়ে বড় চিঠি লেখা চলবে।

জবাব কিছু এল না। অনেক দিন পরে পোস্ট-কার্ডখানা ফিরে

এল। এলাহাবাদ থেকে চিঠিখানা নতুন ঠিকানা নিয়ে চ'লে গিয়েছিল কেষ্টনগরে আমাদের বাড়ির ঠিকানায়। কেউ হয়তো কেষ্টনগর থেকে পোস্ট-কার্ডের উল্টো পিঠে লিখে দিয়েছেন যে, বাবা মারা গেছেন। বাড়িঘর সব বিক্রি হয়ে গেছে। তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী আর কন্যা কলকাতায় থাকেন, ঠিকানাটা জানা নেই। আমাদের কলকাতার বাড়িতে বাবার কাছে লেখা পোস্ট-কার্ড ফিরে এল।

মামা বললেন, 'এর পর আর কি করা যেতে পারে? হরিদাস যখন আর নেই, তখন তার দ্বিতীয় স্ত্রীর অনুসন্ধান ক'রে আর কোন লাভ হবে না। হরিদাসের অনেক টাকা ছিল ব'লে শুনেছি, কিন্তু এখন আর তা জেনেও লাভ নেই। অনেক বছর আগে হরিদাস তোকে দু শো টাকা পাঠিয়েছিল, আমি ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। অতএব সে যে তোকে একটা টাকাও দিয়ে যায় নি, তার জন্যেও তাকে দায়ী করা চলে না।'

আমি বললুম, 'একটু অনুসন্ধান ক'রে দেখলেই বা দোষ কি? বাবা হয়তো আমার সৎমার কাছে আমার জন্যে টাকা রেখে গেছেন।' বড়মামা হাসলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'সৎমায়ের কাছে টাকা রেখে যাওয়া মানে কি? আমার ঠিকানা তো হরিদাসের জানা ছিল। দেওয়ার ইচ্ছে ছিল না ব'লেই সৎমায়ের কাছে সে টাকা রেখে গেছে।'

কথাটাকে বিশ্বাসযোগ্য করবার জন্যে আমি বললুম, 'সৎমায়েরা সাধারণত একটু স্বার্থপর হন। হয়তো আমার সৎমা সে রকম নন। তুমি যদি আপত্তি না কর, তা হ'লে ওঁদের একবার আমি খোঁজ ক'রে দেখতে পারি। কলকাতার রাস্তাঘাট তো আমার আর অজানা নেই।'

'কোথায় খোঁজ করবি? রাস্তার নাম জানা চাই তো?'

'তা হ'লে তো এম. এ. পরীক্ষা আমার দেওয়া হয় না। তোমার ওপর অত্যাচার তো কম করলুম না। আচ্ছা মামা, তুমি মিসেস

গুপ্তকে একবার ব'লে দেখ না, তাঁর ইস্কুলেই একটা চাকরি নিয়ে ঢুকে পড়ি। তারপর এম. এ. পরীক্ষাটা এক সময় দিয়ে দিলেই চলবে।'

মামা বললেন, 'না, চাকরি করবার দরকার নেই এখন, পরীক্ষাটা তোকে দিতেই হবে। এক কাজ কর্ না, অপূর্বর কাছে একবার যা। টেলিফোনের গাইড থেকে ওর বাড়ির ঠিকানাটা বার ক'রে নিয়ে আয়। ওকে আমি একটা চিঠি দিচ্ছি। কিছু টাকা দিয়ে অপূর্ব তোকে এখন সাহায্য করুক।'

'আমি তো তাঁকে চিনি না, মামা।'

'আমারই সে ছোট ভাই, চিনতে অসুবিধে হবে না। যাবি একবার তার কাছে? লজ্জা পাচ্ছিস, জয়া? পাওয়াই স্বাভাবিক। আই. সি. এস. হ'লেই ওরা মনে করে, ওদের কোন আত্মীয়-স্বজন নেই। দিন বদলাচ্ছে। ক্রমে ক্রমে ওরাও স্বাভাবিক হবে।'

কিছু বলবার ছিল না ব'লেই আমি বোধ হয় জিজ্ঞাসা করলুম, 'কেবল বাঙালীরাই কি এমনি ধরনের?'

'কেন রে?'

'আমাদের বাড়ির উল্টো দিকে একজন পাঞ্জাবী ভদ্রলোক থাকেন। সংসার খুব ছোট। বউ আর একটি পাঁচ-ছ বছরের ছেলে আছে তাঁর। শুনেছি, তিনি ঠিকেদারি করেন। খুব ছোট কারবার। তাঁর বড় ভাইও আই. সি. এস.। সন্ধ্যের পরে গাড়ি চালিয়ে তিনি প্রত্যেক দিন এখানে আসেন। ছোট ভাইটির খোঁজখবর না নিয়ে তিনি নাকি রাত্রিতে ভাল ক'রে ঘুমতে পারেন না। পাশের বাড়ির হা [illegible]বাবুর স্ত্রীর কাছে শুনলুম এসব।'

মামা চুপ ক'রে রইলেন।

ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগে আমি বললুম, 'এক সপ্তাহ আগে ছোটমামা খবরের কাগজে একটা প্রবন্ধ লিখেছিলেন। ছোটমামা বুঝি দর্শনের ছাত্র ছিলেন?'

অমিতাভ আর্টিস্ট, শিল্পী। এ দেশে ছবি বেচে ক টাকাই বা সে রোজগার করতে পারবে ?'

'তা হোক, বাংলা দেশে ভাল শিল্পীর খুবই দরকার।'

একটু হেসে জগদীশবাবু এবার বললেন, 'আমার তো ভাগ্য খুব ভাল। ছেলে একজন প্রথম শ্রেণীর কবি, বন্ধুর ছেলেও একজন প্রথম শ্রেণীর শিল্পী। বুড়ো বয়সটা আমার ভালই কাটছে। কি বল তুমি, মা জয়া ?'

'আমার তো তাই মনে হয়।'

'অমিতাভর শরীরের গড়নটা হয়েছে প্রশান্তের মত। চোখ দুটো মায়ের মত। সুন্দর হয়েছে দেখতে। ফরাসী দেশে সারা জীবন বাস ক'রেও প্রশান্ত কখনো মদ খায় নি। অমিতাভর মাও শুনলুম ভারতবর্ষের জীবনধারার প্রতি শ্রদ্ধাশীলা। এলে তোমার সঙ্গে ওদের পরিচয় করিয়ে দেব।'

পরিচিত হবার জন্যে আমি একটুও আগ্রহ দেখালুম না। গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড দিয়ে গাড়ি ফিরে আসছে কলকাতায়। জগদীশবাবুর সঙ্গে দেখা হয়ে খুবই ভাল হ'ল। ভবতোষের চিঠিখানার কথা ভুলে থাকতে পারলুম অনেকক্ষণ পর্যন্ত। ভোলবার জন্যেও মানুষকে বোধ হয় সাধনা করতে হয়।

উত্তরপাড়ার কাছাকাছি এসে জগদীশবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'বি. এ. পরীক্ষাটা এত খারাপ হ'ল কেন তোমার ?'

'আপনি পরীক্ষার খবরও রাখেন নাকি ?'

'অন্য কারও রাখি না, তোমারটা রাখি। তোমার সব খবর জানবার জন্যে আমার আগ্রহ হয় খুব। তোমাকে কোন রকম ভাবে যদি সাহায্য করতে পারতুম আমার মনটা খুশিতে ভ'রে উঠত, জয়া।'

'হঠাৎ আপনি সাহায্যের কথা তুললেন কেন ? বড়মামা সেদিন আপনার ওখানে গিয়েছিলেন, তিনি কিছু বললেন নাকি ?'

'না। ম'রে গেলেও যাদব কোনদিনই কোন্ কথা বলবে না। আমার যারা সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু তারা আমার কাছ থেকে কোনদিনই একটা পয়সার সাহায্যও নেয় নি। যাদবের সংসারে অভাব আছে জানি, কিন্তু সে ম'রে যাবে তবু হাত পাতবে না। আমি তো আত্মীয় নই, কেবল বন্ধু।'

আমি চুপ ক'রে রইলুম্। একটু পরেই জগদীশবাবু আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার তো এখন বৃত্তির টাকা নেই, সব খরচাই তো যাদবকে বহন করতে হচ্ছে ?'

'হ্যাঁ,' একটু ভেবে নিয়ে বললুম, 'বহন করতে কষ্ট হচ্ছে তাঁর। ছোটমামার কাছে আজ তিনি চিঠি দিয়ে আমায় পাঠিয়েছিলেন। নিজের জন্যে তিনি এক পয়সা সাহায্য নেবেন না, তা ঠিক। আমার জন্যেই চিঠি দিয়েছিলেন।'

'কি বলল অপূর্ব ?'

'আমি তো যাই নি। যাব ভেবেছিলুম্।'

'ও, আমি বুঝি তোমায় উল্টো পথে নিয়ে এলুম্ ?'

'তা ঠিক নয়। ছোটমামার কাছে যেতুম না। তাঁকে আমি চিনি না।'

ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডে এসে জগদীশবাবু বললেন, 'আমার প্রতি তোমরা কি কেউ কোনদিনই সদয় হবে না ? জয়া, ধার ব'লেও তো কিছু টাকা তুমি আমার কাছ থেকে নিতে পার ?'

এবার আমি বললুম, 'তা বোধ হয় পারি। কলেজে একটা চাকরি আমার জুটে যাবেই। টাকা আপনার আমি ফিরিয়ে দেব।'

'বেশ, বেশ। এখন তুমি ভাল ক'রে পড়াশুনা কর, পরীক্ষাটা ভাল ক'রে দাও, তারপর তোমার চাকরির কথা ভাবা যাবে।'

বাড়ির কাছে এসে জগদীশবাবু বললেন, 'আজ আর যাদবের সঙ্গে দেখা করব না। আমি চলি। জয়া—'

জগদীশবাবু পকেট থেকে পার্স বার করলেন, 'যাদবকে ব'লো এ টাকা তোমায় আমি ধার দিচ্ছি।'

'বলব। দেখুন, চাকরি আমায় করতেই হবে', জগদীশবাবুর আরও কাছে এগিয়ে গিয়ে আমি আবার বললুম, 'বীরেশবাবুর মত আমিও একটা আলাদা ফ্ল্যাট চাই।'"

লেখা শেষ করলেন মিস জয়া বসু। রাত বেশী হয় নি, বোধ হয় বারোটাই হবে। নিশীথকে একটু আগে তিনি এক পেয়ালা কফি তৈরি করতে বলেছিলেন। নিশীথ কফি নিয়ে এল। জয়া বসু বললেন, "এবার তুই যা। চিঠি লেখা আজকের মত শেষ হ'ল।"

"কতদূর পর্যন্ত পৌঁছলে ?"

"এম. এ. পরীক্ষার কাছাকাছি। যে দিনটাতে চিঠি শেষ করলুম আজ, সেই দিন ভবতোষের কাছ থেকে একটা চিঠি পেয়েছিলুম। ফাদার হেনরীর কথা তাতে লেখা ছিল। তখন তাঁর বয়স অনেক কম ছিল।"

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে নিশীথ বলল, "আজ সকালে তাঁকে ভাল ক'রে দেখলুম। আজও তাঁর বয়স বেড়েছে ব'লে মনে হয় না। কি কথা হ'ল আজ ?"

"জিজ্ঞেস করছিস কেন রে ?"

"চ'লে যাওয়ার সময় দেখলুম, মাথা নীচু ক'রে যাচ্ছেন। সব সময়ে তো তিনি হাসেন। আজ দেখলুম, গম্ভীর। রাগ করলেন নাকি ?"

কফিতে চুমুক না দিয়ে জয়া বসু বললেন, "না, ফাদার হেনরী রাগ করতে জানেন না। বোধ হয় ব্যথা পেয়েছেন।"

"কেন ?"

"দু-একটা কঠিন কথা বলেছিলাম।"

"কেন তুমি তাঁকে ব্যথা দিলে, দিদিমণি? কোন মানুষকেই ব্যথা দিতে নেই। ফাদার হেনরীর মত মানুষকে তো নয়ই।"

কফিতে চুমুক দিয়ে জয়া বসু বললেন, "তাঁকে আমি ব্যথা দিতেই চেয়েছিলাম। সারা জীবন ধ'রে তিনি হাসছেন কি ক'রে? নিশীথ, আমি কবে হাসব? ফাদার হেনরী তো আমায় হাসির মন্ত্র শেখাতে পারলেন না? এখানে আমার দশটা রাত্রি কেটে গেল, কই, আমি তো একটু হাসতে পারলুম না?"

কফি খেতে খেতে জয়া বসু নিজের মনেই একবার একটু হেসে ওঠবার চেষ্টা করলেন। ফাদার হেনরীকে তিনি ইচ্ছে ক'রেই ব্যথা দিতে চেয়েছিলেন। তিনি তাঁকে বলেছিলেন, "ফাদার, আপনারা তো প্রফেশনাল। তাই আপনারা কেবল স্বধর্মীর সংখ্যা বাড়াবার দিকে নজর দেন।" মিস জয়া বসুর কথা শুনে মাথাটা নীচু ক'রে রেখেছিলেন ফাদার হেনরী। তারপর তিনি চ'লে যাওয়ার সময় ব'লে গিয়েছিলেন, "কাল আমাদের পাম সান্‌ডে। আপনার শান্তির জন্যে আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করব।"

কফির পেয়ালাটা হাতে নিয়ে কুমারী জয়া বসু ভাবতে লাগলেন।

॥ একাদশ রাত্রি ॥

"বোধ হয় উনিশ শো আটত্রিশের জুলাই মাসে আমি কলেজে ঢুকলুম চাকরি নিয়ে। মেয়েদের দর্শন পড়াতে হবে ব'লেই আমার দর্শন পড়া শেষ হ'ল। সরকারী কলেজে চাকরি পেলুম না। চেষ্টাও তেমন করি নি। প্রাইভেট কলেজ ব'লেই বোধ হয় কেবল দরখাস্ত পাঠিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত ভাবে ব'সে ছিলুম বাড়িতে। না চাইতেই ডক্টর সেন নিজের লেখা সুপারিশ-পত্র একটা রেখে গিয়েছিলেন বড়মামার কাছে। সেটা আলপিন দিয়ে গেঁথে দিলুম দরখাস্তের সঙ্গে। বড়মামা বললেন, 'রেজেস্ট্রি ডাকে দরখাস্তটা পাঠিয়ে দিস। ইংরেজের শাসন অনেক শিথিল হয়ে এসেছে, সাধারণ ডাক অনেক সময় গন্তব্যে পৌঁছয় না। চারদিকে বড্ড বেশী গলদ দেখতে পাচ্ছি।'

'চোখের ক্যাটারাক্ট তো তুমি কাটালে না মামা, এত সব ছোটখাট জিনিস দেখতে পাও কি ক'রে?'

'ছোটখাট ব্যাপার এগুলো নয়। ব্যাঙ্ক পরিচালনার চেয়ে বেশী সততার দরকার হয় ডাক বিলি করতে। রেজিস্ট্রি ডাকেই দরখাস্তটা পাঠাস। সঙ্গে আমারও একটা সুপারিশ-পত্র থাক্। প্রিন্সিপ্যাল মিসেস সুজাতা রায়ের সঙ্গে আমার পরিচয় অনেক দিনের।'

আমি বললুম, 'তাই পাঠাব। কিন্তু রেজেস্ট্রি ডাকে খরচ তো অনেক বেশী পড়বে। সামান্য একটা দরখাস্ত পাঠাবার জন্যে বেশী পয়সা খরচ ক'রে লাভ কি? অবিশ্যি তোমাদের সুপারিশ দুটো খুবই মূল্যবান, রেজেস্ট্রি ক'রেই পাঠাব।'

দরখাস্তটা টাইপ ক'রে খামে বন্ধ করলুম। নিজেই পোস্ট-অফিসে যাব ব'লে নীচে নেমে এলুম। মামীমা আমার ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'হাতে ওটা কি রে তোর?'

বললুম, 'চাকরির দরখাস্ত।'

মামীমা খপ ক'রে খামখানা আমার হাত থেকে টেনে নিয়ে বললেন, 'ভগবানের আশীর্বাদ চাই, নইলে সংসারে কোন কিছুই হয় না।'

আমি প্রতিবাদ করলুম না। তর্ক ক'রে কোন কিছু বোঝাতেও চেষ্টা করলুম না। পৃথিবীর বয়স তো কম হ'ল না, প্রতিবাদ কিংবা তর্ক কিছু কম হয় নি। কে কতটা বুঝল আর কে কতটা বুঝল না, তা নিয়ে আমার আর কিছু বলবার নেই।

একটু বাদেই মামীমা ফিরে এলেন। খামখানা আমার হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, 'ঠাকুর আমার কথা শুনেছেন। তোর চাকরি হবে।'

খামখানার ওপরে রক্তচন্দনের দাগ পড়েছে দু তিনটে। আমি বললুম, 'একটু সাবধান হ'লে চন্দন লেগে ঠিকানাটা এমন অস্পষ্ট হ'ত না।'

'বলিস কি, জয়া! চন্দন তো ঠাকুরের আশীর্বাদ রে। এখন ঠিকানা না লেখা থাকলেও চিঠি গিয়ে ঠিক জায়গায় পৌঁছবে। আমি যখন খামখানা ঠাকুরের পায়ের কাছে রেখে পুজো করছিলুম তখন তাঁর হাত থেকে এই ফুলটা হঠাৎ এসে পড়ল চিঠিখানার ওপর। চাকরি তোর হবেই।'

'হ্যাঁ, ডক্টর সেন আর মামার সুপারিশ দুটো পিন দিয়ে দরখাস্তের সঙ্গে গেঁথে দিয়েছি। তা ছাড়া যিনি চাকরি দেবেন, মিসেস সুজাতা রায়, তিনি মামাকে খুব ভাল ক'রে চেনেন।'

'তোর কথা হয়তো মিথ্যে নয়। কিন্তু এ কথাও সত্যি যে, জগতের সব শুভকাজের মধ্যে ভগবানের আশীর্বাদ থাকে। কিংবা যে কাজের মধ্যে ভগবানের আশীর্বাদ নেই তা কখনও শুভ হয় না। মাইনে কত রে?'

প্রশ্নটা যেন হঠাৎ এসে আমায় ধাক্কা মারল। সামলে নিয়ে বললুম, 'মাইনের অঙ্কটা বিজ্ঞাপনে লেখা ছিল, কিন্তু ভুলে গেছি। প্রাইভেট কলেজ, বেশী মাইনে দেবে না।'

'বেশী না দিক, মাসে মাসে মাইনেটা চুকিয়ে দিলেই হ'ল।'

আমি চ'লে যাচ্ছিলুম। মামীমা আবার বললেন, 'আগে একটু খবর নিস। মাসের মাইনে আবার কিস্তিতে না দেয়! তোর বড়মামা সরকারী চাকরি পাওয়ার আগে ক মাসের জন্যে ছোট্ট একটা কলেজে চাকরি করেছিলেন। তিনি কিস্তিতে কিস্তিতে টাকা পেতেন। শেষের দিকে হুটো কিস্তি বাকি ছিল। তিনি আর তা পান নি।'

'গরীব দেশ—কত কষ্ট ক'রে স্কুল, কলেজ দাঁড় করাতে হয়, মামীমা!'

ঠিক মনে পড়ছে না, বোধ হয় হু সপ্তাহের মধ্যেই চিঠি এল মিসেস সুজাতা রায়ের কাছ থেকে। গভর্নিং বডির মেম্বারদের সঙ্গে আমার ইণ্টারভিউয়ের দিন পড়ল রবিবারে।

ইণ্টারভিউ দিতে যাওয়ার আগে মামাকে বললুম, 'কেবল দরখাস্ত পাঠিয়ে দিয়ে চাকরি হ'ল না। গভর্নিং বডির মেম্বারদের কাছে পরীক্ষা দিতে হবে। আই. এ. পরীক্ষার পর থেকে আমি তো আর বিশেষ কিছু পড়াশুনো করি নি। খুব কঠিন প্রশ্ন করবেন না কি ওঁরা? এ সম্বন্ধে তোমার তো অনেক অভিজ্ঞতা আছে।'

মামা বললেন, 'মেম্বারদের মধ্যে সবাই আসবেন না, হু-চার জন হয়তো আসবেন। তার মধ্যে আবার একজন থাকবেন যিনি প্রশ্ন করবেন না। কারণ, তিনি হচ্ছেন গিয়ে ব্যবসায়ী। শুরুতে তাঁর টাকা দিয়েই কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আজ রবিবার ব'লে তিনি হয়তো উপস্থিত থাকতে পারেন। কিন্তু অপূর্ব থাকবে।'

মামার কথা শুনে আমি ব'সে পড়লাম চেয়ারে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি রে, কি হ'ল?'

বললুম, 'না, কিছু হয় নি। যাওয়ার আগে একটু বিশ্রাম ক'রে নিচ্ছি।'

মামা তবু বললেন, 'অপূর্ব হচ্ছে গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান। ও যখন শুনেছে যে, দর্শন পড়াবার জন্যে অধ্যাপিকা নিযুক্ত করতে হবে, তখন অপূর্ব আজ নিশ্চয়ই আসবে। প্রশ্নও দু-একটা সে তৈরি ক'রে নিয়ে আসবে। পরিচয় দিবি না কি, জয়া?'

'পরিচয়? বিদ্যার, না, পারিবারিক পরিচয়ের কথা জিজ্ঞাসা করছ, মামা?'

একটু হেসে মামা জবাব দিলেন, 'বিদ্যায় কি আর আই.সি.এস.দের সঙ্গে পেরে উঠবি? আমি বলছিলুম, পারিবারিক পরিচয়ের কথা। অপূর্বর বাবা আর তোর মায়ের বাবা যে একই মানুষ ছিলেন তা বোধ হয় ও ভুলে গেছে।'

'তা হ'লে বোধ হয় বিদ্যার পরিচয় দেওয়াই ভাল।'

সকাল দশটার মধ্যে এসে পৌঁছে গেলাম কলেজে। ট্রামে আসতে মাত্র ছ পয়সা ভাড়া লাগল। ট্রাম বদলাতে হ'ল না। কলেজ স্ট্রীটের বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার চেয়ে কষ্ট অনেক কম। দরখাস্ত পাঠাবার আগে এই সব সুবিধেগুলোর কথা ভাল ক'রে ভেবে নিয়েছিলাম। এক ট্রাম থেকে নেমে অন্য ট্রাম ধরতে হ'লে আমি হয়তো দরখাস্ত পাঠাতুম না।

মিসেস রায়ের ঘরে গেলুম আমি। তিনি একাই ব'সে ছিলেন। মেম্বারদের মধ্যে কেউ এখনও আসেন নি। আমার ইণ্টারভিউয়ের সময় সাড়ে দশটা। আমাকে দেখে মিসেস রায়ের যে পছন্দ হয় নি তা বুঝতে আমার কষ্ট হ'ল না।

আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম, মিসেস রায় কোন কথাই বলছিলেন না। আমাকে দেখছিলেন। বসতে বলছেন না, নাম জিজ্ঞাসা করছেন না। থাকব, না যাব, সে সম্বন্ধে ইঙ্গিতেও তিনি কোন কিছু বোঝাবার চেষ্টা করছেন না। অপমান বোধ করবার মত চেহারা আমার ভাল নয়। তাই বিনীত সুরেই বললাম, 'আমার নাম জয়া বসু। ইণ্টারভিউয়ের

জন্যে আমায় আপনি চিঠি দিয়েছিলেন। একটু আগেই এসে গেছি। চাকরি পেলে এক মিনিটও আগে আসব না।'

বিন্দুমাত্র লজ্জিত বোধ করলেন না মিসেস রায়। তিনি আদেশের সুরেই বললেন, 'ব'স। দরখাস্তের ফাইলটা বার করছি। দরখাস্তটা খুঁজে বার করতে হবে।' তিনি উঠলেন। পেছন দিকের আলমারি থেকে একটা ফাইল বার ক'রে নিয়ে এসে বললেন, 'বাংলা দেশে নারী-শিক্ষার এতটা উন্নতি হয়েছে আগে তা টের পাই নি।'

ইচ্ছা ছিল না, তবুও জিজ্ঞাসা করলুম, 'কবে টের পেলেন প্রথম ?'

চশমার তলা দিয়ে তেরছাভাবে আমার দিকে চেয়ে তিনি বললেন, 'এই চাকরিটার জন্যে বিজ্ঞাপন দেওয়ার পরে। কলকাতা ছাড়াও দরখাস্ত এসেছে বাংলা দেশের সবগুলো জেলা থেকে। এসেছে রেঙ্গুনের প্রবাসী বাঙালী মেয়েদের কাছ থেকে। এটা তো হ'ল মোটামুটি পুব দিকের সীমানা। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের পেশোয়ার থেকে দরখাস্ত পাঠিয়েছেন মিসেস গিরিবালা সোম। তাঁর স্বামী সেখানে একটা বড় চাকরি করেন। তাঁর কলকাতায় বদলি হবার কথা হচ্ছে।'

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'তাঁর গুণাবলী, কোয়ালিফিকেশনস ?'

'দুটি মেয়ের ছেলেবেলায় বিয়ে হয়ে যাওয়ার পরে, সময় তাঁর কাটছিল না। স্বামী তো অফিস নিয়ে ব্যস্ত। বাড়িতে বই কিনে পড়তে লাগলেন। লাহোর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. এ. পাস করলেন। এম. এ. পাসও করলেন সেখান থেকে। দর্শনে ফার্স্ট ক্লাস পেলেন। স্বামীর সঙ্গে বিলেত ঘুরে এসেছেন। ফেরার পথে ফরাসী দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার কাজ করবেন ব'লে ভেবেছিলেন। ব্যবস্থাও হয়ে গিয়েছিল সব। কি একটা কাজে স্বামী তাঁর জার্মানিতে গেলেন ক'দিনের জন্যে। মিসেস সোমও সুযোগ পেয়ে জার্মানিতে এলেন তাঁর সঙ্গে। সুযোগ যখন এলই তখন হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়টা দেখে যাবেন না কেন ? সেখান থেকে কি মনে ক'রে তিনি এলেন ফ্রায়বুর্গ

বিশ্ববিদ্যালয়ে। বিখ্যাত দার্শনিক এডম্যাণ্ড হুসের্‌ল তখন সেখানে প্রফেসর। মিসেস সোম তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন। প্রফেসরের আলোচনা শুনে তাঁর মনে হ'ল, তিনি কিছুই শেখেন নি, কিছুই জানেন না। লাহোর বিশ্ববিদ্যালয়ে ইট, সুরকি, সিমেণ্ট আছে প্রচুর। কিন্তু বিদ্যা যে কিছু নেই, তা তিনি জানলেন অধ্যাপক হুসের্‌লকে দেখে এবং তাঁর কথা শুনে। অধ্যাপক হুসের্‌লের দর্শন যে ভীষণভাবে সত্যি তা বোঝাতে গিয়ে মিসেস সোম একটা দৃষ্টান্তও পাঠিয়েছেন তাঁর দরখাস্তে। 'সাদা ঘোড়া' এবং 'ঘোড়াটা সাদা' এই দুটো কথার মধ্যে একটা দৃষ্টান্ত তিনি দিয়েছেন বটে কিন্তু কি যে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন অধ্যাপক হুসের্‌লের নাম ক'রে আমি তো বাপু তার আগা-মাথা কিছু বুঝলুম না।' —এই ব'লে মিসেস রায় ফাইলটা খুলে আবার বললেন, 'বিজ্ঞাপন দিলুম দরখাস্ত চেয়ে। উনি পাঠিয়ে দিলেন একটা এক শো পঁচিশ পাতার বই। তাও আবার ফুলস্ক্যাপ কাগজে এক শো পঁচিশ পাতা।'

খুব আগ্রহের সঙ্গেই আমি বললুম, 'দিন না, একটু দেখি।'

'সে কি আমি নিজের কাছে রেখেছি না কি? চেয়ারম্যানের কাছে এক মাস আগেই পাঠিয়ে দিয়েছি। মিস্টার মিত্র আই. সি. এস., তিনি হয়তো বুঝতে পারবেন।'

'তা হ'লে তো আমার আর চাকরি হওয়ার আশা নেই। তিনি কবে আসছেন ইণ্টারভিউ দিতে?'

'না না, তাঁকে ডাকি নি। তাঁকে ডাকবার মত সাহস আমার নেই। ইণ্টারভিউ দিতে তিনি আসবেন না। দরখাস্তের শেষের পাতায় তিনি সে কথা পরিষ্কারভাবে টাইপ ক'রে দিয়েছেন। চাকরি তাঁকে দিলে একেবারে সোজা তাঁর কাছে নিয়োগপত্র পাঠিয়ে দিতে হবে। তাও আবার স্বামী যদি কলকাতায় বদলি না হন, তবে তিনি আসতে পারবেন না। যাক, তোমায় বাপু ডিগ্রী ক্লাসে পড়াতে হবে,'—ফাইল থেকে আমার দরখাস্তটা হাতে নিয়ে তিনি বললেন, 'পড়াবার জন্যে খুব

বেশী বিত্তের দরকার হয় না,' আমার মুখটা ভাল ক'রে দেখে নিয়ে তিনি আবার বললেন, 'মেয়েদের কাছে পপুলার হওয়াটাই হচ্ছে বিত্ত-ব্যবসার আসল সিক্রেট। আমাদের প্রাইভেট কলেজ, ঝামেলার শেষ নেই। নানা রকমের লোভ দেখিয়ে ছাত্রী জোটাতে হয়। রত্না—রত্নার নাম শুনেছ ?'

'কই, না তো !'

'সর্বনাশ ! করেছ কি ? আমাদের কলেজে আসছ চাকরি করতে, রত্নার নাম শোন নি ?'

'আপনি বলুন, শুনে নিই।'

ফাইলের মধ্যে আমার দরখাস্তখানা আবার ভ'রে রেখে দিয়ে মিসেস রায় বলতে লাগলেন, 'রত্না হচ্ছে গিয়ে বাংলা দেশের ইসাডোরা ডানকান। নৃত্যশিল্পী। সাধু বোসের দলের রত্নাই তো হচ্ছে একমাত্র আকর্ষণ। পরশু দিন নিউ এম্পায়ারে ওর নাচ দেখতে গেছলুম। কী সাঙ্ঘাতিক নাচ ! একেবারে শেষের নাচটার নাম হচ্ছে 'প্রেমের প্রতিশোধ'। প্রেমিক লুকিয়ে লুকিয়ে অন্য একটি মেয়ের সঙ্গে ভাব করছিল। রত্না সেটা জানতে পারলে। তার পর চার ইঞ্চি চওড়া আর বারো ইঞ্চি লম্বা একটি ছুরি হাতে নিয়ে সে নাচতে শুরু করল। বাজনার তাল দ্রুত থেকে দ্রুততর হতে লাগল। গোটা নিউ এম্পায়ারটা কাঁপছে। রত্নার সে কী মুখের ভঙ্গি আর হাতের কায়দা ! প্রেমিকটিকে নাচতে নাচতে এসে ছুরি মারবে। তারপর সেই মুহূর্তটা আসে অত্যন্ত ধীরে ধীরে। রত্না এগিয়ে যাচ্ছে। প্রেমিকটি অনুতপ্ত। তারপর ? ঠিক যখন রত্না ছুরি তুলল, লোকটা তখন নাচের ভঙ্গিতেই এসে লুটিয়ে পড়ল ওর পায়ে ! সঙ্গে সঙ্গে কারটেন নেমে আসে। অপূর্ব ! কি উচ্চাঙ্গের শিল্প !'

'কিন্তু এটা তো নাচের কলেজ নয়—'

চোখ বন্ধ ক'রে ফেলেছিলেন মিসেস রায়। আমার কথা শুনে

তিনি প্রথমে চমকে উঠলেন, তারপর চোখ খুলে বললেন, 'রত্নার এত নাম যে, ও এই কলেজে পড়ে ব'লে এখানে অনেক ছাত্রী আসে। তিন বছর থেকে রত্না সেকেণ্ড ইয়ারেই পড়ছে, কিন্তু আমাদের তাতে সুবিধেই হয়েছে খুব। ওই বোধ হয় চেয়ারম্যান এলেন। গাড়ির আওয়াজ পেলুম। তুমি এখানে ব'স। পরে তোমায় ডেকে পাঠাব।' ফাইলটা হাতে নিয়ে মিসেস রায় ছুটে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

মিনিট পনেরো পরে আমার ডাক পড়ল। ঘরে ঢুকে নমস্কার করলুম চেয়ারম্যানকে। অন্য মেম্বাররা কেউ আসেন নি।

আমার দরখাস্তের ওপরে চোখ বুলচ্ছিলেন চেয়ারম্যান। আমি দেখছিলুম চেয়ারম্যানের মুখখানা। বড়মামার মুখের সঙ্গে খুব কিছু মিল নেই। কিন্তু আমার মায়ের সঙ্গে অদ্ভুত সাদৃশ্য রয়েছে ছোট-মামার মুখের। তিনি যখন মুখ তুললেন, তখন দেখলুম, তাঁর চোখ দুটোও ঠিক আমার মায়ের চোখের মত, খুব সরল কিন্তু গভীর। কপালটা খুব চওড়া। মাথার ওপরে টাক পড়েছে ব'লে কপালটাকে আরও বেশী চওড়া দেখাচ্ছে। তিনি সত্যিকারের দার্শনিক কি না জানি না। কিন্তু বিদ্যার ছাপ রয়েছে মুখে।

চেয়ারম্যান তাঁর ডান দিকের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে কি যেন খুঁজছিলেন। মিসেস রায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'মিসেস গিরিবালা সোমের দরখাস্তটা পড়েছেন ?'

'দরখাস্ত ? ওটা তো ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মকদ্দমার রায়ের মত একটা মোটা ব্যাপার ! সেটা থাক। কিন্তু আমি যে সেদিন আপনার সঙ্গে আলোচনাটা শুরু করেছিলাম, মিসেস রায়—'

বাধা দিয়ে প্রিন্সিপ্যাল ব'লে উঠলেন, 'আমি তো অঙ্কের এম. এ.—মানে, হুসেরল সম্বন্ধে তিনি কি যে লিখেছেন—আমি বলছিলুম মিসেস সোম ফার্স্ট ক্লাস—'

চেয়ারম্যান শেষ কথাটা লুফে নিয়ে বলতে লাগলেন, 'ফার্স্ট ক্লাস

বেশী বিদ্যের দরকার হয় না,' আমার মুখটা ভাল ক'রে দেখে নিয়ে তিনি আবার বললেন, 'মেয়েদের কাছে পপুলার হওয়াটাই হচ্ছে বিদ্যে-ব্যবসার আসল সিক্রেট। আমাদের প্রাইভেট কলেজ, ঝামেলার শেষ নেই। নানা রকমের লোভ দেখিয়ে ছাত্রী জোটাতে হয়। রত্না—রত্নার নাম শুনেছ?'

'কই, না তো!'

'সর্বনাশ! করেছ কি? আমাদের কলেজে আসছ চাকরি করতে, রত্নার নাম শোন নি?'

'আপনি বলুন, শুনে নিই।'

ফাইলের মধ্যে আমার দরখাস্তখানা আবার ভ'রে রেখে দিয়ে মিসেস রায় বলতে লাগলেন, 'রত্না হচ্ছে গিয়ে বাংলা দেশের ইসাডোরা ডানকান। নৃত্যশিল্পী। সাধু বোসের দলের রত্নাই তো হচ্ছে একমাত্র আকর্ষণ। পরশু দিন নিউ এম্পায়ারে ওর নাচ দেখতে গেছলুম। কী সাঙ্ঘাতিক নাচ! একেবারে শেষের নাচটার নাম হচ্ছে 'প্রেমের প্রতিশোধ'। প্রেমিক লুকিয়ে লুকিয়ে অন্য একটি মেয়ের সঙ্গে ভাব করছিল। রত্না সেটা জানতে পারলে। তার পর চার ইঞ্চি চওড়া আর বারো ইঞ্চি লম্বা একটি ছুরি হাতে নিয়ে সে নাচতে শুরু করল। বাজনার তাল দ্রুত থেকে দ্রুততর হতে লাগল। গোটা নিউ এম্পায়ারটা কাঁপছে। রত্নার সে কী মুখের ভঙ্গি আর হাতের কায়দা! প্রেমিকটিকে নাচতে নাচতে এসে ছুরি মারবে। তারপর সেই মুহূর্তটা আসে অত্যন্ত ধীরে ধীরে। রত্না এগিয়ে যাচ্ছে। প্রেমিকটি অনুতপ্ত। তারপর? ঠিক যখন রত্না ছুরি তুলল, লোকটা তখন নাচের ভঙ্গিতেই এসে লুটিয়ে পড়ল ওর পায়ে! সঙ্গে সঙ্গে কারটেন নেমে আসে। অপূর্ব! কি উচ্চাঙ্গের শিল্প!'

'কিন্তু এটা তো নাচের কলেজ নয়—'

চোখ বন্ধ ক'রে ফেলেছিলেন মিসেস রায়। আমার কথা শুনে

তিনি প্রথমে চমকে উঠলেন, তারপর চোখ খুলে বললেন, 'রত্নার এত নাম যে, ও এই কলেজে পড়ে ব'লে এখানে অনেক ছাত্রী আসে। তিন বছর থেকে রত্না সেকেণ্ড ইয়ারেই পড়ছে, কিন্তু আমাদের তাতে সুবিধেই হয়েছে খুব। ওই বোধ হয় চেয়ারম্যান এলেন। গাড়ির আওয়াজ পেলুম। তুমি এখানে ব'স। পরে তোমায় ডেকে পাঠাব।' ফাইলটা হাতে নিয়ে মিসেস রায় ছুটে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

মিনিট পনেরো পরে আমার ডাক পড়ল। ঘরে ঢুকে নমস্কার করলুম চেয়ারম্যানকে। অন্য মেম্বাররা কেউ আসেন নি।

আমার দরখাস্তের ওপরে চোখ বুলচ্ছিলেন চেয়ারম্যান। আমি দেখছিলুম চেয়ারম্যানের মুখখানা। বড়মামার মুখের সঙ্গে খুব কিছু মিল নেই। কিন্তু আমার মায়ের সঙ্গে অদ্ভুত সাদৃশ্য রয়েছে ছোট-মামার মুখের। তিনি যখন মুখ তুললেন, তখন দেখলুম, তাঁর চোখ দুটোও ঠিক আমার মায়ের চোখের মত, খুব সরল কিন্তু গভীর। কপালটা খুব চওড়া। মাথার ওপরে টাক পড়েছে ব'লে কপালটাকে আরও বেশী চওড়া দেখাচ্ছে। তিনি সত্যিকারের দার্শনিক কি না জানি না। কিন্তু বিদ্যার ছাপ রয়েছে মুখে।

চেয়ারম্যান তাঁর ডান দিকের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে কি যেন খুঁজছিলেন। মিসেস রায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'মিসেস গিরিবালা সোমের দরখাস্তটা পড়েছেন ?'

'দরখাস্ত ? ওটা তো ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মকদ্দমার রায়ের মত একটা মোটা ব্যাপার ! সেটা থাক। কিন্তু আমি যে সেদিন আপনার সঙ্গে আলোচনাটা শুরু করেছিলাম, মিসেস রায়—'

বাধা দিয়ে প্রিন্সিপ্যাল ব'লে উঠলেন, 'আমি তো অঙ্কের এম. এ.—মানে, হুসেরল সম্বন্ধে তিনি কি যে লিখেছেন—আমি বলছিলুম মিসেস সোম ফার্স্ট ক্লাস—'

চেয়ারম্যান শেষ কথাটা লুফে নিয়ে বলতে লাগলেন, 'ফার্স্ট ক্লাস

হ'লেই কিছু একটা হয় না। কোথাকার ফার্স্ট ক্লাস তাও দেখতে হয়। আমাদের আর কিছু দেখবার নেই, মিস বোসকেই আমরা নেব।'—এই ব'লে ছোটমামা পকেট থেকে একটা পাণ্ডুলিপি বার ক'রে বললেন, 'দর্শন এবং দর্শনের ইতিহাস প'ড়ে একটা মূলতত্ত্ব আমি বুঝতে পারছি যে, দুঃখভোগই হচ্ছে জীবনের নিয়ম—ল অব লাইফ। মিস বোসের কি মত?'

বুঝলুম, আমার পরীক্ষার সময় সমাগত। দেরি করলে চলবে না, হেরে যাব। আমি বললুম, 'কেবল দর্শন আর দর্শনের ইতিহাস থেকে জীবনের মূলতত্ত্ব খুঁজতে গেলে কোথাও ভুল থাকতে পারে। আমাদের ইতিহাসের দর্শনও খুঁজতে হবে। আপনার বক্তব্য মোটামুটি ঠিক। খ্রীষ্টধর্মের সুরের সঙ্গে আপনার সুরের মিল আছে। বৌদ্ধধর্মের কথাও এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। একাধিক হিন্দু দার্শনিকও আপনাকে সমর্থন করবেন। খ্রীষ্টপূর্ব ইয়োরোপের ইতিহাসেও আপনার কথার সমর্থন পাওয়া যায়।'

'তাই নাকি? খ্রীষ্টপূর্ব ইয়োরোপে কি ছিল?'

বুঝলুম, প্রথমেই ছোটমামা আমার সহযোগিতা চাইছেন। আমি তাই বললুম, 'হেলেনিজ্‌মের ধ্বংস হয়েছিল, কারণ দুঃখভোগই যে মানব-জীবনের নিয়ম তেমন মূলতত্ত্বকে তাঁরা কোন প্রাধান্য দেন নি। শেষ পর্যন্ত তাঁদের জগৎটা ভেঙে লয় পেয়ে গেল সৌন্দর্যের স্বপ্নের মধ্যে। এই স্বপ্নের বাইরে তাঁরা আর কোন তত্ত্বের সন্ধান পান নি।'

'বোধ হয় আমার এই প্রবন্ধটার মূল কথা তোমার বক্তব্যের সঙ্গে মিলবে।'—ছোটমামা এবার তাঁর পাণ্ডুলিপির প্রথম পাতাটা খুললেন। খুলে বললেন, 'প্রবন্ধ পড়বার মত বাংলা দেশে এখনও পাঠক তৈরি হয় নি।'

প্রবন্ধটা পড়তে শুরু করবার আগে মিসেস রায় বললেন, 'আজ তো রবিবার—।' এই পর্যন্ত ব'লে মিসেস রায় আমার দরখাস্তটা

এগিয়ে ধরলেন ছোটমামার দিকে। ছোটমামা বললেন, 'আপনার কলেজের পক্ষে ইনি বেশ ভালই হবেন।'

'এখানে তা হ'লে আপনি সই ক'রে দিন। ছুটো সুপারিশও আছে। আর বোধ হয় তা আপনার দেখবার দরকার হবে না।'

দরখাস্তের বাঁ কোণার দিকে সই বসিয়ে দিয়ে ছোটমামা সুপারিশ ছুটো পড়তে লাগলেন। বড়মামার সুপারিশটা পড়তে গিয়ে তিনি হঠাৎ আমার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কি বড়দার ওখানে থাক?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। হরিদাস বসুর মেয়ে আমি।'

'কে?' চেয়ারম্যান এবার চেয়ার থেকে উঠে পড়লেন। প্রবন্ধটা ভাঁজ ক'রে পকেটে ঢুকিয়ে রেখে তিনি চশমার কাচ ছুটো রুমাল দিয়ে মুছতে মুছতে আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুই চিন্ময়ীর মেয়ে?'

'হ্যাঁ মামা।'

মিসেস রায় ততক্ষণে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছেন। তাঁর কাজ ফুরিয়েছে। তাঁকে আর দেখতে পেলুম না। ঘরের দরজায় তালা লাগাবার জন্যে দরওয়ানটা সামনেই হাঁটাহাঁটি করছিল। আজ রবিবার, ডিউটি দিতে ওরও ভাল লাগছে না।

আমার ঘাড়ে হাত রেখে ছোটমামা একতলায় নেমে এলেন। একটা কথাও বললেন না তিনি। তাঁর হাতের স্পর্শ থেকে আমি অনুভব করলুম, দুঃখভোগই যে জীবনের নিয়ম, তা তিনি বেশ ভাল ক'রেই বুঝতে পেরেছেন। তাঁর স্পর্শের মধ্যে প্রাণ ছিল না।

সাজ-পোশাক-পরা ড্রাইভার এসে গাড়ির দরজা খুলে দিল। ছোটমামা বললেন, 'চল্ আমার সঙ্গে।'

'না মামা, এখান থেকে ট্রামে যেতে আমার মাত্র ছ পয়সা লাগবে।'

'অনেক দিন ট্রামে চাপি নি। ক পয়সায় কত দূর যাওয়া যায় তা আমি জানি না। তোর সাহচর্য আজ আমার ভাল লাগছে, জয়া।'

হ'লেই কিছু একটা হয় না। কোথাকার ফার্স্ট ক্লাস তাও দেখতে হয়। আমাদের আর কিছু দেখবার নেই, মিস বোসকেই আমরা নেব।'—এই ব'লে ছোটমামা পকেট থেকে একটা পাণ্ডুলিপি বার ক'রে বললেন, 'দর্শন এবং দর্শনের ইতিহাস প'ড়ে একটা মূলতত্ত্ব আমি বুঝতে পারছি যে, দুঃখভোগই হচ্ছে জীবনের নিয়ম—ল অব লাইফ। মিস বোসের কি মত ?'

বুঝলুম, আমার পরীক্ষার সময় সমাগত। দেরি করলে চলবে না, হেরে যাব। আমি বললুম, 'কেবল দর্শন আর দর্শনের ইতিহাস থেকে জীবনের মূলতত্ত্ব খুঁজতে গেলে কোথাও ভুল থাকতে পারে। আমাদের ইতিহাসের দর্শনও খুঁজতে হবে। আপনার বক্তব্য মোটামুটি ঠিক। খ্রীষ্টধর্মের সুরের সঙ্গে আপনার সুরের মিল আছে। বৌদ্ধধর্মের কথাও এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। একাধিক হিন্দু দার্শনিকও আপনাকে সমর্থন করবেন। খ্রীষ্টপূর্ব ইয়োরোপের ইতিহাসেও আপনার কথার সমর্থন পাওয়া যায়।'

'তাই নাকি ? খ্রীষ্টপূর্ব ইয়োরোপে কি ছিল ?'

বুঝলুম, প্রথমেই ছোটমামা আমার সহযোগিতা চাইছেন। আমি তাই বললুম, 'হেলেনিজ্‌মের ধ্বংস হয়েছিল, কারণ দুঃখভোগই যে মানব-জীবনের নিয়ম তেমন মূলতত্ত্বকে তাঁরা কোন প্রাধান্য দেন নি। শেষ পর্যন্ত তাঁদের জগৎটা ভেঙে লয় পেয়ে গেল সৌন্দর্যের স্বপ্নের মধ্যে। এই স্বপ্নের বাইরে তাঁরা আর কোন তত্ত্বের সন্ধান পান নি।'

'বোধ হয় আমার এই প্রবন্ধটার মূল কথা তোমার বক্তব্যের সঙ্গে মিলবে।'—ছোটমামা এবার তাঁর পাণ্ডুলিপির প্রথম পাতাটা খুললেন। খুলে বললেন, 'প্রবন্ধ পড়বার মত বাংলা দেশে এখনও পাঠক তৈরি হয় নি।'

প্রবন্ধটা পড়তে শুরু করবার আগে মিসেস রায় বললেন, 'আজ তো রবিবার—।' এই পর্যন্ত ব'লে মিসেস রায় আমার দরখাস্তটা

এগিয়ে ধরলেন ছোটমামার দিকে। ছোটমামা বললেন, 'আপনার কলেজের পক্ষে ইনি বেশ ভালই হবেন।'

'এখানে তা হ'লে আপনি সই ক'রে দিন। ছুটো সুপারিশও আছে। আর বোধ হয় তা আপনার দেখবার দরকার হবে না।'

দরখাস্তের বাঁ কোণার দিকে সই বসিয়ে দিয়ে ছোটমামা সুপারিশ ছুটো পড়তে লাগলেন। বড়মামার সুপারিশটা পড়তে গিয়ে তিনি হঠাৎ আমার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কি বড়দার ওখানে থাক ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। হরিদাস বসুর মেয়ে আমি।'

'কে ?' চেয়ারম্যান এবার চেয়ার থেকে উঠে পড়লেন। প্রবন্ধটা ভাঁজ ক'রে পকেটে ঢুকিয়ে রেখে তিনি চশমার কাচ ছুটো রুমাল দিয়ে মুছতে মুছতে আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুই চিন্ময়ীর মেয়ে ?'

'হ্যাঁ মামা।'

মিসেস রায় ততক্ষণে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছেন। তাঁর কাজ ফুরিয়েছে। তাঁকে আর দেখতে পেলুম না। ঘরের দরজায় তালা লাগাবার জন্যে দরওয়ানটা সামনেই হাঁটাহাঁটি করছিল। আজ রবিবার, ডিউটি দিতে ওরও ভাল লাগছে না।

আমার ঘাড়ে হাত রেখে ছোটমামা একতলায় নেমে এলেন। একটা কথাও বললেন না তিনি। তাঁর হাতের স্পর্শ থেকে আমি অনুভব করলুম, ছুঃখভোগই যে জীবনের নিয়ম, তা তিনি বেশ ভাল ক'রেই বুঝতে পেরেছেন। তাঁর স্পর্শের মধ্যে প্রাণ ছিল না।

সাজ-পোশাক-পরা ড্রাইভার এসে গাড়ির দরজা খুলে দিল। ছোটমামা বললেন, 'চল্ আমার সঙ্গে।'

'না মামা, এখান থেকে ট্রামে যেতে আমার মাত্র ছ পয়সা লাগবে।'

'অনেক দিন ট্রামে চাপি নি। ক পয়সায় কত দূর যাওয়া যায় তা আমি জানি না। তোর সাহচর্য আজ আমার ভাল লাগছে, জয়া।'

'কিন্তু আমার ভাল লাগছে কি না তা তো একবারও জিজ্ঞাসা করছ না?'

জবাব দিলেন না ছোটমামা, চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর খুব শ্রান্ত এবং ক্লান্ত সুরে বললেন, 'প্রতিশোধ নেওয়ার আরও অনেক সুযোগ আসবে।'

কোন কথা না ব'লে আমি গাড়িতে উঠে বসলুম।

আলিপুরের দিকে গাড়িটা যাচ্ছিল। সেন্ট্রাল জেলের পাশ দিয়ে আমরা যখন ঢালুর দিকে যাচ্ছিলুম, ছোটমামা তখন চকিতের মধ্যে সেই দিকে একবার দৃষ্টি দিয়ে বললেন, 'নন্তু যে বড়দার ছেলে সে খবর আমি পেলুম রায় দেবার দু'দিন আগে। কেমন আছে সে? কোথায় আছে?'

'আন্দামানে। কেমন আছে তা আমরা কেউ খবর রাখি না।'

'দাদা?' আমার দিকে কাত হয়ে ব'সে প্রশ্ন করলেন, 'দাদা কেমন আছেন?'

'ভাল নেই। চোখে খুব কম দেখেন।'

'সেই জন্যেই তাঁর নতুন গবেষণার কোন লেখা আজকাল আর কাগজে দেখতে পাই না। চোখের কোন চিকিৎসা হয় নি?'

'হয়েছিল, সারে নি।'

'দিনরাত লেখাপড়া নিয়ে থাকলে চোখের আর দোষ কি!'

'বোধ হয় লেখাপড়া ছাড়াও অন্য একটা কারণ আছে।'

'কি?'

'আমার মনে হয় বড়মামা রাত্রে ঘুমোন না।'

'কেন?'

'বোধ হয় তিনি সারা রাত ব'সে নন্তুদার কথা ভাবেন।'

বেকার রোডের কোন একটা জায়গায় এসে গাড়িটা থামল। গাড়ির হর্ন বাজাল ড্রাইভার। ভেতর থেকে একজন গুর্খা গার্ড ফটকটা খুলে দিল। আমরা ভেতরে এলুম।

ছোটমামা বললেন, 'আয়।'

কাঠের সিঁড়ি দিয়ে আমরা উঠে এলুম। ল্যাণ্ডিংয়ের ডান পাশে দেখলুম একটা অয়েল-পেন্টিং রয়েছে। ছোটমামা বললেন, 'শিল্পী অতুল বোসের আঁকা সুনন্দার ছবি। সুনন্দা তোর মামীমার নাম। আর ওই ছবিটা হচ্ছে অমিতের।'

'মামীমা কোথায়?'

'এদিকের হাওয়া গরম হয়ে উঠেছে ব'লে তিনি কোন্ একটা পাহাড়ে গিয়ে যেন আশ্রয় নিয়েছেন।'

'অমিতদা কি এখনও বিলেত থেকে ফেরে নি?'

'না।'

আমরা লাইব্রেরি-ঘরে এসে বসলুম। বসবার একটু পরেই বেয়ারা এসে দু গেলাস ঠাণ্ডা কমলালেবুর রস রেখে দিয়ে গেল সেণ্টার টেবিলের ওপর। আমি ভাবলুম, পারিবারিক আলোচনাটা এবার বন্ধ হওয়াই ভাল। একটা বড় শেল্‌ফের কাছে গিয়ে আমি বইগুলোর নাম পড়তে লাগলুম। একটু পরেই মামা জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোর বাবার খবর কিছু রাখিস?'

'তিনি মারা গেছেন।'

কমলালেবুর রস খেলেন ছোটমামা। আমি খাচ্ছিলুম না ব'লে তিনি বললেন, 'আমার বাড়িতে বোধ হয় জল খাওয়াও পাপ।'

'না, পাপ করা খুব সহজ নয়। পাপ সম্বন্ধেও আমি কিছু কিছু বই পড়েছি। রসটুকু খেয়ে নিচ্ছি।'

'বহুদিন পরে একটা সকাল আমার ভাল কাটছে। তুই একটু ব'স্, আমি আসছি।'

'মামা, আমি কিন্তু একটু পরেই বাড়ি ফিরব। দুপুরের খাওয়ার বন্দোবস্ত কিছু ক'রো না। তা ছাড়া বড়মামা আমার জন্যে ভাববেন খুব।'

'আমি লোক পাঠিয়ে খবর দিয়ে দিচ্ছি। জয়া, আজকে মস্ত বড় সুযোগ এসেছে আমার। দাদার কাছে আমার লোক আজ প্রথম যাবে। তুই ব'স্, আমি আসছি।'

ছোটমামা চ'লে গেলেন। আমি দেখলুম, তাঁর চোখে মুখে হঠাৎ যেন স্বাস্থ্য ফিরে এসেছে। তোবড়ানো গালের চামড়ার ভাঁজ সব মসৃণ হচ্ছে ক্রমে ক্রমে। ঘরের মধ্যে হেঁটে বেড়াতে লাগলুম আমি।

বড়মামার লাইব্রেরির মত এই ঘরখানা সাজানো-গোছানো নয়। চারদিকে খানিকটা অবহেলার চিহ্ন রয়েছে। যে বইগুলো পড়বার জন্যে শেল্ফ থেকে বার ক'রে এনেছিলেন মামা, সেগুলো সব প'ড়ে রয়েছে মেঝের ওপর। আমি বইগুলো সব গুছিয়ে রাখলুম। এখানে এসে কাজ করতে ভাল লাগছে আমার।

বড় বড় জানলার ওপর থেকে পর্দা ঝুলছে। সবগুলো পর্দা এক রংয়ের কিংবা এক ডিজাইনের নয়। মামীমা নিশ্চয়ই এখানে আসেন না। এলে, জানলাগুলোর ওপর এমন বিশৃঙ্খলতা তিনি সহ্য করতেন না। এক ঘণ্টার মধ্যেই মামীমার একটা ছবি আমার চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠল। মামার সঙ্গে যে তাঁর সম্পর্ক শিথিল হয়ে এসেছে, তা আমি বুঝতে পারলুম অতি অনায়াসেই।

শেল্ফগুলোর মাঝামাঝি জায়গায় একটা ক'রে ইলেকট্রিক আলো জ্বলছে। সিলিংয়ের গা থেকে লম্বা তার নেমে এসেছে—সেই সব তারের মুখেই বালব বাঁধা আছে। আমি দেখলুম, তার এবং বাল্ব-গুলোর গায়ে ময়লা জমেছে প্রচুর। আলোর রঙ তাই একটু হলদে হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে শেল্ফগুলোর ওপর।

কি বই পড়েন ছোটমামা? এক নম্বর শেল্ফ থেকেই বই সব দেখতে লাগলুম আমি। দর্শন এবং ইতিহাসের বইই প্রায় সব। কিন্তু লেখকদের নামগুলো সব আমার মনঃপূত হ'ল না। কোন এক জায়গায় এসে মামা রাস্তা হারিয়ে ফেলেছেন।

মামা এলেন। জিজ্ঞাসা করলেন আমায়, 'টয়েনবির লেখা কিছু পড়েছিস ?'

'সামান্য।'

আমার কথা শুনে মামা যেন চমকে উঠলেন। সুরের মধ্যে শক্তি এনে তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেন ? ইয়োরোপ-আমেরিকায় খুব নাম হচ্ছে তাঁর। তোর কি তাঁর লেখা ভাল লাগে না ?'

'না।'

'কেন ?'

'তত্ত্বের দিক থেকে টয়েনবির লেখার তেমন কোন মূল্য নেই। পরে তিনি কি লিখবেন জানি না, এখন অন্তত কিছু নেই। মামা, তোমার শেল্‌ফে বড্ড ধুলো জমেছে।'

'কোন্ শেল্‌ফে ?'

'ইতিহাস এবং দর্শনের, দুটো শেল্‌ফেই।'

আমার কথা শুনে ছোটমামা হাসবার চেষ্টা করলেন। মলিন হাসি। উল্টো মন্তব্য প্রকাশ করবার প্রয়াস তাতে ছিল না। আমি খুশী হলুম। আমরা গরিব ছিলুম ব'লে ছোটমামা আমাদের সম্পর্ক কোনদিনই স্বীকার ক'রে নেন নি। আজ কিন্তু আমাকে অজ্ঞ ব'লে অবহেলা করতে পারলেন না। বোধ হয় সেই জন্যেই তাঁর প্রতি আমার বিরূপ মনোভাব ক্রমে ক্রমে কেটে যেতে লাগল। আমার সঙ্গে যুদ্ধ করবার মত একটা অস্ত্রও তাঁর আজ শক্ত নয়। সংসারকে আমি আবার নতুন চোখ দিয়ে দেখবার চেষ্টা করতে লাগলুম। ভবতোষের কথা ভুলে থাকবার জন্যে নতুন বন্ধু এবং পুরনো আত্মীয়দের খুঁজে বার করার কাজ নিয়ে মেতে থাকাটা আমার পক্ষে স্বাভাবিকই হ'ল।

ছোটমামা বললেন, 'দাদার কাছে খবর পাঠিয়েছিলুম। আমার কেরানীবাবু গিয়েছিলেন তাঁর কাছে।'

'কি বললেন তিনি ?'

'চোখ দিয়ে দেখতে পান না ব'লে আমার চিঠিখানা নাকি দাদা হাতের মুঠোতে নিয়ে বার বার ক'রে চেপে ধরছিলেন। তুই আমায় ক্ষমা না করলে তিনি দরজা খুলতেন না আজ। আয় আমার সঙ্গে, জয়া।'

ল্যাণ্ডিংয়ের ডান পাশ দিয়ে আমি চললুম ছোটমামার পেছনে পেছনে। পেছন দিকের একটা ঘরে ঢুকে তিনি বললেন, 'ওই দিকে স্নানঘর। আমি নিজে হাতে আলমারি থেকে তোয়ালে আর সাবান বার ক'রে দিয়েছি। জয়া, কেরানীবাবুকে দিয়ে তোর জন্যে একটা শাড়ি কিনে আনালুম। দেখ্ তো পছন্দ হয় কি না!'—মামা একটা প্যাকেট থেকে সত্যিই একখানা শাড়ি বার করলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'এ সব কেন করতে গেলে, মামা?'

'আমি জানি, তোর মামীমার শাড়ি তুই ব্যবহার করতে চাইতিস না। অত দামী দামী শাড়ি দার্শনিকেরা পরেও না।'

স্নানের পরেই খেতে বসলুম। বিলিতী কায়দাকানুনের সঙ্গে এই আমার প্রথম পরিচয়। সুন্দরভাবে টেবিলটা সাজিয়ে দিয়েছে ছোটমামার মুসলমান বেয়ারা। টেবিলের মাঝখানে একটা ফুলদানিও আছে। টাটকা ফুলের গুচ্ছ থেকে হালকা গন্ধ ভেসে আসছিল।

ছোটমামা বললেন, 'কাঁটা-চামচে দিয়ে খেতে অসুবিধে হ'লে হাত দিয়েও খেতে পারিস। তোর মামীমা যখন এখানে উপস্থিত নেই, তখন নিয়ম ভাঙলে কোন অপরাধ হবে না।'

'না মামা, আমি তোমার মত ক'রেই খাব। তোমার কাছ থেকে আজ সব নিয়মকানুন শিখে নেব। কিছু না শিখে তোমার বাড়ি থেকে চ'লে যাওয়া উচিত হবে না। তুমি খেতে শুরু কর, আমি তোমায় দেখে দেখে শিখি।'

খাওয়া শেষ হবার একটু আগে মামা জিজ্ঞাসা করলেন, 'মিসেস গুপ্তকে চিনিস?'

'চিনি।'

'তাঁর স্বামী কে? কোথায় থাকেন?'

পুডিংয়ের শেষটুকু খেয়ে নিয়ে বললুম, 'তাঁর স্বামীর নাম বিমল গুপ্ত, ব্যারিস্টার। ঝরনা জন্মাবার পরে তিনি মিসেস গুপ্তকে ত্যাগ করেন। ত্যাগ করবার কারণটা আমি জানি না। কিছুদিনের মধ্যে মিস্টার গুপ্ত আবার বিয়ে করেন একজন ব্রাহ্ম-মহিলাকে। বোধ হয় বছর পাঁচ তাঁরা একসঙ্গেই ছিলেন। তারপর আবার তাঁদের মধ্যেও ভাঙন আসে। ব্রাহ্ম-মহিলাটি বিলিতী বাজনা শেখবার জন্যে চ'লে যান ইয়োরোপে। সঙ্গে তাঁর দ্বিতীয় স্বামী ছিলেন—একজন বুড়ো মুসলমান নবাব। মিস্টার গুপ্ত আবার বিয়ে করলেন। তৃতীয় বউটি হ'ল একজন ডাক্তারের পরিত্যক্তা স্ত্রী। ঝরনার কাছেই শোনা ইতিহাস।'

টুথ-পিক দিয়ে দাঁত পরিষ্কার করতে লাগলুম আমি। ছোটমামা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন গল্প শোনবার জন্যে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তারপর কি হ'ল?'

'এখন তো অনেকগুলো চরিত্র এসে গেল। কার গল্প শুনতে চাইছ, মামা?'

'মিস্টার গুপ্তর। নবাবপত্নীর খবর জেনে আমাদের আর লাভ নেই। আমাদের ধর্ম থেকে বেরিয়ে যাওয়া মানে আমাদের সমাজ থেকেও বেরিয়ে যাওয়া।'

'কিংবা যার ধর্মবোধ নেই, তার পক্ষে মুসলমান অথবা খ্রীষ্টান হওয়া খুব একটা আশ্চর্যের ব্যাপার নয়। পরে আর বিশেষ কিছু গল্প নেই। বিলেত যাওয়ার আগে ঝরনা একদিন বলছিল যে, মিস্টার গুপ্ত মদ খেতে লাগলেন প্রচুর পরিমাণে। রূপো দিয়ে তিনি একটা চৌবাচ্চা তৈরি ক'রে নিয়েছিলেন। সন্ধ্যের সময় মদ দিয়ে চৌবাচ্চাটা ভর্তি ক'রে নিতেন। চৌবাচ্চায় দুটো তিনটে নল লাগানো থাকত। সন্ধ্যে

থেকে মিস্টার গুপ্ত বন্ধুদের নিয়ে নল দিয়ে টেনে টেনে মদ খেতেন প্রায় মাঝরাত পর্যন্ত। ঝরনার কাছে শুনেছি, মাঝে মাঝে তাঁদের মধ্যে প্রতিযোগিতা হ'ত। গোলাপফুলের ছেঁড়া পাপড়ি ফেলে দিতেন চৌবাচ্চায়। নল দিয়ে টেনে যিনি পাপড়িটা মুখ পর্যন্ত আনতে পারবেন তিনি জিতবেন। মিস্টার গুপ্তর কাছে সবাই নাকি হেরে যেতেন। মামা, তুমি কি ঘুমিয়ে পড়লে নাকি ?'

'না, শুনছি। মনোযোগ দিয়ে শুনছি। তারপর কি হ'ল ?'

'তোমার বেয়ারা বোধ হয় অপেক্ষা করছে, লাইব্রেরিতে গিয়ে বসলে ভাল হ'ত না ?'

'হ্যাঁ, তাই চল্।'

লাইব্রেরি-ঘরের দিকেই যাচ্ছিলুম আমরা। মাঝখানে দাঁড়িয়ে গেলেন ছোটমামা। বললেন, 'সামনের ওই ঘরটা সুনন্দার ড্রয়িং-রূম।' আমরা ঢুকলুম। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঝকঝক করছে ঘরখানা। মস্ত বড় হল্-ঘর। ছোটমামা বললেন, 'ঘরটা বড় না হ'লে সুনন্দার অসুবিধে হ'ত। দুটো পিয়ানো রাখবার জন্যে জায়গার দরকার ছিল', ডান দিকে আঙুল তুলে তিনিই বলতে লাগলেন, 'এটা গ্র্যাণ্ড পিয়ানো, ওটা কটেজ। ওইখানে দুটো বেহালাও রাখতে হয়েছে সাজিয়ে।'

জিজ্ঞাসা করলুম আমি, 'মামীমা বুঝি গান-বাজনা ভাল জানেন ?'

চশমার কাচ পরিষ্কার করতে করতে তিনি জবাব দিলেন, 'বাজনাগুলো সত্যিই বাজে কি না আমি তা বলতে পারব না। কোনদিনই শুনি নি। সুনন্দার সব অদ্ভুত অদ্ভুত অভ্যাস আছে। সে নানা রকমের বিলেতী গান-বাজনার ইস্কুলের ছাত্রী। পার্ক স্ট্রীটের মিস নাহাপিটের কাছে সে পিয়ানো শেখে সোমবার আর শনিবার। ওয়েলেস্‌লির মিস ম্যাডানের ইস্কুলে যায় বুধবার আর রবিবার। বেহালা শিখতে আরও সব কোথায় কোথায় যায়। সুনন্দার মত পয়লা তারিখে এমন নিয়মিত ভাবে মাইনে দেওয়ার অভ্যাস আর কারো নেই। এত বড়

একটা গুণের জন্যে তোর মামীমা সব জায়গাতেই খুব পপুলার। সুনন্দার কত বয়স হ'ল জানিস ? পঁয়তাল্লিশ।'

'তা হ'লে কি তাঁর গান-বাজনার দিকে ঝোঁক নেই ?'

লাইব্রেরিতে এসে ছোটমামা বললেন, 'না। কেবল ঝোঁক থাকলেই এসব জিনিস হয় না। প্রতিভার দরকার হয়।'

'তবে তিনি এত পয়সা নষ্ট করছেন কেন ?'

'সময় কাটাবার জন্যে। কিছু করবার নেই। এমন কি নিউ এম্পায়ারে যে মাঝে মাঝে বিলিতী বাজনার জলসা হয় তাতেও সুনন্দা যোগ দেয় না। কিন্তু টিকিট কাটে। সবচেয়ে বেশী দামের টিকিট। কেবল টিকিট কেটেই সে শান্ত হয় না, সুনন্দা তার সমাজের সবাইকে টিকিটগুলো কায়দা ক'রে দেখিয়েও আসে। বিলেতে গিয়ে অমিত একটা কাণ্ড ক'রে না বসলে, সারা জীবনেও সে সমস্যা কিংবা দুশ্চিন্তা—কথা দুটোর মানে জানতে পারত না। নিউ মার্কেট থেকে কোন জিনিস কিনলে সুনন্দা আগে দামের কথা উল্লেখ ক'রে তারপরে সে জিনিসটা দেখায়। আশ্চর্য হচ্ছিস, না জয়া ?'

'হ্যাঁ। তোমার সঙ্গে আজ প্রথম পরিচয়, অথচ—'

শেষ করতে দিলেন না কথাটা, তিনি তার আগেই বললেন, 'জয়া, বড্ড একা প'ড়ে গেছি। সুনন্দা গেছে উটকামণ্ডের পাহাড়ে—সঙ্গে গেছেন মিস্টার গুপ্ত।'

'মামা!'

'হ্যাঁ, জয়া। বিলেত গিয়ে সুনন্দার সঙ্গে পরিচয় হয় মিস্টার গুপ্তর। এক জাহাজেই ওরা এসেছে। মিস্টার গুপ্তর মধ্যে কি আছে আমি জানি না।'

আমি দেখলুম, ছোটমামার হাত দুটো কাঁপছে। টেবিলের ওপর থেকে সেই ভাঁজ-করা প্রবন্ধটা ধরতে যাচ্ছিলেন। তারপর তিনিই

আবার কাগজগুলো রেখে দিয়ে বললেন, 'না থাক্, আজ আর শঙ্করাচার্য নয়। আজ তোর সঙ্গে কেবল কথাই বলব।'

আমার কিছু বলবার ছিল না। শেল্ফের দিকে চেয়ে রইলুম অনেকক্ষণ পর্যন্ত। বইগুলোর মধ্যে ফিরে যেতে পারলে যেন বেঁচে যেতুম। এত বই লেখা হ'ল, এত কথা বলা হ'ল, তবুও যেন পৃথিবীটা আজও সভ্য হয়ে উঠতে পারল না। কী কদর্য এর রূপ, কী জটিল এর অর্থ! পশ্চিম দিকের জানলার ফাঁক দিয়ে দেখলুম, বাইরে আর আলো নেই। অন্ধকার নেমে এসেছে কলকাতার আকাশে। এমন কি অপূর্ব মিত্রের মত জাঁদরেল আই. সি. এস.ও এ অন্ধকার ঠেকিয়ে রাখতে পারলেন না। আমি বললুম, 'আজ তা হ'লে যাই।'

ঘর থেকে বেরিয়ে আসবার সময় দেখলুম, ছোটমামার কপালে কালো সুতোর মত দু-তিনটে রেখা অসহ্য যন্ত্রণায় ওপর দিকে ভেসে উঠেছে।

রত্না, তোর নিশ্চয়ই মনে আছে, প্রথম দিন তুই আমার ক্লাসে এলি না। ক্লাসে ঢুকে তোকেই আমি খুঁজছিলুম। পড়া শেষ হওয়ার আগে মেয়েদের জিজ্ঞাসা করেছিলুম, 'রত্না আসে নি কেন? অসুখ-টসুখ করল নাকি?' কে একটি মেয়ে জবাব দিয়েছিল, 'না। সে ক্লাসের বাইরে পায়চারি ক'রে বেড়াচ্ছে।'

'কেন?'

প্রায় প্রত্যেকটি মেয়ের মুখেই দেখলুম চাপা হাসি, জবাব কেউ দিল না। বুঝলুম, আমাকে তোর পছন্দ হয় নি। আমাকে অপমান করবার জন্যে সুযোগ খুঁজে বেড়াতে লাগলি তুই। কলেজের দিনগুলো ক্রমশই আমার কাছে অসহ্য হয়ে উঠছে। দু তিন মাসের মধ্যে আমি হাঁপিয়ে উঠলুম। কলেজ থেকে তোকে বার ক'রে দিতে না পারলে আমি বোধ হয় আর এখানে কাজ করতে পারব না।

শেষ পর্যন্ত তোর সঙ্গে আমি পেরে উঠি নি। গায়ে প'ড়ে তোর সঙ্গে আমার ভাব করতে হ'ল। তোকে আমি আমার বন্ধু ক'রে নিলুম। তুই বোধ হয় প্রথমটায় ভেবেছিলি, তোর রূপ আর নৃত্যশিল্প আমায় আকর্ষণ করেছে। কিন্তু সে ভুল ভাঙতে তোর বেশীদিন সময় লাগে নি।

আজ এতগুলো বছর পরে সেদিনের প্রতিটি ঘটনা আমার স্পষ্ট মনে পড়ছে। ট্যাক্সিতে ক'রে তুই আমায় নিয়ে যেতিস বড় বড় হোটেলে চা খাওয়াতে। দু ঘণ্টা আড়াই ঘণ্টা ব'সে ব'সে তোর জীবনের ইতিহাস শুনতুম আমি—প্রেমের ইতিহাস। তোর প্রেমের ইতিহাস শুনতে আমি কোনদিনই আপত্তি করি নি। একদিন তুই বললি, 'জয়াদি, আমি আর সামলাতে পারছি না। আমার চারদিকে প্রেমিকদের ভিড় কেবল বেড়েই যাচ্ছে।'

কথাটা শেষ ক'রে তুই এলিয়ে পড়লি চেয়ারের গায়ে। তৃপ্তির নিশ্বাস নিচ্ছিস তুই। খুশিতে মন তোর ভ'রে উঠল। আমি বুঝতে পারলুম, পুরুষমানুষদের ভিড়ের জন্যেই তুই কেবল খুশী হলি না, আমার চারদিকের নির্জনতা লক্ষ্য ক'রে আত্মগর্বে চোখ বুজলি তুই।

হঠাৎ এক সময়ে প্রশ্ন করলি তুই, 'তুমি কাউকে ভালবাস নি, জয়াদি?'

'না।' ভবতোষের নামটা মনে পড়ল ব'লে আবার আমি বললুম, 'আমার কি আছে যে, পুরুষমানুষেরা আমায় ভালবাসবে? তা ছাড়া তোর 'প্রেমের প্রতিশোধ' নাচ দেখবার পরে পুরুষমানুষকে ভয় পাচ্ছি খুব।'

'ঠাট্টা করছ, জয়াদি?'

'না,' কথা খোঁজবার জন্যে ভাবতে হ'ল, তারপর আবার বলতে লাগলুম, 'একটু নির্জন পরিসরে দুটি জীবন মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়েছে। কখন কেমন ক'রে যে মুহূর্তটা শিল্প-মুখর হয়ে উঠল ওরা তা টের

পায় নি। টের পাওয়ার আগেই শিল্পের সৃষ্টি হয়, রত্না। সেই নির্জন-পরিসরটুকুর মধ্যে ঠাট্টা নেই, আছে প্রেম। দৃষ্টির সামনে ওদের বিরাট ব্যাপ্তি, নির্মল আনন্দলোক, নিবিড় প্রশান্তি। দুটি জীবনের মাঝখানে আদানপ্রদানের প্রশস্ত পথ তৈরি হচ্ছে। ভিড় সেখানে পথ ভেঙে দিতে চাইবে—ভিড়ের মধ্যে থাকে বিস্ফোরণের ভয়। প্রেমের শিল্প জীবনের সবচেয়ে বড় শিল্প। তার উপাদান আর যাই হোক না কেন, ঠাট্টার উপাদান তাতে নেই।'

আমরা নেমে এলুম বড় হোটেলের দোতলা থেকে।

রত্না, সেদিনের সন্ধ্যেটা আজ কত দূরে মনে হয়।"

॥ দ্বাদশ রাত্রি ॥

"কলেজে যাওয়ার পথে রোজই বড়মামার সঙ্গে দেখা ক'রে যাই। অলিখিত আইনের মত এটা আমার কাছে এত বেশী স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে যে, নিয়মটাকে ভাঙতে আমি সত্যিই ভয় পাই। তাঁর সঙ্গে কেবল দেখা ক'রে যাই না, তাঁর পায়ের ধুলোও নিই।

আজও এলুম তাঁর কাছে। আরাম-কেদারায় শুয়ে সিলিংয়ের দিকে মুখ ক'রে কি যেন ভাবছিলেন তিনি। পায়ে তাঁর হাত ছোঁয়াতেই মামা বললেন, 'নাগার্জুনের কথা ভাবছিলুম। বৌদ্ধধর্মের ফাঁকগুলো বন্ধ করবার জন্যে তিনি কম চেষ্টা করেন নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও নাগার্জুনের মধ্যেও একটা সার্বিক শূন্যতা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি—একে আমি নিহিলিজম বলতে চাই, জয়া।'

'তোমার পায়ের ধুলো দাও। বারোটা পঁচিশে আমার ক্লাস আছে।'

'কখন ফিরবি?'

'বোধ হয় তিনটেতে। ছোটমামার কাছে যাওয়ার কথা আছে। তা ছাড়া নাগার্জুনের ডায়লেকটিকস আমার ভালও লাগে না। আমি এবার চলি।'

'বউমা কি ফিরে এসেছেন?'

'কোন্ বউমা? মিসেস গুপ্তের মেয়ে ঝরনা মিত্র, না, মামীমার কথা জিজ্ঞাসা করছ?'

'অপূর্বর বউ।'

'না, তিনি এখনও ফেরেন নি। ছোটমামা বৌদ্ধধর্মকে ধর্ম ব'লে স্বীকার করেন না বটে, কিন্তু তাঁর জীবনের শূন্যতা ক্রমশই সর্বগ্রাসী হয়ে উঠছে।'

'তা হ'লে অপূর্বর ওখান থেকেই ঘুরে আসিস। তুই গেলে ওর

শূন্যতা খানিকটা ভরাট হয়ে যাবে। হ্যাঁ রে জয়া, একটু আগেই নামীনাথের গলা শুনছিলুম। সে বলছিল, বিলেতের চিঠি এসেছে। ভবতোষের চিঠি এসেছে, না?'

'হ্যাঁ।'

'কি লিখেছে?'

'এখনও পড়ি নি। ছোটমামার বাড়ি থেকে ঘুরে এসে পড়ব। তাড়াতাড়ির কিছু নেই।'

'এই বয়সেই মেয়েদের সব চেয়ে বেশী তাড়াতাড়ি থাকে। তোর ঠিক উল্টো।'

'আমাকে ছেড়ে দাও মামা, সময় নেই।'

'বেশ তো, যা। একটু শোন্, এবার বোধ হয় ভবতোষ অনেক দিন পরে চিঠি লিখল?'

'না, অনেক দিন কোথায়! মাত্র দু মাস হবে।'

আমার কথা শুনে বড়মামা সোজা হয়ে উঠে বসলেন। হেঁটে এলেন টেবিলের কাছে। হাত দিয়ে কি যেন খোঁজাখুঁজি করতে লাগলেন। চোখে খুব কম দেখেন ব'লে কুঁজো হয়ে মুখটা নামিয়ে নিয়ে এলেন টেবিলের দু ইঞ্চি ওপরে। একটা বাঁধানো খাতা আমার দিকে এগিয়ে ধ'রে বললেন, 'ডায়ারি থেকে ডিসেম্বর মাসের পাতাটা বার কর্।'

আমি বার করলুম। তিনি বললেন, 'চোদ্দ তারিখে কি লেখা আছে? ওই তারিখে ভবতোষের শেষ চিঠি এসেছিল। আজ ঠিক চার মাস তেরো দিন হ'ল।'

ডায়ারিখানা টেবিলের ওপর রেখে দিয়ে আমি চ'লে এলুম ঘর থেকে। কলেজে পৌঁছতে আজ সত্যিই দেরি হয়ে গেল।

চিঠিখানা সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসেছিলাম। কলেজ শেষ হওয়ার পরে জায়গা খুঁজতে লাগলাম চিঠিখানা পড়বার জন্যে। স্টাফ-রুমে ব'সেই

খামখানা বার করলুম। ইতিহাসের দীপ্তিদি আর ইংরেজীর বেলাদি দুজনে এক দিকের কোণায় ব'সে পোনামাছের বাজারদর নিয়ে তর্ক করছিলেন। এই সুযোগে আমি চিঠি পড়তে আরম্ভ করলাম। ভবতোষ লিখেছে : চিঠি লিখতে আমার দেরি হ'ল। আশা করি ক্ষমা করবে। তোমার কাছ থেকেও জবাব খুব তাড়াতাড়ি পাই না। মনে হয় কলেজ নিয়ে খুব ব্যস্ত আছে। আমার ফাইনাল পরীক্ষা এ বছরের শেষের দিকেই হবে। সেই জন্যে খাটছি খুব। ইংল্যাণ্ডে এসেও এ-দেশের কোন কিছু দেখতে পারলুম না।

মিসেস ঝরনা মিত্রকে আবার দেখবার সৌভাগ্য আমার হ'ল। ভারতবর্ষে তার এ রূপ দেখা সম্ভব হ'ত না। এমন কি চৌরঙ্গীর বড় হোটেলেও এমন বিস্ময় দেখা যায় না।

সে আবার একদিন এসে আমাদের এখানে উপস্থিত হ'ল। তুমি বোধ হয় জান না যে, মিস্টার বিমল গুপ্ত—ঝরনার বাবা বিলেতে এসেছিলেন। অমিতের মা এখানে আসবার কিছুদিন আগেই তিনি এসেছিলেন। অমিতের মার সঙ্গে মিস্টার গুপ্তের পরিচয় হতে বেশীদিন সময় লাগে নি। পরিচয় গভীর হতে আমরা তো দেখলুম মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা লাগল।

এঁরা দুজনে মিলে অমিতের সঙ্গে ঝরনার বিয়ে দিলেন খুব ঘটা ক'রে। এ দেশের ব্যাঙ্কে শুনলুম অমিতের নামে অনেক টাকা জমা রেখে গেছেন তার মা। বিচারক অপূর্ব মিত্র নন্তুর বিচারের সময় নিশ্চয়ই জানতেন না যে, তাঁর ছেলের ভাবী বউ ঝরনা নন্তুকে ভালবাসত। আমি যেন দেখতে পাচ্ছি, বিচারক অপূর্ব মিত্র আসামীর কাঠগড়াতে দাঁড়িয়ে আছেন আর বিচারকের আসনে ব'সে আছে নন্তু। অপূর্ব মিত্রের বিরুদ্ধ পক্ষ হচ্ছে ঝরনা। ভাগ্যের পরিহাস ছাড়া একে তুমি কি বলবে ?

ঝরনা সেদিন এসেছিল আমার কাছে। অনেকটা সময় নষ্ট ক'রে

গেছে আমার। ঝরনা অমিতকে দিয়ে তার নিজের বিরুদ্ধেই বিবাহ-বিচ্ছেদের মকদ্দমা আনাতে চাইছে। এ দেশে বিবাহবিচ্ছেদের আইনকানুনের মধ্যে কোন জটিলতা নেই। অবিশ্যি রোমান ক্যাথলিক-দের যে বিবাহবিচ্ছেদ হয় না তা তুমি নিশ্চয়ই জান।

বিয়ের পরে অমিত লেখাপড়ার দিকে খুবই মনোযোগ দিয়েছিল। ঝরনার তাতে কোন আপত্তি ওঠে নি। কিন্তু বিয়ের পরে ছ মাস না পেরুতেই ঝরনার নাকি হঠাৎ নন্তুর কথা বার বার ক'রে মনে পড়তে লাগল। এক শয্যায় শুয়ে অমিতকে সে ঠকাতে চায় নি। অমিতের সামনেই সে নন্তুর নাম ক'রে কেঁদে কেঁদে ল্যাঙ্কেশায়ারে-প্রস্তুত ভাল ভাল বিছানার চাদর চোখের জলে ভিজিয়ে ফেলতে লাগল। নন্তুকে সে কিছুতেই ভুলতে পারছে না। অমিতের কাছে সে সবিনয়ে বিবাহ-বিচ্ছেদের অনুমতি চাইল। ঝরনা পাপ করতে রাজী আছে, কিন্তু দুর্নীতিকে সে কিছুতেই প্রশ্রয় দিতে পারে না। বিবাহবিচ্ছেদের অনুমতি চাওয়ার আগে ঝরনা অমিতের সব টাকা নিজের নামে ব্যাঙ্কে সরিয়ে রেখেছে।

ঝরনা এসেছিল আমার কাছে সাহায্য চাইতে। বিবাহবিচ্ছেদটা সে অমিতকে দিয়েই করাতে চায়। অমিতের চরিত্রে সে দাগ কাটতে দেবে না। ঝরনা বলেছিল—ভবতোষ, আমি যে খারাপ তা প্রমাণ করবার জন্যে অমিত একজন লোক পাচ্ছে না। আমি একা একা তো খারাপ হতে পারি না, একজন পুরুষ আসামী চাই। তোমার নাম-ঠিকানা আমি ওকে দিয়ে এসেছি।

আমাকে কেন ?

তুমি পুরুষ ব'লে। আমি আজ এখানে থাকব, ভবতোষ। তোমার ঘরের বাইরে একজন সাক্ষী আমি লুকিয়ে রেখেছি।

এসব কি বলছ, ঝরনা ?

অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গেই বলছি যে, এ দেশটা পর্যন্ত সভ্য হয় নি।

সাক্ষী-সাবুদ ছাড়া স্ত্রীপুরুষ আলাদাও হতে পারে না। পৃথিবীর-সংক্ষিপ্ত-ইতিহাস লেখক এইচ. জি. ওয়েলসের নাম শুনেছ?

শুনেছি।

তিনি স্ত্রীলোকের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্যে কোন আইন মানেন নি। রেবেকা ওয়েস্টের নাম জান, ভবতোষ?

জানি।

তা হ'লেই এবার একের সঙ্গে এক যোগ দিয়ে ফলটা মিলিয়ে নাও। আমায় তুমি সাহায্য কর, ভবতোষ। তুমি যদি সত্যিকারের রোমান ক্যাথলিক হয়ে থাকো, তা হ'লে মানুষের 'আদি পাপ' তোমায় স্বীকার করতেই হবে। যীশু বলেছেন, যারা অপরকে দয়া করে তারা প্রকৃত সুখী, কারণ তাদেরও দয়া করা হবে। বল, এবার কি করবে? —এই ব'লে ঝরনা আমার বিছানার ওপর শুয়ে পড়ল। মুখ থেকে ওর ভুরভুর ক'রে মদের গন্ধ বেরচ্ছিল। আমি আগেই সন্দেহ করেছিলাম যে, অমিতকে ও বাড়ির বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে এসেছে। সাক্ষীর দরকার সত্যিই ওর ছিল না। ঝরনা অমিতের কাছ থেকে স'রে আসতে চায় ব'লে আমার নাম ক'রে নিশ্চয়ই একটা প্রেমের গল্প অমিতকে শুনিয়ে এসেছে। অমিত সেটা আজ নিজের চোখে দেখতে এসেছে। বেচারী অমিত!

আমি বললুম, সন্ধ্যে হয়ে আসছে, এবার তুমি স্বামীর কাছে ফিরে যাও।

স্বামী? স্বামী কোথায়?

বাইরে। আমি গিয়ে ডেকে নিয়ে আসি।—বললুম আমি।

ঝরনা উঠল। দরজার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, আমায় তা হ'লে সাহায্য করতে পারবে না?

না। পরীক্ষা আমার সামনে এসে গিয়েছে, এখানে আর না এলে খুশী হব।

হতাশ হ'ল ঝরনা। এক রকম মরিয়া হয়েই সে বলল, আমি সত্যি সত্যি খারাপ হয়ে গেছি, অমিত নিজের চোখে না দেখলে আমায় ছাড়তে চায় না। কি ক'রে যে অমিত আমায় পছন্দ করল ভেবে আশ্চর্য হয়ে যাই। তুমি নিজে আশ্চর্য হও নি, ভবতোষ? গুড নাইট।—এই ব'লে চ'লে যাচ্ছিল ঝরনা, হঠাৎ আবার সে দাঁড়িয়ে গেল। বাইরের দিকে একবার চেয়ে নিয়ে সে বলল, আমার ব্যাঙ্কে যা এখন পাউণ্ড আছে তা যদি টাকা হ'ত তবে তার পরিমাণ হ'ত পঁচিশ হাজারের কিছু কম। বাই, বাই—

ঝরনার কথা লিখলুম ব'লে তুমি রাগ ক'রো না। আমি জানি ঝরনার ইতিহাস শুনতে তোমার ভাল লাগছে না। কিন্তু আমার ছোটখাটো বিপদের কথা তোমায় না লিখলে আমি নিজেকে অপরাধী মনে করি।

ফাদার হেনরীর গবেষণার কাজ বোধ হয় শেষ হয়ে এল। তিনি চ'লে গেলে আমি একেবারে একা পড়ব। ভাল কথা। তোমাদের বীরেশবাবুর সঙ্গে কিছুদিন আগে দেখা হ'ল। পৃথিবীভ্রমণে বেরিয়েছেন তিনি। প্যারিস হয়ে ভারতবর্ষে ফিরে যাবেন। হয়তো এতদিনে ফিরেও গেছেন। শুনলুম, তিনি নাকি কবিতা লেখেন। বীরেশবাবুকে আমার খুব ভাল লাগল। এমন মানুষটির সঙ্গে তোমার বিয়ে হ'লে জীবনে সুখী হতে পারতে। তিনি কেবল কবি নন, বড়লোকও। তোমাদের হিন্দুসমাজে এমন মানুষের সংখ্যা খুব বেশী নেই। তুমি হয়তো ভাবছ, আমি বিয়ের বাজারের ঘটকের মত কথা বলছি। আমি সত্যিই ঘটক নই, আমি ভবতোষ ঘোষ, রোমান ক্যাথলিক। চার্চের বাইরে আমাদের কোন অস্তিত্ব নেই। চার্চের বাইরে আমরা বিয়েও করতে পারি না। আমাদের ডগমা আছে ব'লেই চার্চও আছে। তোমরা হয়তো মনে কর, চুন সুরকি ইট সিমেণ্ট দিয়ে আমাদের চার্চ তৈরি হয়। কিন্তু চার্চের আসল ব্যাপারটা তোমরা জান না। চার্চ

মানে ইট-সুরকি নয়, চার্চ মানে যীশুখ্রীষ্টের দেহ, যে-দেহের রহস্য মানব-জ্ঞানের অতীত। মিস্‌টিকেল বডি। আমরা প্রত্যেকেই তাই চার্চের অংশ। তোমাদের চার্চ নেই ব'লে তোমরা পকেট অক্সফোর্ড অভিধান থেকে ডগমার অর্থ খোঁজবার চেষ্টা কর। যে-কোন দেশের সংস্কৃতি কিংবা সভ্যতার মেরুদণ্ডই হচ্ছে ধর্ম। শিল্প-সাহিত্যের মধ্যেও গভীরতা আসে না, যদি তার পেছনে ধর্মের অনুপ্রেরণা না থাকে। বীরেশবাবু ভাল কবিতা লেখেন শুনেছি। কিন্তু তাঁর সঙ্গে আলাপ ক'রে বুঝলুম, ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর খুব আগ্রহ নেই। বার্ট্রাণ্ড রাসেলের বই প'ড়ে তিনি 'ধর্ম' কথাটার মানে বোঝবার চেষ্টা করছেন। ইয়োরোপে রাসেলের বই বেশী বিক্রি হয় না। বীরেশবাবুর কাছে শুনলুম, ব্রিটিশ-উপনিবেশ-গুলোতে তাঁর বইয়ের খুব কাটতি।

কলকাতায় থাকতে দেখেছিলাম, তুমি দৈনিক কিংবা সাপ্তাহিক খবরের কাগজ পড় না। তাই তোমায় লিখছি যে, এদিকের খবর খুব খারাপ। আবার একটা মহাযুদ্ধের মেঘ ইয়োরোপের আকাশে জমাট বাঁধছে। পরীক্ষাটা শেষ করতে পারলেই বাঁচি।

অমিতের মা আর ঝরনার বাবা এক জাহাজেই ভারতবর্ষে ফিরে গেছেন। শুনেছি ফেরার মুখে তাঁরা ক'টা দিন সুইট্‌জারল্যাণ্ডের শীত গায়ে লাগিয়ে গেছেন। বিচারক অপূর্ব মিত্রের বিচার হচ্ছে!

চিঠি দিয়ো। ভালবাসা তো নেবেই।

ইতি ভবতোষ

চিঠি পড়া শেষ ক'রে আমি উঠে আসছিলুম। দীপ্তিদি বললেন, 'লুকিয়ে লুকিয়ে কার চিঠি পড়ছিস, জয়া? আমরা এখানে পোনামাছের দর নিয়ে তর্ক ক'রে মরছি—'

মাঝখানে বেলাদি ব'লে উঠলেন, 'তা ভাই কি করব, আমাদের কাছে প্রেমপত্রের চেয়ে পোনামাছেরই দাম বেশী। উনি আবার বরফের মাছ খেতে পারেন না। বরফ ছাড়া মাছ পাওয়া যে কী কষ্ট!'

'তা বললে শুনব কেন?'—দীপ্তিদি একটু জোরে জোরেই বলতে লাগলেন, 'আমার স্বামীর মুখেও বরফের মাছ রোচে না। একটু বেশী দাম দিয়েই আমরা মাছ কিনি।'

আমি এবার জিজ্ঞাসা করলুম, 'আপনাদের ক্লাস নেই, দীপ্তিদি?'

'ওমা, ঘণ্টা পড়ল কখন?' দীপ্তিদি ঘড়িতে সময় দেখে নিয়ে আবার বললেন, 'পাঁচ মিনিট দেরি হয়ে গেল। আজ তো আমার ওয়াটার্লু'র যুদ্ধ সম্বন্ধে লেকচার দিতে হবে। একটা কথা তোমায় জানিয়ে রাখছি, বেলা। সকাল সাতটার মধ্যে বাজারে গিয়ে না পৌঁছলে তাজা মাছ পাওয়া যায় না। আটটার পর থেকে মাছের দাম ক'মে যায়। আমি তো আমার চাকরটাকে ঘুম থেকে তুলেই বাজারে পাঠিয়ে দিই।'

'মেয়েরা বোধ হয় চেঁচামেচি করছে, দীপ্তিদি।'—বললুম আমি। ওয়াটার্লু'র আর্তনাদ বোধ হয় এবার তিনি শুনতে পেলেন। মোটা দেহ নিয়ে কোন রকমে তক্ষুনি তিনি বেরিয়ে গেলেন স্টাফ-রুম থেকে। বেলাদি জবাব দেওয়ার সময় পেলেন না। ব্লুম্‌স্‌বেরি গ্রুপের কথা হঠাৎ তাঁর মনে পড়ল। বেলাদিও ছুটলেন ক্লাসের দিকে।

ছোটমামার ওখানে আজ আর যাওয়ার ইচ্ছে ছিল না। আমি নেমে এলুম নীচে। তোর সঙ্গে দেখা হ'ল। তোর মনে আছে কি রত্না, সেদিন তুই খুব উত্তেজিত হয়ে কার একটা গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে পড়লি আমার সামনে? নেমে বললি—'জয়াদি, চল, চা খাবে। এই গাড়িটা আমি রাত ন'টা পর্যন্ত রেখে দিতে পারব।' এই ব'লে তুই আমায় টানতে টানতে গাড়িতে নিয়ে তুললি। বারান্দা থেকে মেয়েরা সব আমাদের দেখছিল। দেখলেন, প্রিন্সিপ্যাল সুজাতা রায়ও। তোর আজও নিশ্চয়ই মনে পড়ে যে, আমাদের দুজনের মধ্যে এত বেশী ঘনিষ্ঠতা হওয়ার জন্যে কলেজের সবাই অনেক রকমের কথাই বলাবলি করত।

গাড়িতে উঠে প্রথমে তুই আমায় একবার চুমু খেলি। তারপর

আমার কোলে মাথা রেখে শুয়ে রইলি খানিকক্ষণ। গাড়ি তখন পার্ক স্ট্রীট দিয়ে চৌরঙ্গীর দিকে যাচ্ছিল। হঠাৎ এক সময়ে উঠে ব'সে তুই জিজ্ঞাসা করলি, 'আমার এই সাংঘাতিক জীবনটা দিয়ে কি করব?'

'বীর সন্তানের মা হওয়ার জন্যে তোর এই সাংঘাতিক জীবনটার দরকার আছে।'

'কিন্তু আমার এই রূপ, এই সৌন্দর্য তো কোন একটি বিশেষ পুরুষের কাজে লাগবে না। লাগালে আমার পাপ হবে। ভগবান আমায় পাঠিয়েছেন সারা বিশ্বের সামনে নেচে বেড়াবার জন্যে। জয়াদি, আমি নাচতে যাচ্ছি। আমরা প্রথমে ইয়োরোপে যাব। তারপর গোটা মধ্যপ্রাচ্যটাও ঘুরব। আমরা কলকাতা থেকে রওনা হব মঙ্গলবার। আমায় একদিন না দেখলে তুমি বিরহের আগুনে পুড়ে মরতে। এখন? এখন তুমি কি করবে, জয়াদি?'

হোটেলের সামনে গাড়ি থেকে নামবার আগে তুই যেন শেষ বারের মত তোর মাথাটা ফেলে রাখলি আমার বুকের ওপর। বিরহের আগুনে তোর নিজের মাথাটাও যে খুব গরম হয়ে উঠেছিল সেদিন, তা কি তুই আজ অস্বীকার করতে পারিস, রম্ভা?

চা খেয়ে বেরিয়ে আসতে বোধ হয় এক ঘণ্টাই লাগল। চৌরঙ্গী কোর্টের সামনে এসে আমি বললুম, 'এখানেই আমি নামব। যেখানেই থাকিস, চিঠি দিস। তোর চিঠি যদি নিয়মিত না পাই, তা হ'লে মন আমার খুবই খারাপ হয়ে যাবে। ক'মাস থাকবি বাইরে?'

'ছ মাস তো হবেই।'

'ইয়োরোপের অবস্থা ভাল না। যুদ্ধ করবার জন্যে জার্মানি প্রস্তুত হচ্ছে আবার।'

'হিটলারকে যদি আমার নাচ দেখাতে পারি তা হ'লে হয়তো লোকটার মনের আগুন কিছু কমবে। বার্লিনে যাওয়াও আমাদের প্রোগ্রামে আছে। নামছ, জয়াদি?'

'হ্যাঁ। তোর তো কোথায় একটা জরুরী কাজ আছে বললি?'

'এখানে নামছ কেন? এখানে কে থাকে?'

'কবি বীরেশ রায়।'

অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে তুই বললি, 'ড্রাইভার, চলো।'

লিফ্‌টে ক'রে উঠে এলুম চারতলায়। ঘরের বাইরে বীরেশবাবুর নাম লেখা ছিল। এত বড় ম্যানসনটার ভেতর দিকটা খুবই নির্জন মনে হ'ল। একটা লোকেরও মুখ দেখতে পেলুম না। কলরব তো দূরের কথা, পায়ে চলার শব্দ পর্য্যন্ত নেই। এক নতুন ধরনের সভ্যতার চিহ্ন এখানে দেখতে পেলুম আমি।

কলিং-বেলের বোতাম টিপলুম। ভেতরের দিকে আওয়াজ হ'ল। ঘরের দরজা খুলে দিল বীরেশবাবুর বেয়ারা। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'সাহেব নেই?'

'আছেন। আপনি ভেতরে আসুন।'

ভেতরে এসে সে আমার কাছে কার্ড চাইল। আমি বললুম, 'কার্ড নেই। তিনি কি ব্যস্ত আছেন?'

'না। আমি খবর দিচ্ছি।'

বেয়ারাটি চ'লে যাওয়ার পরে বীরেশবাবুকে চেনবার চেষ্টা করতে লাগলুম। বড় কবিদের মত ঘরের কোন জিনিসই অগোছাল নয়। প্রত্যেকটা জিনিসই অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। কবির অসাবধানের হাত লেগে একটা জিনিসও স্থানচ্যুত হয় নি। দেওয়াল সব ফাঁকা। কেবল একটা দেওয়ালেই একটা ফোটো টাঙানো আছে। আমি কাছে গিয়ে ফোটোখানা দেখতে লাগলুম। চিনতে পারলুম না। বীরেশবাবুদের পরিবারের কেউ হবেন ব'লেও মনে হ'ল না। ভদ্রলোকটির চেহারার সঙ্গে জগদীশবাবুদের কোথাও কিছু সাদৃশ্য নেই। ছবিতে একে খুব সুপুরুষ ব'লেই মনে হচ্ছে।

বীরেশবাবু এলেন। হাত তুলে নমস্কার করলেন আমায়। বললেন তিনি, 'বসুন। আপনি এসেছেন ব'লে ভাবতে পারি নি। বেয়ারা—'

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'বেয়ারাকে আবার ডাকছেন কেন?'

'চা খাওয়া যাক। কফি খাবেন না কি? বেয়ারা—'

'জী—'

'চা, চা লে আও। তারপর? কেমন আছেন? অত শুকনো শুকনো লাগছে কেন? এখানে আসতে ভয় পেলেন না?'

'না।'

'আমি তো আজও ব্যাচেলার আছি।'

'তা হোক। আপনি পৃথিবী ঘুরে এলেন, আপনাকে আর ভয় করবার কিছু নেই। কবে ফিরলেন?'

'এই বোধ হয় মাস দুই হবে। ভেবেছিলাম আপনার ওখানে একবার যাব। ডক্টর মিত্র কেমন আছেন?'

'ভাল নেই। চোখে খুব কম দেখেন। নন্তুদার জেল হওয়ার পরে তিনি অবিশ্যি কিছু আর দেখতেও চান না। আপনার বাবার সঙ্গে আমার খুব ভাব হয়ে গেছে। তাঁর সঙ্গে প্রায় এক বছর আগে একবার চন্দননগর গিয়েছিলুম।'

'চন্দননগর! ও, হ্যাঁ, অমিতাভ সেন ভারতবর্ষে আসবে।'

বীরেশবাবু উঠলেন। ফোটোখানার কাছে গিয়ে বললেন, 'এই হচ্ছে অমিতাভ সেন। ফ্রান্সে নতুন শিল্পীদের মধ্যে অমিতাভর নাম হচ্ছে খুব। ওদের বাড়িতেই ছিলুম। প্যারিস থেকে মাইল দশ দূরে সুন্দর একটা ভিলা তৈরি ক'রে গেছেন অমিতাভর বাবা প্রশান্ত সেন। অমিতাভর জন্যেই আমায় ওখানে দিন পনেরো থাকতে হ'ল। ওর চোখ দেখেছেন?'

'দেখলুম।'

'আমি তো ওই চোখ দেখে দুটো কবিতা লিখে ফেলেছি। আরও

লেখবার জন্যে ফোটোখানা সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসেছি। এ দেশে এলে কি যে হবে বলতে পারি না।'

'কেন ?'

'অমিতাভ নষ্ট না হয়ে যায়। মেয়েদের মধ্যে হয়তো একটা আন্দোলন শুরু হয়ে যাবে—কার আগে কে পৌঁছবে অমিতাভর কাছে! মারামারি, ঠেলাঠেলি লেগে যেতে পারে। আমার ভয় কেবল ওর চোখ দুটোর জন্যে। মেয়েরা ওকে নিয়ে যা ইচ্ছে তাই করুক, কেবল চোখ দুটোতে যেন ওর পঙ্কিলতা না আনতে পারে। কবিতা লেখার প্রেরণার জন্যে ওর চোখ দুটোই কেবল আমার দরকার। এই নিন চা খান। আমি তো ভাবছি, কাল একবার দরজীকে ডেকে পাঠাব। ফোটোর ওপরে একটা বোরকা পরিয়ে রাখব। আমার মক্কেলরা এখানে এসে আইনের কথা শুনতে চায় না, কেবল চেয়ে থাকে ওই দিকে। অমিতাভ ক্ষ'য়ে না যায়। এই নিন স্যাণ্ডউইচ—দুটো এক সঙ্গে ক'রে খান। আপনি সংস্কার মানেন নাকি, মিস বোস ?'

'মানি কি না জানি না। তবে না-মানবার কোন সুযোগ আসে নি এখনো।'

'তা হ'লে এগুলো খেয়ে কাজ নেই। বিস্কুট খান। কেক খান। ওতে হ্যাম আছে। অন্য একদিন আপনাকে বাচ্চা মুরগীর সাদা মাংস দিয়ে স্যাণ্ডউইচ খাওয়াব। আপনি ধর্ম মানেন নাকি, মিস বোস ?'

'যদি বলি, মানি ?'

'তা হ'লে চায়ে চুমুক দেবেন না। আমার বেয়ারাটা ছুঁয়ে দিয়েছে, ও মুসলমান।'

চায়ে চুমুক দিয়ে বললুম, 'তা হোক, ধর্মের কোন ক্ষতি হবে না তাতে। আপনি কি মানেন ? কিছু একটা না মানলে কবিতা লেখেন কি ক'রে ?'

হ্যাম-স্যাণ্ডউইচ চিবতে চিবতে বীরেশবাবু বললেন, 'কবিতা লিখতে

ধর্মের দরকার হয় না। কবিতার উদ্দেশ্য হচ্ছে কবিতা হওয়া। এর মধ্যে ভাল-মন্দ কিছু নেই। দাঁড়ান, চায়ে চুমুক দিয়ে নিই।'
—বীরেশবাবু যখন চায়ে চুমুক দিচ্ছিলেন তখন আমি বললুম, 'হওয়া কথাটার অর্থ কি ? আপনি নিশ্চয়ই ক্রিয়াপদটি বাক্যের উদ্দেশ্য এবং বিধেয়-বিশেষ্য এই দুটির মধ্যে সংযোজক হিসেবে ব্যবহার করলেন। বাক্যের মধ্যে দুটি অঙ্গ থাকে ব'লে জানি। উদ্দেশ্য এবং বিধেয়। বিধেয় যখন কোন গুণ বা অবস্থা প্রকাশ করে—'

'একটু দাঁড়ান। আপনি তো ব্যাকরণ নিয়ে আলোচনা শুরু করলেন ! কবিতার মধ্যে আপনি ব্যাকরণ দেখলেন কোথায় ?'

'আমি হওয়া কথাটার অর্থ খুঁজছিলাম। ব্যাকরণ থাক্। রামবাবুর যদি কেবল রামবাবু হওয়া উদ্দেশ্য হয়, তা হ'লে রামবাবুর দোষ-গুণের কথা উঠে পড়ে। রামবাবুর বিশেষণ। তা ছাড়া তিনি যদি তাঁর নিজের মত হতে চান তবে রামবাবুর মনে নিশ্চয়ই কি করলে রামবাবু হওয়া যায় তার একটা নকশা আঁকা আছে। ইংরাজীতে যাকে আমরা ডিজাইন বলতে পারি। হওয়া কথাটা যে ভাবে আপনি ব্যবহার করলেন তাতে একটা হাল্কা সুরের ধ্বনি আমি শুনতে পেলুম। আসলে, কোন কিছু হওয়ার মধ্যে একটা সঠিক উপসংহারের ইঙ্গিত আছে, ফাইনালিটি। আপনার কথা শুনে মনে হ'ল, শিল্পসৃষ্টির মধ্যে আপনি খানিকটা এলোমেলো সৃষ্টির পক্ষপাতী। বীরেশবাবু, কোন সৃষ্টিই এলোমেলো নয়। এমন কি বিশ্বসৃষ্টির পেছনেও একটা নকশা আছে।'

'কার আঁকা নকশা সেটা, মিস বোস ?'

আমি হাসতে হাসতে বললুম, 'এবার আপনি সত্যিই তর্ক করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। থাক্, আপনি এখন আপনার বিশ্ব-ভ্রমণের গল্প বলুন। অমিতাভ সেনের কথাও থাক্। তাঁকে না দেখলে আমি কিছুই বুঝতে পারব না। ঝরনা ব'লে একটি মেয়েকে বিলেতে দেখলেন ?'

বীরেশবাবু আর সহজ হতে পারলেন না। আমার প্রশ্নের জবাব দিতে লাগলেন কথা গুনে গুনে। তিনি নিজে কিছু জানতেও চাইলেন না আর। একটু অপ্রস্তুত বোধ করতে লাগলুম আমি। বাঙালী ব'লেই তিনি সমালোচনা পছন্দ করেন না। বাঙালী কবি বীরেশ রায় বোধ হয় আজও সাবালক হতে পারেন নি। আমি উঠে পড়লুম। বীরেশবাবু বললেন, 'আমি একদিন যাব আপনাদের ওখানে। আপনি আবার কবে আসবেন ?'

'খবর না দিয়ে আজকের মত অন্য একদিন এসে পড়ব।'

আমি চ'লে যাচ্ছিলুম। বীরেশবাবু সহসা আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি ভাল আছেন তো ?'

'হ্যাঁ। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন কেন ?'

'এমনিই। ভবতোষবাবুর সঙ্গে দেখা হ'ল বিলেতে।'

বোধ হয় উনিশ শো উনচল্লিশের মে মাসের দিকে বড়মামার স্বাস্থ্য খুব ভেঙে পড়ল। ডাক্তাররা তাঁকে কলকাতার বাইরে গিয়ে ক'টা মাস কাটিয়ে আসতে বললেন। প্রথমে বড়মামা হরিশ মুখার্জি রোডের বাড়ি ছেড়ে কোথাও যেতে চান নি। তারপর অনেক বোঝানোর পর তিনি পুরীতে যেতে রাজী হলেন। ডক্টর সেনের একটা বাড়ি ছিল সেখানে।

মে মাসের তিন তারিখে তাঁর রওনা হওয়ার দিন ঠিক হ'ল। সঙ্গে নামীনাথ আর মামীমা যাবেন। হরিশ মুখার্জি রোডের বাড়িটা বন্ধ থাকবে। আমি গিয়ে কলেজের হস্টেলে থাকব ব'লে সব বন্দোবস্ত ক'রে রেখেছিলুম। গ্রীষ্মের বন্ধে মেয়েরা কেউ ছিলও না। আমার থাকতে কোন অসুবিধে হবে না।

কিন্তু সেদিন জগদীশবাবু তাঁর ওখানে যাওয়ার জন্যে সকালের দিকে টেলিফোন করলেন। আমি বেলা তিনটে নাগাদ তাঁর বাড়ি গেলুম। দিনটা বোধ হয় রবিবার ছিল।

ঘরে ঢুকতেই তিনি বললেন, 'তোমার পাঁচ শো টাকা আমার কাছে ছিল।'

'সে তো আমি ঋণ শোধ দিয়েছি।'

'সে টাকাটা আমি শেয়ারের মধ্যে লগ্নি করেছিলাম। প্রায় সেণ্ট পার্সেণ্ট লাভ হয়েছে। আমার টাকা আমি পেয়ে গেলুম, তোমার টাকা তোমারই রইল। শেয়ারের দাম বাড়ছে হু-হু ক'রে। কি করবে? সব টাকাটাই আবার লাগিয়ে রাখব নাকি?'

'আমায় আপনি ভালবাসেন ব'লে আপনার নিজের টাকা খাটিয়ে লাভ দিচ্ছেন আমাকে। তর্ক ক'রে আপনার সঙ্গে পেরে উঠব না। যা ভাল মনে করেন তাই করবেন।'

'এই তো ভাল কথা। এর চেয়ে ভাল কথা আর হতেই পারে না। তোমার নামে একটা আলাদা অ্যাকাউণ্ট খুলেছি। এই কাগজপত্রগুলো সব সই ক'রে দাও।'

তাঁর কথামত কাগজে সই বসিয়ে দিলুম। দিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, 'এই জন্যে আমায় ডেকেছিলেন নাকি?'

'না, অন্য কথাও আছে। অমিতাভ এখন এলো না। হয়তো লড়াই বাধবে। অমিতাভর মা তাই ওকে দেশের হয়ে লড়াই করবার জন্যে ধ'রে রাখলেন। যাক, যখন হয় অমিতাভ আসবে। ওর বাড়ি-ঘর সব আমি ঠিক ক'রে রেখেছি। যাদব যাচ্ছে কবে?'

'দিন সাত পরে। বোধ হয় তিন তারিখে।'

'তোমার কি ব্যবস্থা হ'ল?'

'হস্টেলে গিয়ে থাকব।'

'চা খেয়ে চল, একটু ঘুরে আসি। তুমি ব'সো। আমি আসছি।'—এই ব'লে জগদীশবাবু ভেতরে গেলেন। জামাকাপড় প'রে তিনি ফিরে আসবার আগেই চা এলো। চা খেয়ে আমরা নেমে এলাম একতলায়।

গাড়ি ক'রে আমরা চ'লে এলুম লেক প্লেসে। একটা তিনতলা নতুন বাড়ির সামনে এসে জগদীশবাবু বললেন, 'নেমে এসো।'

তাঁর পেছনে পেছনে আমিও এসে ঢুকে পড়লুম বাড়ির মধ্যে। একটা দরওয়ান তিনতলার ফ্ল্যাটের তালা খুলে দিল। জগদীশবাবু রাস্তার দিকের বারান্দায় এসে বললেন, 'ফ্ল্যাটটায় তিনখানা ঘর। চাকরবাকরদের থাকবার জন্যে ল্যাণ্ডিংয়ের ওপাশে একটা ঘর ক'রে দিয়েছি। দুটো স্নান-ঘর আছে। বাড়িটা আমি তৈরি করেছি ভাড়া দেওয়ার জন্যে। একটা ফ্ল্যাটও আর খালি নেই। পয়লা তারিখে সবাই এসে বাড়িতে ঢুকবে। তুমি আসছ কবে, জয়া ?'

'আমি ?'

'তিনতলার ফ্ল্যাটটা তোমার জন্যেই তৈরি করেছি। আলাদা ফ্ল্যাটে থাকবে ব'লে তুমি একদিন আমায় একটা ফ্ল্যাট খুঁজে দিতে বলেছিলে। মনে পড়ে ?'

'পড়ে।'

'এসো। এই ঘরটা হবে তোমার বসবার আর লাইব্রেরি-ঘর। দক্ষিণ দিকটা একেবারে খোলা। কোনদিনও বন্ধ হবে না। বেড-রুম করবে কোন্‌টা ?'

এবার যেন সত্যিই আমি ভাবলুম, ফ্ল্যাটটা আমি ভাড়া নিয়েছি। এতে কল্পনা নেই এতটুকুও, সবটাই বাস্তব। ঘরগুলোর দিকে এবার আমি ভাল ক'রে চাইলুম। দক্ষিণ দিকটাও আমারই থাকবে। কোনদিন কেউ এদিকটা বন্ধ করতে পারবে না। ও-পাশে মস্তবড় চওড়া রাস্তা। জগদীশবাবু দাঁড়িয়ে ছিলেন এক জায়গায়। আমি একলাই কেবল ছুটে ছুটে এ-ঘর থেকে ও-ঘরে যাচ্ছিলুম। ঘরগুলোকে আপন ক'রে নিচ্ছিলুম আমি। পেছনের জীবন আমি ফেলে আসব হরিশ মুখার্জি রোডে। অতীত আমার লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে, এখন কেবল বর্তমান আমার রইল।

দক্ষিণ দিক দিয়ে সত্যিই হাওয়া আসছিল। নাক দিয়ে নিশ্বাস টানতে লাগলুম আমি। হরিশ মুখার্জি রোডের কোন্‌টা যে দক্ষিণ দিক তাও আমি জানি না। রান্নাঘরের পাশের ঘরটিতে আমি কখনও হাওয়ার স্পর্শ পাই নি। দক্ষিণ দিক ছিল না ব'লে সেখানে হাওয়া ঢুকতে পেত না।

জগদীশবাবু আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন। আমার মুখে তিনি নিশ্চয়ই আনন্দের আভাস দেখতে পেয়েছেন। আমার ঘাড়ে হাত রেখে তিনি বললেন, 'তোমার লাইব্রেরি-ঘরের সামনের বারান্দাটায় কাল ফুলের টব আসবে। কি ফুল তুমি পছন্দ কর, জয়া-মা?'

আমি বললুম, 'আমার জগতে ফুলের অস্তিত্ব ছিল না। আপনার যা ভাল লাগে আমারও তাই ভাল লাগবে।'

হাসলেন জগদীশবাবু। একেবারে শেষের দিকের ঘরটাতে এসে তিনি বললেন, 'এটা তোমার খাবার-ঘর। ছজন ব'সে অনায়াসেই খেতে পারে তেমন একটা টেবিল আর ছ'খানা চেয়ার আমি অর্ডার দিয়েছি পার্ক স্ট্রীটে। তোমার কি কোন বিশেষ ধরনের আসবাবের প্রতি ঝোঁক আছে, জয়া?'

'আমি তো সারা জীবন মেঝেতে ব'সে খেয়ে এলুম। আসবাবের মর্ম আমি বুঝি না। কিন্তু আপনি কেন এত টাকা খরচ করছেন? শোধ দেব কি ক'রে?'

'শেয়ারের বাজার থেকে সব শোধ হয়ে যাবে। রান্নার লোকের কি করবে?'

'রান্নার লোক? সে কোথায় পাওয়া যায় তাও তো জানি না।'

'আমি ঠিক ক'রে রেখেছি। আমারই একটা পুরনো রান্নার লোক তোমায় দিচ্ছি। মাইনে একটু বেশী চাইবে, তা চাক। তুমি নিজে একটা লোক যতদিন না ঠিক ক'রে নিচ্ছ আমার লোকটাই কাজ

করুক। জয়া, আজও আমার মাঝে মাঝে লোভ হয়, তোমায় যদি ছেলের বউ ক'রে ঘরে আনতে পারতুম!'

'কিন্তু—।' শাড়ির আঁচলটা নিয়ে খেলা করতে করতে আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'কিন্তু এমন একটা ফ্ল্যাটের ভাড়া কত হবে? আমার মাইনের টাকা দিয়ে ভাড়া আর খাওয়া কুলবে কি ক'রে?'

'শেয়ারের বাজার থেকে সব খরচা আমি তুলে নিয়ে আসব। আমার দ্বিতীয় পক্ষের বড় ছেলের বয়স মাত্র ষোল। নইলে তোমাকে আমি কিছুতেই এই ফ্ল্যাটে আসতে দিতুম না। একটা মজার কথা শুনবে, জয়া?'

'বলুন।'—জগদীশবাবুর সব কথা শুনতে আজ আমার ভাল লাগছে। তিনি বললেন, 'আমি কিছুতেই ভুলতে পারছি না যে, তুমি আমার ছেলের বউ নও। আজ আমার মনে হচ্ছে যে, বীরেশকে কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়ে তোমায় বিয়ে করতে বলি। চল, এবার ছাদের ওপরটা একবার দেখে আসি।'

ছাদের ওপরে এসে তিনি আবার বললেন, 'প্রচুর হাওয়া পাবে এখানে। কাল আমার মালী আসবে। এখানে তাকে একটা ভাল বাগান ক'রে দিতে বলেছি।'

দরওয়ানটা কখন যে আমাদের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিল দেখি নি। জগদীশবাবু তাকে বললেন, 'তেওয়ারী, তুমি আমার সবচেয়ে পুরনো প্রহরী। কেবল বাড়ি দেখবার জন্যে তোমায় এখানে পাঠাই নি। আমার তো আরও কুড়িটা বাড়ি আছে। তুমি দিদিমণিকে দেখবে। নিজের মেয়ের মত ক'রে দেখবে।'

'জী, হুজুর।'

এবার আমার দিকে ঘুরে জগদীশবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'কবে আসছ, জয়া-মা? পয়লা তারিখেই চ'লে এস। যাদবকে আমি কালই সব বলব। যাদবের কোন আপত্তি উঠবে না জানি। আপত্তি উঠলেই

বা তুমি তা শুনতে যাবে কেন? পরিচ্ছন্ন আকাশ যেখানে ছোঁয়া যাচ্ছে সেখানে তুমি আসবে না কেন? যাদবের রান্নাঘরের পাশে তোমার বেড-রুমটা সেদিন আমি উঁকি দিয়ে দেখে এসেছি। এমন ঘরে ভবতোষ এসে বসত কি ক'রে?'

'ভবতোষ? ভবতোষকে আপনি চিনলেন কি ক'রে?'—আমি একেবারে আকাশ থেকে পড়লুম।

আমার প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে জগদীশবাবু আবার আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'কবে আসছ তা হ'লে?'

জবাবটা দিলুম গাড়িতে ব'সে। বললুম, 'মামা যখন তিন তারিখে রওনা হচ্ছেন, আমিও তখন তিন তারিখেই আসব। বিকেলের দিকে আমরা এক সঙ্গেই বেরুব।'

'বেশ, ভাল কথা। সকালবেলা গাড়ি পাঠিয়ে দেব, তোমার সব জিনিসপত্র তেওয়ারী গিয়ে নিয়ে আসবে। আজ আর যাদবের সঙ্গে দেখা করব না, কাল আসব।'

আমি বাড়ির সামনে গাড়ি থেকে নামলুম। জগদীশবাবু বললেন, 'বীরেশের কাছে শুনলুম, ভবতোষ লোক ভাল নয়। রত্না ব'লে একটি মেয়েকে সে ভালবাসে।'"

॥ ত্রয়োদশ রাত্রি ॥

"উনিশ শো চল্লিশ খ্রীষ্টাব্দ শেষ হতে চলল। আমার লাইব্রেরি-ঘরের সামনে টবগুলোতে ফুল ফুটেছে অনেক। দক্ষিণের হাওয়া এখন বন্ধ, তবুও লাইব্রেরিতে ব'সে ফুলের গন্ধ পাই সারা দিন রাত। বাইরে থেকে জীবনটা এত সুন্দর দেখায় যে, মাঝে মাঝে ভুলে যাই, ভেতরটা আমার তৃণশূন্য এবং তরুলতাহীন একখণ্ড মরুভূমি। ঐশ্বর্যহীন ভূখণ্ডের দিকে চেয়ে চোখে আমার জল আসে। এ জল দিয়ে আজও আমি অতীতটাকে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার ক'রে তুলতে পারলুম না। বাস্তব ভেবে যা কিছু ধরতে যাচ্ছি, সবই যেন অতীত-প্রতারণার সমিধভার বুকে নিয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়ায়।

আজ কলেজ নেই। রাস্তার দিকের বারান্দায় এসে দাঁড়িয়ে ছিলুম আমি।

আমাদের প্রিন্সিপ্যাল সুজাতা রায়কে দেখলুম। বড় ফটক দিয়ে ভেতরে ঢুকছেন। তিনি নিশ্চয়ই আমার কাছে আসছেন। ব্যাপার কিছুই বুঝতে পারলুম না। মোটা দেহ নিয়ে তিনতলায় উঠতে তাঁর অনেকটা সময় লাগল। পেছন দিকের দরজা খুলে আমি দাঁড়িয়ে ছিলুম সিঁড়ির ওপর। সুজাতাদি এলেন। আমার লাইব্রেরি-ঘরে ব'সে বিশ্রাম করলেন খানিকক্ষণ। তারপর বললেন তিনি, 'তোমার বাড়ি দেখতে এলুম। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে ভাবছিলুম, আজকের এই ছুটির দিনটাতে কোথায় যাই! তুমি তো অনেক দিনই আসবার জন্যে অনুরোধ করেছ।' চার দিকে ভাল ক'রে চেয়ে নিয়ে তিনি বললেন, 'সুন্দর ভাবে সাজিয়েছ ঘরখানা। এত বই পেলে কোথায়? গবেষণা করছ বুঝি? আমিও বলি, তোমার বাপু, গবেষণাই করা উচিত। তোমার মত মেয়ের আমাদের এই প্রাইভেট কলেজে অল্প মাইনেতে প'ড়ে থাকা উচিত নয়। আমার তো আর গবেষণা করার

বয়স নেই। তার ওপরে উনি খুবই একটা ছোট চাকরি করেন। শা'নগরের দিকে কোন রকমে তিন কাঠা জমি কিনেছি। যেমন তেমন ক'রে দুখানা ঘরও তুলেছি। কবে যাবে দেখতে, জয়া ?'

'চা, না, ঠাণ্ডা কিছু খাবেন ?'

'গলা ভেজাবার জন্যে যা হোক একটা হ'লেই হ'ল। চায়ের মধ্যে চিনি আর দুধ থাকে। প্রোটিন কিছু পাওয়া যায়। দুখানা ঘর কোনরকমে ভাই তুলে ফেলেছি। চানঘরও করলুম। রান্নাঘরটা হ'য়ে উঠল না। চা আনতে ব'লে এস, তারপর সব বলছি।'

ঠাকুরকে চা তৈরি করতে ব'লে এলুম। ফিরে আসবার সময় দেখি, সুজাতাদি লাইব্রেরি থেকে বেরিয়ে এসেছেন। তিনি বললেন, 'এটা কি তোমার রান্নাঘর ?'

'না, প্যান্‌ট্রি। রান্নাঘর তিনতলার ছাদে।'

'বাঃ, চমৎকার ব্যবস্থা! কত ভাড়া দিতে হয় ?'

'ভাড়া খুব বেশী দিতে হয় না। বড়মামার বন্ধুর বাড়ি।'

'ওমা, এ যে স্বর্গ পাওয়ার চেয়েও ভাল। যুদ্ধের বাজারে সব জিনিসেরই দাম বাড়ছে। অঙ্কের দাম বাড়ল না কিছুই। অঙ্কশাস্ত্রে এম-এ পাস ক'রে কি লাভ হ'ল আমার ? ওদিকটায় কি ?'

'খাবার-ঘর।'

'ডাইনিং রুম ?'—সুজাতাদির গলার সুর প্রায় ভেঙে পড়ল। আমি বললুম, 'আসুন না, দেখবেন।'

খাবার-ঘরে এসে তিনি আরও বেশী চমকে উঠে বললেন, 'ছ জন মানুষ বসে খায়। এত লোক কে আসে তোমার কাছে ?'

'ছ জন লোক খায় না, খেলে তার ব্যবস্থা ক'রে রেখেছি।'

'হ্যাঁ, তাই তো দেখছি, ছখানা চেয়ার সাজানো রয়েছে। সাইড-বোর্ডটাও বেশ ভাল কাঠের তৈরি। বর্মা টিক বুঝি ?' সুজাতাদি যেন

গন্ধ শুঁকে শুঁকে বর্মা টিক কিনা ধরবার চেষ্টা করছেন। নতুন রঙের গন্ধ ছাড়ছে। 'কবে আসব খেতে, জয়া ?'

'আপনার যেদিন সুবিধে হয়। রান্নার লোকটিও ভাল রান্না করে।'

'আমার নিজের যদি এমন একটা ফ্ল্যাট থাকত, তবে আমি বিয়ে করতুম না। আর কখানা ঘর আছে ?'

'আর একখানা আমার শোবার-ঘর।'

'আপত্তি আছে নাকি শোবার-ঘরটা দেখাতে ?'

'না, আপত্তি কেন থাকবে ? আসুন।'

আমার শোবার-ঘরে ঢুকে সুজাতাদি বিছানার ওপর ব'সে প'ড়ে বললেন, 'ওমা, এ যে ডবল খাট দেখছি। স্প্রিং লাগিয়েছ, তাও তো খুব পুরু। আঃ, কি আরাম !' এই ব'লে সুজাতাদি শুয়ে পড়লেন, গড়িয়ে গড়িয়ে খাটের এদিক থেকে ওদিকে যাওয়ার চেষ্টা করলেন বটে, কিন্তু পারলেন না। মাঝখানে এসে থেমে গেলেন। আমার দিকে মুখ ক'রে তিনি বললেন, 'দম ফুরিয়ে গেছে। এই বয়সে দম কারো থাকেও না। এত বড় চওড়া খাটে শুয়ে ঘুম আসে তোমার ?'

'আসে।'

'আমার আসত না। দু দিকে এত ফাঁকা জায়গা রেখে আমি কিছুতেই ঘুমতে পারতুম না, জয়া। চল, এবার তোমার বসবার-ঘরে গিয়ে বসি।'

চা খেতে খেতে সুজাতাদি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার ছোটমামার সঙ্গে দেখা হয় না ?'

'এইখানে উঠে আসার পর আর দেখা হয় নি।'

'তাঁর কাছ থেকে একটা চিঠি আনতে পার ? রান্নাঘরটা তৈরি করতে পারি নি।'

ছোটমামার চিঠির সঙ্গে রান্নাঘরের সম্বন্ধটা বুঝতে না পেরে আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'তাঁর চিঠি দিয়ে কি করবেন ?'

বিস্কুট চিবতে চিবতে সুজাতাদির গলা শুকিয়ে গিয়েছে ব'লে তিনি চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন, 'দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সিমেণ্টের দর হয়েছে আগুন। তোমার মামা আই-সি-এস। তাঁর কাছ থেকে এক লাইন চিঠি আনতে পারলে কণ্ট্রোল থেকে কিছু সিমেণ্ট আনব। জয়া, কলেজ থেকে যা মাইনে পাই তা থেকে তিন কাঠা জমি কিনেছি, দুখানা ঘর তুলেছি, রান্নাঘর তুলতে পারি নি। তোমার কাছে কটা টাকাও ধার চাইতে এসেছি। তুমি আমায় খালি হাতে ফিরিয়ে দেবে না তা আমি জানি। তোমার মত মেয়ের প্রাইভেট কলেজে চাকরি করা উচিত নয়।'

'কিন্তু আমার কাছে টাকা পাবেন তেমন বিশ্বাস আপনার কি ক'রে এলো ?'

বেশ স্পষ্ট গলায় সুজাতাদি বললেন, 'শেয়ারের বাজার থেকে তোমার অনেক টাকা আসছে তা আমি জানি।'

'কি ক'রে জানলেন ?' আমি খুবই অবাক হয়েছি।

'উনি তো জগদীশবাবুদের অফিসেই কাজ করেন। খুবই ছোট কাজ, মাইনে পান মাত্র দু শো পাঁচ টাকা। এই টাকায় যুদ্ধের বাজারে ক বস্তা সিমেণ্ট কেনা যায় বল ?'

আমার মনে হ'ল, টাকা না নিয়ে সুজাতাদি কিছুতেই বাড়ি ফিরবেন না। কলেজ নেই আজ, সকালবেলাটা টাকার তর্ক নিয়ে নষ্ট করতে চাই না। সুজাতাদিকে সন্তুষ্ট চিত্তে বিদায় করতে পারলে বেঁচে যাই আমি। জিজ্ঞাসা করলুম, 'কত টাকা ধার চাই আপনার ?'

সারা মুখে তাঁর হাসির হিল্লোল। তিনি বললেন, 'এখন পাঁচ শো হ'লেই রান্নাঘরটা আরম্ভ করতে পারি।'

'আরম্ভ তো করলেন, কিন্তু শেষ করবেন কি ক'রে ? আমি বরং আপনাকে এখুনি হাজার টাকা ধার দিয়ে দিচ্ছি। আবার কেন আপনি কষ্ট ক'রে ছুটে আসবেন আমার কাছে ?'

'তোমার কাছে আসি তা বুঝি তুমি চাও না, জয়া ?'

'চাই বই কি। কিন্তু এদিকের কষ্টের কথাটা আপনার ভাবছিলুম আমি। তিনতলায় উঠতে হয় তো ?'

'তা হোক, আমি আবার আসব।'

'এক হাজার টাকার পরে ?'—আমার মুখে ভয়ের চিহ্ন দেখতে পেলেন সুজাতাদি। তিনি বললেন, 'এখন পাঁচ শো টাকাই ধার দাও, পরে আবার দরকার হ'লে এসে নিয়ে যাব।'

'তা হ'লে কষ্ট ক'রে তিনতলায় আর উঠবেন না, আমি আর পাঁচ শো টাকা আমাদের দরওয়ান তেওয়ারীর কাছে রেখে দেব। সে একতলাতে থাকে—বড় ফটকটার ডান দিকের ঘরে।'

আমি চেক-বইখানা নিয়ে এসে সুজাতাদির নাম লিখলুম চেকের পাতায়। সুজাতাদি আমার ঘাড়ের ওপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে ছিলেন। টাকার অঙ্ক লিখতে যাওয়ার সময় তিনি ব'লে উঠলেন, 'তেওয়ারীকে আবার এসে বিরক্ত করার দরকার কি, তুমি বরং হাজার-টাকাই ধার দাও। কোন্ ব্যাঙ্কের চেক দিলে ?'

'লয়েডস্।'

'হ্যাঁ, বেশ বড় ব্যাঙ্ক। কোন্ শাখার ওপর কাটলে ?'

'চৌরঙ্গী।'

'বাঃ, বেশ সুবিধেই হবে। ভিড়ের মধ্যে ওঁকে আর পাঠাব না, নিজেই যাব। তা হ'লে তোমার ছোটমামার সঙ্গে দেখা করছ কবে ?'

চেকখানা সুজাতাদির হাতে দিয়ে বললুম, 'কণ্ট্রোলের হাঙ্গাম ক'রে আর লাভ কি ? আমি তো ব্ল্যাক মার্কেটের জন্যেই ডবল টাকা দিলুম। তা ছাড়া ছোটমামা তো আপনার কলেজের গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান। আপনার সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট পরিচয় আছে। আপনি নিজেই একটা চিঠি চেয়ে নেবেন।'

চেকখানার ওপরে কালি নিশ্চয়ই এতক্ষণে শুকিয়ে গিয়েছে,

সুজাতাদি তবু ফুঁ দিয়ে দিয়ে কালি শুকতে লাগলেন। আমি বললুম, 'কালি আর কাঁচা নেই, কাগজের ওপর সেঁটে ব'সে গেছে।'

ভাঁজ ক'রে চেকখানা তিনি হ্যাণ্ডব্যাগের মধ্যে রেখে দিয়ে বললেন, 'মিত্র সাহেব আর আমাদের কলেজের সঙ্গে যুক্ত নেই।'

'কেন?'

'দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় অন্যদিকে তাঁর দায়িত্ব বোধ হয় খুবই বেড়েছে। একটা প্রাইভেট কলেজ নিয়ে মেতে থাকবার সময় তাঁর নেই। আজ তা হ'লে চলি, জয়া। বাই দি ওয়ে, কত ক'রে সুদ নেবে?'

'সুদ? সুদের কথা তো ভাবি নি। কত ক'রে সুদ দিলে আপনার সুবিধে হয়?'

'সুদ আমি দিতে চাই, জয়া। আজই পাঁচ শো টাকার মেকানিক্যাল কাগজ কিনে রাখব। আমার নোটবইগুলোর নতুন সংস্করণ হবে। প্রতি বছরই হয়। আমার যদি পঞ্চাশ পারসেণ্ট আসে, তা হ'লে তোমায় দশ পারসেণ্ট দিতে আমার গায়ে লাগবে না। আমাদের গভর্নিং বডির নতুন চেয়ারম্যানের নাম জান, জয়া?'

'না।'—আমি পরিশ্রান্ত বোধ করছিলুম।

দরজার দিকে এগিয়ে গিয়ে তিনি বললেন, 'ব্যারিস্টার বিমল গুপ্ত।'

কোন কথাই আমি বলতে পারলুম না। বলবার কিছু ছিল না, জানবারই বা আছে কি? সুজাতাদি তবু আমায় জানালেন, 'কলেজটার জন্যে মিস্টার গুপ্ত খুব ভাবছেন। কি ক'রে এটাকে বড় করা যায় তাও তিনি ঠিক ক'রে ফেলেছেন। আসছে মাস থেকে তিনতলা উঠবে। মিত্র সাহেবের সময় দরওয়ানের জন্যেও একটা আলাদা ঘর ছিল না।'

শুনলুম সব। ক্রমে ক্রমে আরও বেশী পরিশ্রান্ত বোধ করছি। কানের পর্দাও বোধ হয় বিক্ষত হয়ে উঠছে। সুজাতাদি তবুও গেলেন না। বলতে লাগলেন, 'সেন কোম্পানি বড় ঠিকেদার। তারাই তিনতলা তুলবে। সেন কোম্পানি ঠিকেদার বটে, কিন্তু তার মালিক হচ্ছেন

সাহিত্যিক। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ তিনি পেয়েছেন। আমার রান্নাঘরটা তিনিই তৈরি ক'রে দেবেন। এস্টিমেট চেয়েছিলাম। তিনি সাহিত্যের ভাষায় বললেন যে, তিনতলার কন্‌ট্রাক্টের ওপর রান্নাঘরটা তো শাকের আঁটি। আমি তা হ'লে চললুম্। কাল কলেজে দেখা হবে। ছাত্রীসংখ্যা কত বেড়েছে জান ?'

'না।'

'প্রত্যেকটা ঘরে দেয়াল পর্যন্ত বেঞ্চি ঠেকিয়ে দিয়েছি। পাঁচজনের জায়গায় এক এক বেঞ্চিতে ছজন ক'রে বসবে এবার। আসছে মাসে তো আমাদের সব মাইনে বাড়বে। বাড়াবার ব্যবস্থা করেছেন মিস্টার গুপ্ত নিজেই। মেয়ে-কলেজ গঠন করবার মত উপযুক্ত লোক তিনি।'

সুজাতাদি যাচ্ছিলেন।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'রত্না এখন কলেজে পড়ে না ব'লে আপনার কোন অসুবিধে হচ্ছে না তো ?'

'ছি ছি—রত্নার কথা আর মুখে এনো না। কলেজের কলঙ্ক ছিল রত্না। আর এখন তো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, বোধ হয় কারখানার মত আমরাও দু শিফ্‌টে কলেজ চালাব। রত্নার সঙ্গে দেখা হয় নাকি তোমার ?'

'না। সে এখানে নেই।'

'থাকলেও দেখা ক'রো না। দুর্নাম হয়ে যাবে। মেয়েদের অভিভাবকেরা হয়তো নালিশ ক'রে বসবেন গভর্নিং বডির চেয়ারম্যানের কাছে। তুমি নিশ্চয়ই জান, প্রাইভেট কলেজ চলে মেয়েদের দিয়ে নয়, তাদের অভিভাবকদের দিয়ে। কারণ মাইনের টাকা দিতে হয় তাঁদেরই। এক সময়ে রত্নার সঙ্গে তোমার খুবই গভীর অন্তরঙ্গতা ছিল। আমি চাই না, চেয়ারম্যানের কাছে সে সব কথা কোন ক্রমেই রিপোর্টেড হয়।'

ঘরের বাইরে থেকে কে যেন আমার নাম ক'রে ডাকতে লাগলেন।

সুজাতাদি ভয় পেয়ে বললেন, 'মিত্র সাহেবের গলা শুনছি? বেরিয়ে যাওয়ার অন্য কোন রাস্তা নেই, জয়া?'

'না।'

'তা হ'লে কি করি এখন? তোমার এই স্নান-ঘরটায় ঢুকে পড়ি। ওঁকে নিয়ে তুমি বসবার ঘরে যাও। তারপর আমি বেরিয়ে যাব।'

সুজাতাদি সত্যি সত্যি স্নান-ঘরে গিয়ে দরজা দিলেন।

লাইব্রেরি-ঘরে এসে মামা জিজ্ঞাসা করলেন, 'মিসেস রায়ের গলা শুনছিলাম যেন? তিনি এসেছিলেন নাকি?'

'হ্যাঁ।'

'কোথায় গেলেন?'

'চ'লে গেলেন।'

'হুঁ, আমার সামনে আসতে তাঁর বোধ হয় লজ্জা করল। সুন্দর ফ্ল্যাট পেয়েছিস তো!'

'ঠিকানা পেলে কোথায়, মামা?'

'দাদার কাছে টেলিফোন ক'রে জেনে নিলুম। আজকাল তো আমার ওখানে যাওয়া ছেড়েই দিয়েছিস।'

'তুমি ডাকলেই যেতুম।'

'নাঃ, তোর এখানেই আসব আমি।'

ছোটমামা আজ ধুতি পাঞ্জাবি প'রে এসেছেন। গায়ে জড়িয়েছেন বেশ চওড়া পাড়ের একটা কাশ্মীরী শাল। সুন্দর দেখাচ্ছিল ছোটমামাকে। তিনি বললেন, 'তোর বইগুলো আগে দেখে নিই।'

'হ্যাঁ, তাই দেখ, আমি তোমার জন্যে ক'খানা লুচি ভেজে নিয়ে আসি।'

'না জয়া, এক পেয়ালা চা আনতে বল্। দুপুরবেলা তোর এখানে আজ খেয়ে যাব। ছুটির দিনটা ভাল কাটবে।'

'আমারও। কি ভাগ্য আমার! আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলাম—এখানে এসে আমার বড্ড একা একা লাগে। হরিশ মুখার্জি রোডে যখন-তখন ছুটে যেতেও পারি না। মামা, তোমার ড্রাইভারকেও খেতে বলি?'

'না, না। সে গাড়ি নিয়ে চ'লে গেছে। ফেরার পথে ট্যাক্সি চেপে যাব। তোর মামীমার কোথায় কোথায় সব কাজ আছে, গাড়িটা তাঁর দরকার।'

'তা হ'লে তুমি বই দেখ, অনেক নতুন বই কিনেছি। আমি রান্নার ব্যবস্থা সব ঠাকুরকে বুঝিয়ে দিয়ে আসি। তুমি কি কি খেতে ভালবাস, মামা? আমার ঠাকুর বিলিতী রান্নাও খুব ভাল জানে।'

'না না, বিলিতী রান্নার দরকার নেই। বাংলা-রান্নাই ওকে রাঁধতে বল্।'

ছুটো দশ টাকার নোট ঠাকুরের হাতে দিয়ে বললুম, 'আমাদের আজ যে কত বড় সৌভাগ্যের দিন তা তুমি জান না, ঠাকুর। খুব ভাল ক'রে মামাকে খাওয়াবে। একটু বেশী পরিমাণে রান্না ক'রো। দরওয়ানকে দিয়ে হরিশ মুখার্জি রোডে বড়মামার জন্যেও কিছু খাবার পাঠাব। বড়মামা কইমাছ খেতে ভালবাসেন।'

ঠাকুর বলল, 'খুব বড় বড় কইমাছ ওঠে বাজারে, যাদবপুরের কই।'

'বেশ বেশ, তাই এনো। আমাকে আর ডাকাডাকি ক'রো না। আর টাকা লাগবে নাকি?'

'না। এতেই কুলিয়ে যাবে। আমাদের বুড়ো বাবুকে ডাকবে না?'

'জগদীশবাবুকে?'

'হ্যাঁ।'

'না, আজ থাক্। অন্য একদিন ডাকব।'

লাইব্রেরি-ঘরে ফিরে এলুম আমি। ছোটমামা এর মধ্যেই ছু নম্বর শেল্‌ফের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। জানলার পর্দা সব তুলে দিলুম

ওপর দিকে। আলো আসুক ঘরে, আসুক বাতাস। আমি নিজেকে লুকিয়ে রাখবার চেষ্টা করতে লাগলুম। আমার জীবনে যে আলো আর হাওয়ার অভাব ঘটেছে তা যেন ছোটমামা বুঝতে না পারেন। তাঁর নিজের জীবনের হাহাকার শুনতে পেয়েছি ব'লেই সতর্ক হতে বাধ্য হলুম আমি।

শেল্‌ফের কাছে দাঁড়িয়ে ছোটমামা বললেন, 'তোর মনটাকে আমি খুঁজে বার করছি, জয়া।'

আমি কোন কথা বললুম না। আমি জানি, যা বলবার মামাই বলবেন। তাঁর মনের সমস্যা কোন্ রাস্তায় এসে যে জট পাকিয়ে গেছে তাও আমি এখনো বুঝতে পারি নি। হিউম্যানিজম সম্বন্ধে একখানা বই হাতে নিয়ে মামা জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোর কি বিমল গুপ্তের কথা মনে আছে?'

'আছে।'

'সুনন্দার কাছে শুনলুম তিনি একজন মানবপ্রেমিক। কি ক'রে কি যে হয় আমি তো কিছুই বুঝতে পারি না। নিরীশ্বরবাদের একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আমার জানা আছে, কিন্তু তাতে মানবপ্রেমের ব্যাখ্যা কিছু পাই নি। তুই কিছু জানিস নাকি?'

মামার উদ্দেশ্য ঠিক এখনো ধরতে পারলুম না। সতর্ক ভাবে ধীরে ধীরে পথ চলবার চেষ্টা করাই উচিত। আমি তাই বললুম, 'জানি। মানবপ্রেম দু রকমের। এক রকমের হিউম্যানিজম হচ্ছে ভগবান-কেন্দ্রিক, অন্যটা হচ্ছে মানবকেন্দ্রিক। মানবকেন্দ্রিক হিউম্যানিজম রেনেসাঁসের পর থেকে পৃথিবীতে খানিকটা প্রাধান্য লাভ করেছে বহু নামে। এবং বহু ব্যক্তির নিজস্ব ধারণা হিসেবে এর বিশ্লেষণও আছে। মামা, আমার নিজের কোন মতের কথা বলছি না। যা বলছি তা ইতিহাস থেকে নেওয়া। হিউম্যানিজম কোন ধর্ম নয়; কারণ, হিন্দু-ধর্ম কিংবা খ্রীষ্টধর্মের মত এর মধ্যে ধারাবাহিকতা নেই। যখন যিনি

এর প্রবর্তন করেছেন তখন সেটা তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপারের মতই ছিল। তাঁদের মৃত্যুর পরে তাঁদের প্রবর্তিত হিউম্যানিজম কেউ অনুসরণ করে নি। এঁদের কোন দর্শনও নেই। কারণ এঁদের মানবপ্রেম হচ্ছে ভঙ্গি-প্রধান। মামা, চা তোমার ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। রান্নাবান্না কি হচ্ছে একটু দেখে আসি। অন্য একদিন এ সম্বন্ধে আরও আলোচনা করা যাবে। অমিতদার খবর কি? সে ফিরছে কবে?'

'সে এখন ফিরবে না। না ফেরাই উচিত। সমুদ্রের তলায় এখন সব জার্মানির ডুবো-জাহাজ লুকিয়ে রয়েছে। তুই কি জানিস যে, ঝরনা এখন অমিতের বউ নয়?'

'হ্যাঁ, জানি। আমি আসছি, মামা।'

সারা দুপুরটা মামার সঙ্গে গল্প ক'রেই কাটল। ঠাকুরের রান্না তাঁর ভাল লেগেছে খুব। তিনি বললেন যে, আজ পরিমাণেও একটু বেশী খেয়েছেন। তেওয়ারী গিয়েছিল হরিশ মুখার্জি রোডে। সে ফিরে এসে বলল যে, বড়মামাও কই মাছ দেখে খুব খুশী হয়েছেন। আমি জানি, কই মাছ দেখে বড়মামা যত খুশী হয়েছেন তার চেয়ে বেশী খুশী হয়েছেন ছোটমামার কথা শুনে। ছোট ভাইটি যে তাঁর স্বাভাবিক হচ্ছে এবং আত্মীয়স্বজনদের চিনতে পারছে তেমন সংবাদ পেলে যে তিনি খুশী হবেন আমি তা জানতুম।

সন্ধ্যের দিকে মামা উঠলেন। আবার একদিন এমনি ক'রে এসে খেতে বসবেন ব'লে প্রতিশ্রুতিও দিলেন। যাওয়ার আগে তিনি বললেন, 'মিসেস সুজাতা রায়ের কথা তোকে বলতে ভুলে গিয়েছিলুম। আমি আর ওঁদের কলেজের সঙ্গে যুক্ত নেই।'

'কেন মামা? কি হয়েছিল?'

একটু হেসে ছোটমামা বললেন, 'মিসেস রায়ের বিশ্বাস, আমার দ্বারা কলেজের কিছু উপকার হচ্ছিল না। তিনি ভেবেছিলেন, আমি

যখন আই.সি.এস. তখন সরকারী সাহায্য নিশ্চয়ই এনে দিতে পারব। আমি তা পারি নি।'

'তাই বুঝি তুমি পদত্যাগ করলে।'

'এত তাড়াতাড়ি হয়তো পদত্যাগ করতুম না। কিন্তু মিসেস রায় মেম্বারদের কাছে খবর পৌঁছে দিয়েছেন যে, আমার মত লোক কলেজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকলে অভিভাবকেরা এখানে মেয়েদের পাঠাতে আপত্তি করছেন।'

'কেন?'

'তোর মামীমার এত বেশী দুর্নাম ছড়িয়ে পড়েছে যে, কলকাতার কোন অভিভাবকের তা আর জানতে বাকি নেই। অভিভাবকদের লেখা দু-একখানা চিঠিও তিনি যোগাড় করেছেন!···মিস্টার গুপ্তকে চিনতে সুনন্দার হয়তো খুব বেশীদিন লাগবে না। সবচেয়ে মজার ব্যাপার কি জানিস?'

'না মামা।'

'মিসেস রায় হঠাৎ একদিন ভোরবেলা আমার বাড়ি গিয়ে উপস্থিত হলেন। আমি আমার অফিস-ঘরেই ব'সে ছিলাম। সুনন্দার তখনও ঘুম ভাঙে নি। মিসেস রায় আমার কাছে তিন হাজার টাকা ধার চেয়ে বসলেন। একখানা ঘর তুলে তিনি মুশকিলে প'ড়ে গেছেন। অন্তত দুখানা ঘর না হ'লে স্বামী-পুত্রকে নিয়ে তিনি কি ক'রে নতুন বাড়িতে উঠে আসেন, ইত্যাদি। আমি তাঁকে টাকা দিতে পারি নি। উদ্বৃত্ত টাকা আমার সত্যিই কিছু নেই। অমিত আর সুনন্দা দুজনে মিলে আমার সব টাকা নিয়ে গেছে। মাইনের টাকা দিয়েও মাস কাটে না। মিসেস রায় বিশ্বাস করলেন না আমার কথা। তিনি পাঁচ পার্সেণ্ট ক'রে সুদ দিতে চেয়েছিলেন। সুনন্দার জন্যে আমি সব জায়গায় অপদস্থ হচ্ছি। এবার আমি চলি।'

'চল, তোমার সঙ্গে আমিও নীচে যাই। তেওয়ারীকে দিয়ে একটা ট্যাক্সি ডাকিয়ে দিচ্ছি।'

নীচে এসে দেখি, জগদীশবাবু গাড়ি থেকে নামছেন। ছোটমামাকে দেখে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'এই যে মিত্র সাহেব, কেমন আছেন?'

'ভালই আছি। আপনি?'

'আমার বয়েসে তো ভাল থাকার কথা নয়। ভগবানের কৃপায় ভালই আছি। যাদবের চেয়ে আমি এক বছরের বড়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ না থামলে বোধ হয় আমার আর অসুখ-বিসুখ হবে না। হাত-ভর্তি কাজ।'

বেশ সশব্দেই হেসে উঠলেন জগদীশবাবু। মনে হ'ল, তাঁর হাসির মধ্যে যেন উদ্দেশ্য ছিল। ছোটমামা একটু অপ্রস্তুত বোধ করছিলেন। তেওয়ারী ট্যাক্সি নিয়ে এসেছে। আমি বললুম, 'মিটারে ভাড়া উঠছে। মামা, তুমি এবার এস।'

ছোটমামা বিনীতভাবে জগদীশবাবুকে নমস্কার জানিয়ে ট্যাক্সিতে উঠে বসলেন।

সিঁড়ির কাছে এসে পৌঁছতেই দেখি, জগদীশবাবুর পেছনে পেছনে একটা কুকুর এসে ঢুকছে। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'কুকুরটা কার?'

'আমার।'

'কি নাম?'

'ল্যাসি।'

'আপনি কুকুর রাখতেন ব'লে তো জানতুম না!'

বসবার ঘরে এসে জগদীশবাবু বললেন, 'কোনদিনও কুকুরের শখ ছিল না। আজকাল কুকুর রাখছি শখের জন্যে নয়, বিশ্বাসযোগ্য ব'লে। শত্রু দেখলে চেঁচায়। শয়তান দেখলে তার টুঁটি ধরতে চায়। জয়া-মা, ভাল কুকুর চরিত্রহীন শিক্ষিত লোকের চেয়েও ভাল।'

সিগার ধরালেন জগদীশবাবু। তাঁর মুখে ক্রমশই গাম্ভীর্যের মেঘ

এসে জড় হচ্ছে। একটু আগেই রাস্তায় দাঁড়িয়ে তিনি হো-হো ক'রে হেসে উঠেছিলেন। এখন তার বিপরীত অবস্থা। আমি অপেক্ষা করতে লাগলুম তাঁর আসল কথা শোনবার জন্যে।

জগদীশবাবু স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করছিলেন এবার। হেসে তিনি বললেন, 'জয়া-মা, তোমার অ্যাকাউণ্টে যে ভাবে টাকা জমছে তাতে আমার সন্দেহ হচ্ছে যে, তোমার কাছে ধার চাইবার জন্যে লোকের ভিড় হবে খুব। তুমি বরং এক কাজ কর। বেশ মোটা অঙ্কের টাকা ফিক্সড ডিপোজিট ক'রে রাখ। কিছু গহনা করবে না কি, মা?'

'আপনিই তো সব করলেন, গহনাও আপনি গড়িয়ে দিন।'

'বেশ, তাই হবে। কাল সকালে তোমার কাছে দোকান থেকে লোক আসবে। তোমার পছন্দমত যা দরকার সব অর্ডার দিয়ে দিও। তুমি তো মা দার্শনিক। গহনার ডিজাইন সব জানা আছে তো?'

'না, কিছু জানা নেই।'

'তা হ'লে বই দেখে ডিজাইন পছন্দ ক'রো।'

আমি জানি, গহনার অর্ডার দেবার কথা বলবার জন্যে তিনি এখানে আসেন নি। আমি তাই তাঁর পথ ধ'রেই চলতে লাগলুম। গহনা না পরলেই যে আমায় সুন্দর দেখায় তেমন কথা জগদীশবাবুর চেয়ে বেশী আর কেউ জানেন না। তিনি এ পর্যন্ত নিজেই তো কতবার আমায় বলেছেন যে, আমার বিদ্যাই হচ্ছে সত্যিকারের অলঙ্কার।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'ভবতোষের কাছ থেকে চিঠি পাও না?'

'না। প্রায় এক বছর হ'ল চিঠি পাই নি।'

'সে বোম্বেতে আছে। বিলেত থেকে চাকরি নিয়ে এসেছে। বার্মা-শেল কোম্পানিতে সে বড় চাকরিই করে।'

ভবতোষ আমায় চিঠি লেখে না বটে, কিন্তু ভবতোষ যে আমার জীবনের কতখানি জায়গা জুড়ে রয়েছে তা বোধ হয় জগদীশবাবুও জানেন না। বুকের ভেতরটা এরই মধ্যে শুকিয়ে উঠেছে। ভবতোষের

সম্বন্ধে আর কোন কথাই শোনবার আমার আগ্রহ নেই। ভয় করছে। ভাল কুকুর চরিত্রহীন শিক্ষিত লোকের চেয়েও ভাল—কথাটা আমার এখনো কানের মধ্যে লেগে রয়েছে। এর পরে জগদীশবাবু কি যে বলবেন ভেবে অস্থির হয়ে উঠলুম।

আলোচনার মোড় ঘুরিয়ে ফেললেন তিনি। বললেন, 'তোমার ঠাকুর কাল আমার ওখানে গিয়েছিল। সে দেশে যেতে চায়। দু চার দিনের মধ্যে ওকে ছেড়ে দিতে হবে। কি করবে, জয়া? নামীনাথের চেনাশুনো কোন লোক নেই?'

'কাল জিজ্ঞাসা করব।'

'কিন্তু ঠাকুর যদি তিন-চার দিনের মধ্যেই যায়, তা হ'লে জিজ্ঞাসা ক'রে খবর নেবারও সময় নেই। আমি ভাবছি নিশীথকে পাঠাব তোমার কাছে।'

'নিশীথ, সে কে?'

'আমার ওখানে পুজো করে। কিন্তু নিরক্ষর।'

'নিরক্ষর, তবে পুজো করে কি ক'রে?'

'মন্ত্র সব মুখস্থ ক'রে ফেলেছে। বিস্ময়কর স্মরণশক্তি ওর। আমি ওকে তিন বছর আগে কুড়িয়ে পেয়েছিলুম। বয়স বোধ হয় তোমার চেয়ে কমই হবে। পুরো নাম নিশীথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।'

একটু ভেবে নিয়ে বললুম, 'সে তো পুজো করে, রান্না করবার কাজ সে করবে কেন?'

'করবে। পুজো সে আর করতে চায় না। তোমার কাছে কাল পরশু যখন হয় পাঠিয়ে দেব। উপযুক্ত মনে করলে রেখে দিও।'

'আপনি পাঠিয়ে দেবেন, কথা ক'য়ে নেব। তা ছাড়া ঠাকুর বোধ হয় এখন দেশে যাওয়া স্থগিত রাখল। আজ ও দেশ থেকে চিঠি পেয়েছে, এক্ষুনি না গেলেও হয়। আসছে মাসে যাবে।'

'তাই নাকি? বেশ। নিশীথ তা হ'লে আরও কিছুদিন পুজো করুক।'

বাইরের দরজায় ল্যাসি ব'সে ছিল। এরই মধ্যে বার দুই সে চেঁচিয়ে উঠেছে। ঠাকুর চা নিয়ে আসছিল। ল্যাসি সোজা হয়ে দাঁড়াল। ল্যাজটা তুলে দিল ওপর দিকে। গম্ভীর স্বরে চেঁচিয়ে উঠল আরও একবার। জগদীশবাবু ডাকলেন, 'ল্যাসি, এদিকে আয়।' ল্যাজ নামিয়ে ল্যাসি চ'লে এল জগদীশবাবুর পায়ের কাছে।

চা খেতে খেতে জগদীশবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'রত্নার কোন খবর রাখ না?'

'না। বাইরে গিয়েছিল, ফিরেছে কি না জানি না। সুজাতাদির কাছে মাঝে মাঝে শুনতুম, খবরের কাগজে নাকি রত্নার খবর বেরুত। আজকাল তো কিছু শুনি না। আমি নিজেও খবরের কাগজ পড়ি না।'

চা খাওয়া শেষ ক'রে জগদীশবাবু বললেন, 'খুবই নাম করেছে রত্না। পয়সাও পেয়েছে প্রচুর। আমি তো নাচের কিছু বুঝি না, যাঁরা বোঝেন তাঁদের মুখেই শুনেছি, সে খুব ভাল নাচে। অমিতাভ এসেছে জান?'

'তাই নাকি? কই, বীরেশবাবু তো সেদিন কিছু বললেন না?'

'বীরেশ এখানে এসেছিল বুঝি?'

'হ্যাঁ, বোধ হয় দিন চার এসেছিলেন। সেদিন একটা কবিতা শুনিয়ে গেলেন। তাঁর মধ্যে ক্রমশই প্রগতি আসছে। কথার স্তর থেকে বীরেশবাবু এবার ভাবের স্তরে উঠছেন। রবীন্দ্রনাথের পরে বীরেশবাবুকেই ছোঁয়া যায়।'

জগদীশবাবুর সিগার ছোট হয়ে এসেছে। সিগার থেকে এক গাদা ছাই ফেলে দিয়ে তিনি বললেন, 'অমিতাভ চন্দননগরেই আছে। অসুস্থ। মা আসেন নি। তাকে একদিন তোমার এখানে নিয়ে আসব।'

'বীরেশবাবু কি এ খবর জানেন না?'

'না। অমিতাভর চোখ থেকে বীরেশ প্রেরণা পেত। সে চোখ

আর অমিতাভর নেই। বীরেশকে এখনো জানতে দিই নি। আমি এবার উঠি, জয়া-মা। শুনলুম, ভবতোষ বদলি হয়ে কলকাতায় আসছে।'

জগদীশবাবু উঠলেন। কিন্তু চ'লে যাওয়ার আগ্রহ দেখলুম না তাঁর। দক্ষিণ দিকের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর ফিরে এলেন ভেতর দিকে। আমার সামনে এসে বললেন, 'বেলজিয়াম সীমান্তে অমিতাভ গুরুতর ভাবে আহত হয়েছিল। দেশের জন্যে কেউ এমন ভাবে আহত হয় তা আমি মনে মনেও কামনা করি না। ম'রে যাওয়া অনেক ভাল ছিল। অমিতাভর একটা চোখ নেই, একটা পা আর একটা হাত ফ্রান্সের হাসপাতালে রেখে এসেছে। জীবন বলতে যেটুকু বোঝায় কেবল সেটুকুই ওর আছে। জয়া-মা, তোমার মামা এসেছিল কেন?'

'এমনি।'

'এতকাল একদিনের জন্যেও সে এমনিতে আসে নি, আজ সে হঠাৎ এলো কেন? যাদবের কাছেও তো যেতে পারত?'

'যাবেন। ছোটমামা তাঁর নিজের জীবনে প্রবল আঘাত পেয়েছেন ব'লেই হয়তো তাঁর মিথ্যে গর্ব সব নষ্ট হয়ে গেছে। গেছে, তা ঠিক। তিনি তাঁর ভুল বুঝতে পেরেছেন।'

'তোমার কাছে টাকা চায় নি অপূর্ব?'

'টাকা? কই, না! তিনি কেন টাকা চাইবেন?'

'সরকারী টাকা কিছু ভেঙে ফেলেছেন। মাইনের টাকা দিয়ে বউমা বোধ হয় সংসার চালাতে পারছেন না।'

'সর্বনাশ! ছোটমামা কেন তবে টাকা চাইলেন না আমার কাছে? এত টাকা দিয়ে আমি কি করব, জগদীশবাবু?'

'সারা জীবন স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে পরিচ্ছন্ন ভাবে জীবন কাটাবে।'

'না না, আমি ডাল ভাত খেয়ে জীবন কাটাব। জগদীশবাবু, আমি

যা মাইনে পাই তা দিয়ে একটা জীবন আমার চ'লে যাবে। আপনি আমায় অনুমতি দিন, মামার কাছে আমি যাই। ছোটমামাকে যদি আজ চেক কেটে না দিতে পারি, তা হ'লে এ চেক-বই দিয়ে আমি কি করব? এর বোঝা তো আমি বইতে পারব না। আপনি আমায় অনুমতি দিন।'

'চল আমার গাড়িতে। পৌঁছে দিয়ে আসি তোমায়। কাল বেলা ছুটোর মধ্যে অপূর্ব যদি টাকাটা ফিরিয়ে দিতে পারে, তা হ'লে চাকরিটা হয়তো ওর থাকবে।'

রত্না, আমার আজও সেই দিনটার কথা মনে পড়ে। চেকের পাতায় সই করতে আমার বার বার হাত কেঁপে যাচ্ছিল। দু-তিনটে পাতা নষ্টও হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত নাম সই ক'রে ফিরে এলুম লেক প্লেসে। জগদীশবাবু বাইরেই অপেক্ষা করছিলেন। গাড়িতে উঠে তাঁকে বললুম, 'চেক কাটতে জীবনে বোধ হয় এত আগ্রহ আমার আর কোনদিনই হবে না।'

পরের দিন একটু বেলাতেই ক্লাস ছিল। শেষও হ'ল তাড়াতাড়ি। কলেজের দোতলার বারান্দায় পায়চারি করছিলুম। সামনের মাঠে মেয়েরা বাস্কেট-বল খেলছিল। মাঝে মঝে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে ওদের খেলা দেখছিলুম। সুজাতাদি ক্লাস নিচ্ছিলেন। তাঁর সঙ্গে কি কথা আছে ব'লে তিনি আমায় খবর পাঠিয়েছিলেন অপেক্ষা করতে।

কলেজের ফটক দিয়ে মস্ত বড় একটা গাড়ি ঢুকল। গাড়ি থেকে নেমে এলি তুই। খেলা বন্ধ ক'রে মেয়েরা সব তোকে দেখতে লাগল। কেউ কেউ তোকে প্রশ্নও করছিল। আমি স্টাফ-রূমে এসে দীপ্তিদিকে বললুম, 'সুজাতাদিকে দয়া ক'রে বলবেন যে, আমার হঠাৎ একটা জরুরী কাজ প'ড়ে গেছে, তাই তাড়াতাড়ি চ'লে যাচ্ছি।'

'এত তাড়া কিসের গো?'

'না দীপ্তিদি, ঠাট্টা নয়, বলতে কিন্তু ভুলবেন না।'—আমি আর ধৈর্য ধরতে পারছিলুম না। লাফিয়ে লাফিয়ে নেমে এলুম একতলায়। মেয়েরা তখনও তোকে ঘিরে দাঁড়িয়ে ছিল। আমি এসে পৌঁছতেই মেয়েরা স'রে গেল এক ধারে। আমায় দেখতে পেয়ে তুই বললি, 'তোমার খোঁজেই এসেছিলুম, জয়াদি। তোমার আর ক্লাস নেই তো ?'

'থাকলেই বা কি, তুই এসেছিস, ক্লাস থাকলেও আজ ছুটি দিয়ে দিতুম।'

'তা হ'লে চল—অনেক কথা আছে। কথা বলবার জন্যে বুক আমার ফেটে যাচ্ছে।'

গাড়ি বেরিয়ে এলো পার্ক স্ট্রীটের দিকে। আবার সেই পুরনো রাস্তায় চললুম আমরা। তুই আমার সঙ্গে ঘেঁষেই ব'সে ছিলি। শরীরটা যেন কেমন তোর একটু মোটা-সোটা লাগছে। দেহটা আর তেমন শক্ত নেই, একটু থলথলে হয়েছে। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'এতদিন কোথায় ছিলি ?'

'বোম্বে। আমার বিয়ে হয়ে গেছে, জয়াদি।'

'সে কি রে ? সিঁদুর কই ?'

'হিন্দু মতে হয় নি। আমার স্বামী হিন্দু নন। ছেলেবেলা থেকে ভবতোষকে আমি ভালবাসতুম। আমার চারদিকের ভিড় দেখে কলকাতার লোকেরা কত দুর্নামই আমার করেছে! বিয়ে হ'ল ইতালিতে এসে। বিলেত থেকে ভবতোষ লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে এসেছিল প্যারিসে। আমাদের দলের সঙ্গে জুটে গেল। পরীক্ষা দেয় নি ব'লে লোকসান কিছু হয় নি। বার্মা-শেল কোম্পানিতে মস্তবড় চাকরি পেয়েছে ভবতোষ। কবে যাবে তুমি দেখা করতে ? জয়াদি—জয়াদি—'

'ও, হ্যাঁ, ভবতোষবাবুকে দেখতে যাব।'

'তা, তুমি অমন চুপ ক'রে গেলে কেন? আমার বিয়েটা কি তোমার পছন্দ হয় নি?'

'পছন্দ? ও, হ্যাঁ, খুব পছন্দ হয়েছে, রত্না।'

'আমি ধর্ম বদলেছি ব'লে রাগ করেছ বুঝি? মা তো আমায় ঘরে ঢুকতে দেন নি।'

'আমার ঘর খোলাই আছে—কোনদিনই আর ঘর আমি বন্ধ করব না। রত্না, লক্ষ্মীটি, আয় তোকে আজ আমি একটু আদর করি। এতদিনে মেয়েমানুষ হয়েছিস!'

তুই অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলি।

সেদিন তুই আমায় বাড়ি পৌঁছে দিয়ে গেলি বটে, কিন্তু আমার মনটা তখনও অদৃশ্য-ভবতোষের আশপাশ দিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল। কোথায় ভবতোষ? কি করছে ভবতোষ? আমার সঙ্গে কি ভবতোষ আর কথা কইবে না? সারাটা রাত আমি কাঙালের মত ভবতোষের পেছনে পেছনে ছুটে বেড়ালুম। বিছানাটার দিকে চেয়ে চোখ আমার ভিজে এলো। মনে হ'ল, হঠাৎ কেমন ক'রে বিছানার মাঝখানটা ধ'সে প'ড়ে গেল নীচের দিকে! একটা মস্তবড় শূন্যতার গহ্বর যেন আমার সমগ্র কুমারী-জীবনটাকে গিলে খেতে আসছে। আমার দেহ থেকে বুঝি সৃষ্টির ধর্মটুকুও লোপ পেয়ে গেল। উপহাসের উপকরণের মত আমি যেন ভাসতে লাগলুম গহ্বরের মুখে! এ-শূন্য শয্যা পুরুষের স্পর্শপুণ্য থেকে বঞ্চিত হ'ল চিরদিনের জন্যে।

রাতটা আর কাটতে চায় না। ভবতোষ যে আমার জীবনের কতখানি জায়গা জুড়ে ব'সে ছিল তার হিসেব করতে গিয়ে দেখি যে, আমার নিজের বলতে এক ইঞ্চি জায়গাও আর নেই। ভবতোষ চায় নি বটে, কিন্তু চাইলে সে আমার সবটুকুই পেত। ভাই রত্না, আজ এতগুলো বছর পর সেদিনের সেই রাতটার কথা ভাবতে গিয়ে কি অদ্ভুত

রকমের একটা চঞ্চলতা অনুভব করছি ! এ চঞ্চলতা কেবল মনের নয়, দেহেরও বটে ।

দু-চার দিনের মধ্যেই নিশীথ এলো কাজ করতে। জগদীশবাবু চিঠি দিয়ে ওকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। চিঠিখানা হাতে নিয়ে নিশীথ এসে দাঁড়িয়ে ছিল দরজার বাইরে। জিতেনের মা ব'লে একজন ঠিকে ঝি ছিল আমার। সে বিকেলবেলা বাসন মাজতে আসে। সে এসে আমার লাইব্রেরি-ঘরে খবর দিল যে, কে একজন লোক আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

লাইব্রেরিতেই ডেকে পাঠালুম ওকে। মাথা নীচু ক'রে নিশীথ এসে দাঁড়াল আমার সামনে। আমি লক্ষ্য করলুম, নিশীথের মাথায় ছোট্ট একটা টিকি আছে। লম্বা চুলের মাঝখানে টিকির অস্তিত্ব লুকিয়ে রাখবার চেষ্টা করেছে বটে, কিন্তু লুকিয়ে রাখতে সে পারে নি। ধুতি পরেছে নিশীথ। হাঁটুর ওপরে ধুতির প্রান্ত উঠে রয়েছে। হাঁটু থেকে পায়ের আঙুল পর্যন্ত সবটাই দেখা যাচ্ছে। ফরসা রঙ তাজা রক্তের সঙ্গে মিশে গিয়ে চামড়ার ওপরে পাকা সোনার মত উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। প্রাচীন কালের গুরুগৃহে কৈশোরের কর্তব্য শেষ ক'রে নিশীথ যেন তার প্রথম-যৌবনের স্বাস্থ্যসূচনা নিয়ে এসে আমার সামনে উপস্থিত হয়েছে।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'তোমার নাম কি ?'

'নিশীথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।'

'দেশ ?'

'বর্ধমান জেলার শক্তিগড়ে।'

'দেশে কে আছেন ?'

'দূরসম্পর্কের আত্মীয়স্বজন।'

'বাবা, মা, ভাই, বোন, তাঁরা কোথায় ?'

'ভাই বোন নেই। বাবা মা স্বর্গে চ'লে গেছেন।'

'তুমি মানুষ হ'লে কার কাছে ?'

আমার প্রশ্ন শুনে নিশীথ চুপ ক'রে রইল আমি বুঝলুম, নিশীথ কি যেন ভাবছে। প্রশ্নটার মধ্যে বোধ হয় জটিলতা রয়েছে। হয়তো কোন একটা গোপন ব্যথার নরম অনুভূতির গায়ে প্রশ্নটা গিয়ে আঘাত করল। ওর জবাব শোনবার জন্যে আমি অপেক্ষা করতে লাগলুম।

একটু পরে নিশীথ বলল, 'আমি তো মানুষ হতে পারি নি, আমি নিরক্ষর।' এই ব'লে নিশীথ তার গায়ের চাদরটা টেনে-টুনে ভাল ক'রে ছড়িয়ে দিতে লাগল প্রশস্ত বুকের ওপর। আমি দেখলুম, ওর ঘাড়ের ওপর থেকে একটা পৈতের গোছা নেমে এসেছে তলার দিকে। পৈতেটা ও কেন যে লুকতে চাইছে বুঝতে পারলুম না। বর্ণাশ্রম ধর্মের দেশে সবচেয়ে উঁচুতলার মানুষ ওরা। তাই বোধ হয় সারা মুখের ওপরে নিরক্ষরতার এতটুকু ছাপ পড়ে নি। উপরন্তু, ভারতবর্ষের প্রাচীন ঐতিহ্যের পুরোদস্তুর প্রমাণ পেলুম নিশীথের কথায়।

আমি বললুম, 'নিরক্ষরতার কথা আমি জানতে চাই নি। আমি জিজ্ঞাসা করছিলুম, বাবা মা মারা যাওয়ার পরে এতগুলো বছর তুমি কার কাছে ছিলে? কেমন ক'রে বড় হ'লে?'

'ভগবানের দয়া না পেলে অনেক দিন আগেই ম'রে যেতুম।'

'তাই নাকি? তুমি ব'স না ওই চেয়ারটায়। তোমার সঙ্গে একটু আলোচনা করি।'

একটু হেসে নিশীথ জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার এখানে কি আমার কাজ হ'ল না?'

'হ'ল। মাইনে কত চাও?'

আমার প্রশ্ন শুনে নিশীথ আবার হেসে ফেলল। ওর হাসির সামনে যেন আমার একটা প্রশ্নও মাথা তুলে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। বড্ড অপ্রস্তুত বোধ করতে লাগলুম আমি। নিশীথের মুখের দিকে চেয়ে আমি আর কথা কইতে পারছি না। বিকেলের রোদ ক্রমশই লাইব্রেরি-ঘর থেকে অন্তর্হিত হয়ে যাচ্ছে। ও-পাশের

বাড়িটার লম্বাকৃতি ছায়াটা এরই মধ্যে পৌঁছে গেছে আমার লাইব্রেরি-ঘরের দরজায়। নিশীথের সামনে থেকে স'রে যাওয়ার জন্যেই বোধ হয় ভাবছিলুম যে, বাইরে থেকে একটু বেড়িয়ে আসব। বীরেশবাবুর সঙ্গে দেখা হয় নি অনেক দিন। তাঁর ওখানে যাওয়ার জন্যেই মন স্থির ক'রে ফেললুম। কোন কথা না ব'লে বেরিয়ে আসছিলুম। এমন সময় নিশীথ জিজ্ঞাসা করল, 'বিকেলের চা খাওয়ার কি সময় হয় নি আপনার? কখন চা খান?'

দরজার বাইরে এসে দাঁড়িয়ে গেলুম। বললুম আমি, 'কিছুদিন আগে পর্যন্ত কেবল চা খাওয়ার নয়, ভাত খাওয়ারও ধরা-বাঁধা সময় একটা ছিল, কিন্তু এখন আর সময় সম্বন্ধে আমার কোন নিয়ম নেই।'

'নিয়ম একটা থাকা উচিত।'—এই ব'লে নিশীথও বেরিয়ে এলো বাইরে। এসে পুনরায় সে বলল, 'রান্নাঘরটা আমায় দেখিয়ে দিন।'

'শুধু রান্নাঘরটা দেখলেই তো চলবে না, এই ফ্ল্যাটের প্রতি ইঞ্চি জায়গা তোমায় দেখে নিতে হবে। সময়মত কেবল চা খাওয়াবার দায়িত্ব নিলে চলবে না, নিশীথ—'

'দিদিমণি—'

এ কি ডাক? এমন ক'রে কে ডাকল আমায়? লাইব্রেরি-ঘরটার বাইরে করিডোরের স্বল্প-পরিসরটুকুতে যেন নতুন আত্মীয়তার হাওয়া উঠল! এ হাওয়া কোথা থেকে এলো? আমি অনুভব করলুম, এ হাওয়ার মধ্যে কেবল আত্মীয়তার আহ্বান নেই, অপরিমিত স্বাস্থ্যের উপাদানও রয়েছে। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যেন নতুন বসন্তের আরাম উপভোগ করতে লাগলুম। বিগত দিনের ঘটনাসমুদ্রে ডুব দিয়ে খুঁজতে লাগলুম, আমার জীবন-ইতিহাসের কোন একটা পাতায় এমন বসন্তের পরিচয় আছে কি না!

নিশীথ আবার আমায় ডাকল, 'দিদিমণি—'

অতীত ইতিহাসের কোলাহল থেকে ফিরে এলুম আমি। জিজ্ঞাসা করলুম, 'এমন ক'রে কে তোমায় ডাকতে শেখালে ?'

নিশীথ আবার হাসতে লাগল। আমার প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে সে বলল, 'দায়িত্ব আমি নিলুম, দিদিমণি।'

'তবে এস আমার সঙ্গে।'

কেবল রান্নাঘর নয়, সবগুলো ঘরই ওকে আমি দেখিয়ে দিলুম। এক তাড়া চাবি ওর হাতে তুলে দিয়ে বললুম, 'আমার নিজের হাতে কোন দায়িত্বই আর রইল না। আমি বেঁচে গেলুম। নিশীথ—'

'দিদিমণি—'

'আমার জন্যে ভাত রাঁধতে তোমার লজ্জা করবে না ?'

'না।'

'তোমায় দিয়ে ভাত রাঁধাতে আমার লজ্জা করছে। পুজো করাই তো তোমার উপযুক্ত কাজ ছিল।'

সহসা জবাব দিল না নিশীথ। একটু ভেবে নিয়ে সে বলল, 'বোধ হয় মানুষের জন্যেই আমি কাজ করতে চেয়েছিলুম, রক্তমাংসের মানুষ। আপনি লাইব্রেরি-ঘরে গিয়ে বসুন, চা নিয়ে আসছি।'

'না, তুমি বরং ঘরদোর সব গুছিয়ে নাও। আমি এক্ষুনি বাইরে বেরুচ্ছি। তোমার কি বিছানাপত্র কিছু নেই ? জামাকাপড় ?'

'যা দরকার সবই আমার আছে।'

ক'টা দিন কেমন ক'রে যে কেটে গেল টের পেলুম না। লেক প্লেসের পুরনো সংসারটাকে নতুন ক'রে সাজাতে লাগলুম আমি। জানলা-দরজার পর্দা সব বদলে ফেললুম। একটু সস্তা দরের মোটা কাপড়ের পর্দা ছিল সেগুলো। চৌরঙ্গীর দোকান থেকে বিলিতী পর্দা এলো। প্রত্যেকটা ঘরের মেঝের জন্যে এলো দামী কার্পেট। পর্দার

সঙ্গে রঙের সামঞ্জস্য রেখে কার্পেট কিনে নিয়ে এলুম আমিই। নতুন জীবনের একটা পোশাকী প্রারম্ভ প্রত্যক্ষ হয়ে উঠতে লাগল প্রতি-দিনই। লেক প্লেসের ফ্ল্যাটের প্রতি ইঞ্চি আয়তনের মধ্যে নতুন জীবনের বীজ বপন করলুম আমি—প্রাচুর্যের সমারোহের মধ্যে বীজের পরিণতি এবার সবাই ব'সে ব'সে দেখুক।

জগদীশবাবু নিজেও বোধ হয় এমনটাই দেখতে চেয়েছিলেন। সংসারের সব রকম সুখ-সুবিধার প্রতি আমার অনাসক্তি লক্ষ্য ক'রে তিনি মনে মনে কষ্ট পাচ্ছিলেন। আমার এই অনাসক্তির জন্যে এতকাল তিনি জগতের যাবতীয় দর্শনশাস্ত্রগুলোকে দায়ী ক'রে রেখেছিলেন, কিন্তু অধুনা তিনি তাঁর ধারণা বদলে ফেলেছেন। কেমন ক'রে তিনি যেন বুঝতে পেরেছেন যে, আমার অনাসক্তির সঙ্গে বার্মা-শেল কোম্পানির ভবতোষের কোথাও একটা যোগাযোগ ছিল। তাঁর দৃষ্টিশক্তির প্রতি শ্রদ্ধা আমার বেড়েছে। তিনি ছাড়া সংসারে আর কে আমায় এমন ক'রে দেখবার চেষ্টা করেছেন?

সেদিন তিনি আমার ফ্ল্যাটের পরিবর্তন লক্ষ্য ক'রে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'হঠাৎ কেন সব বদলে ফেললে, জয়া-মা?'

'হঠাৎ নয়, বদলে ফেলবার পরিকল্পনা অনেক দিন থেকেই ছিল। কেন, আপনার কি ভাল লাগছে না? বীরেশবাবুর তো খুব ভাল লেগেছে। তিনি বললেন, খুব আর্টিস্টিক হয়েছে। দু দণ্ড নিরি-বিলিতে ব'সে বিশ্রাম করবার মত জায়গা।'

আলোচনার বিষয়বস্তু বদলে ফেলে জগদীশবাবু সহসা জিজ্ঞাসা করলেন, 'বীরেশ কি তার নিজের ফ্ল্যাটে বিশ্রাম পাচ্ছে না?'

'বোধ হয় না।'

'বড্ড বেশী হাঁপিয়ে পড়েছে বীরেশ। ওর নতুন কবিতার বইটা পড়লুম সেদিন। আমি বুড়ো মানুষ—গোটা বইটা শেষ ক'রে যখন উঠলুম তখন মনে হ'ল, আমিও হাঁপিয়ে উঠেছি।' একটু থেমে

জগদীশবাবুই আবার বললেন, 'কবিতা লেখবার প্রেরণা বীরেশের বোধ হয় ফুরিয়ে এলো।'

'এ কথা কেন বলছেন ?'

'সেই মেয়েটি ওর সব কিছু নিয়ে গেছে। যদিবা বীরেশ নিজের কাছে কিছু ধ'রে রেখেছিল, তাও সে এই শেষের বইটাতে নিঃশেষ ক'রে দিয়েছে। বুড়ো বয়সে হয়তো বিশ্রী রকমের একটা ট্র্যাজেডি আমায় দেখে যেতে হবে। কবিতা না লিখে বীরেশের উচিত ছিল তোমায় বিয়ে করা। রত্নার অভাব মিটিয়ে দিতে পারতে তুমি—কেবল তুমি-ই।' এই পর্যন্ত ব'লে জগদীশবাবু চুপ ক'রে ব'সে রইলেন। আমি বুঝলুম, ছেলের বউ ক'রে আমায় ঘরে তোলবার লোভ থেকে তিনি আজও মুক্তি পান নি। একটা ট্র্যাজেডি দেখতে হবে ব'লে তিনি ভয় পাচ্ছেন, কিন্তু মরবার আগে তাঁকে যদি আরও গোটা তিন-চার দুর্ঘটনা দেখে যেতে হয় তা হ'লে তিনি কি করবেন ?

পুরনো সিগারটা শেষ ক'রে জগদীশবাবু একটা নতুন সিগার ধরালেন। সিগারটা ধরাবার জন্যে তিন-চারটে দেশলাইয়ের কাঠি নষ্ট করলেন তিনি। এটা যে তাঁর ইচ্ছাকৃত তা বুঝতে আমার কষ্ট হ'ল না। আমার মন্তব্য শোনবার জন্যে জগদীশবাবু অপেক্ষা করছেন। আমি ভাবলুম, বীরেশবাবুর আলোচনা নিয়ে বাকি সময়টা কাটিয়ে দেওয়াই ভাল। নইলে তিনি হয়তো ভবতোষের কথা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠবেন।

আলোচনা আরম্ভ করবার জন্যে আমি চাইলুম জগদীশবাবুর মুখের দিকে। গত কয়েকটা মাস তাঁকে আমি ভাল ক'রে দেখি নি। আজ যেন মনে হ'ল, তাঁর সারা মুখে বার্ধক্যের ছাপ পড়েছে খুব গভীর ভাবেই। বড়মামার চেয়ে তিনি বয়সে বড়। কিন্তু এ যাবৎকাল তাঁকে দেখে তা বোঝা যেত না। আমার দৃষ্টিতে আজ তাঁর ভেতরের স্বাস্থ্যহীনতা ধরা পড়ল। এ স্বাস্থ্যহীনতার কারণ কি ? কবি বীরেশ

রায়ের গোপন-দুঃখ কি পিতা জগদীশ রায়ও বহন করছেন? বোধ হয় তাই। কবি বীরেশ রায়ের জন্যে দুর্ভাবনা তাঁর কোনদিনই ছিল না, কিন্তু তাঁর প্রথম স্ত্রীর একমাত্র সন্তান বীরেশের জন্যে ভাবনার অন্ত নেই। এ ভাবনা তাঁকে ভেতরে ভেতরে ভেঙে দিয়েছে।

আমি বললুম, 'প্রেরণার জন্যে মেয়েদের ভালবাসার ওপর বীরেশবাবু আর নির্ভরশীল নন।'

'তবে?'—চোখের মণি দুটো ওপরের দিকে তুলে দিয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তবে তার প্রেরণার উৎস কোথায়? তুরীয় লোকে?'

'না। নিছক সৌন্দর্যের বাইরে তাঁর প্রেরণার কোন উৎস নেই। অধুনা গ্রীক-পুরাণের অরণ্যে তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তাঁর কাছে সেদিন শুনলুম, আধুনিক যুগের অমিতাভ সেনের পৌরাণিক-প্রতিচ্ছবি তিনি সেই অরণ্য থেকে সংগ্রহ ক'রে নিয়ে এসেছেন। বীরেশবাবুর বিশ্বাস অমিতাভ সেনের সৌন্দর্য তাঁর প্রেরণার উৎস।'

জগদীশবাবু বললেন, 'ছিঃ! শুনতে বড্ড অস্বাভাবিক লাগছে। একজন যুবতী মেয়ের সামনে দাঁড়িয়ে বীরেশ কি ক'রে অন্য একজন পুরুষের সৌন্দর্যের মধ্যে ডুবে থাকতে পারে আমি তা বুঝতে পারি না, জয়া। কিন্তু—।' জগদীশবাবু আধ-পোড়া সিগারটা ছাইদানি থেকে তুলে নিয়ে পুনরায় বলতে লাগলেন, 'বীরেশ নিজেকে ফাঁকি দিচ্ছে। রত্নাকে ও ভুলতে পারছে না। পারা সম্ভবও নয়। মা জয়া—'

কথাটা শেষ না ক'রে জগদীশবাবু উঠলেন। তিনি গিয়ে দাঁড়ালেন পুব-দিকের শেল্‌ফটার কাছে। কি ভাবলেন যেন দু-এক মিনিট। তারপর সেখান থেকে ফিরে এলেন আবার। আমি বুঝলুম, জগদীশ-বাবু বিচলিত হয়ে পড়েছেন।

'মা জয়া, বীরেশ যদি দ্বিতীয় শ্রেণীর কবিতা লিখত, আমি বুঝতুম যে, রত্নাকে সে একদিন অতি অনায়াসেই ভুলে যাবে। কিন্তু বীরেশ প্রথম দিন থেকেই প্রথম শ্রেণীর কবিতা লিখতে আরম্ভ করল। এই

শেষের বইটা প'ড়ে আমি বুঝতে পেরেছি, বীরেশ ফুরিয়ে এসেছে। অমিতাভ ওকে বাঁচাতে পারবে না, রত্না তো অনেক দূরে—কেবল তুমি, জয়া-মা, কেবল তুমি-ই ওর কাছে আছ। আমি ওর বাবা—বীরেশের কবিতার চেয়ে বীরেশ আমার কাছে বেশী মূল্যবান। আজ আমি চলি, মা। কথাটা ভেবে দেখো।'

আমিও উঠলুম। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে দরজা পর্যন্ত গেলুম। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'অমিতাভ সেন যে ভারতবর্ষে এসেছে, বীরেশবাবু কি তা আজও জানেন না ?'

'জানতে দিই নি। এবার অমিতাভকে এনে ওর সামনে আমি দাঁড় করিয়ে দিতে চাই। আমি বুঝতে চাই, সৌন্দর্য ওর কাছে কতখানি সত্য।'

আমরা এসে ঘরের বাইরে দাঁড়ালুম। ল্যাসি যে এতক্ষণ ঘরের বাইরে ব'সে অপেক্ষা করছিল আমি তা জানতুম না।

জগদীশবাবু হাসতে হাসতে বললেন, 'যাবার সময় ল্যাসিকে তোমায় দিয়ে যাব। ল্যাসিও মানুষের সুখ-দুঃখের অংশ নিতে শিখেছে।'

আমিও হাসতে হাসতে বললুম, 'দিলেন তো অনেক, আর আমার বোঝা বাড়িয়ে লাভ কি ?'

'সত্যিই, যা দিলুম সবই বোঝা! যা পেলে তুমি হালকা বোধ করতে তা দেওয়ার ক্ষমতা আমার নেই।' দুটো সিঁড়ি নীচে নেমে গিয়ে তিনিই আবার বললেন, 'অফিসের কাজে ভবতোষ আবার বিলেত গেছে।'

খবরটা শুনে মুহূর্তের মধ্যে বুকের ভেতরটা আমার শুকিয়ে গেল। ব্যস্তভাবে আমি বললুম, 'এই সময়ে ওর তো বিলেত যাওয়া উচিত হয় নি। জার্মানির ডুবোজাহাজ সব জলের তলায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভবতোষকে কি আপনি চেনেন ?'

'লোকের মুখ থেকে যতটুকু চিনতে পেরেছি। মরবার আগে আর বেশী চিনতে চাইনে, মা।'

জগদীশবাবুর সঙ্গে সঙ্গে আমি একতলা পর্যন্ত এলুম। গাড়িতে ওঠবার আগে তিনি বললেন, 'রোমান ক্যাথলিকদের বিশ্বাস, আমাদের ভগবানের চেয়ে তাঁদের ভগবান বেশী বিশুদ্ধ, বেশী বাস্তব। তা যদি হয়, তবে ভবতোষের কোন অকল্যাণ হবে না। জান, রত্না তার সঙ্গে যায় নি?'

'না, আমি তা জানি না।'

'সে আবার নতুন এক নাচের পার্টি তৈরি করেছে। সৈনিকদের শিবিরে শিবিরে ঘুরে সে তাদের নাচ দেখাচ্ছে। ভাল কাজ করছে রত্না। যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে মরবার আগে তারা সব রত্নার নাচ দেখে যাচ্ছে। ভাল কথা মনে পড়েছে। আসছে রবিবার রত্না একটা নতুন ধরনের ডান্স-ড্রামা দেখাচ্ছে নিউ এম্পায়ারে। ওটা লিখে দিয়েছে কবি বীরেশ রায়।'

জগদীশবাবুর সঙ্গে সঙ্গে ল্যাসিও লাফিয়ে উঠে বসল গাড়িতে।"

॥ চতুর্দশ রাত্রি ॥

"কি একটা উপলক্ষ্যে সেদিন কলেজ আমার বন্ধ ছিল। ভাবছিলুম, ছোটমামার ওখানে একবার যাব। অনেক দিন তাঁর সঙ্গে দেখা হয় নি। বড়মামার কাছে অবিশ্যি মাঝে মাঝে যাই। ভবতোষের কথা তিনি জিজ্ঞাসা করেন। জানতে চান তিনি, সে বিলেত থেকে ফিরে এসেছে কি না। তাঁর প্রশ্নের জবাব আমি দিই নি, প্রতি বারই এড়িয়ে গেছি। কোন রকমের গণ্ডগোল যে একটা ঘ'টে গেছে তা তিনি বুঝতে পেরেছেন। সত্যি ঘটনাটা আমার মুখ থেকে শুনলেও তিনি খুব বেশী বিস্মিত হতেন না। প্রথম দিন থেকেই বড়মামা ভবতোষের প্রতি বিরূপ।

রাস্তার দিকের বারান্দায় এসে দাঁড়ালুম। সকাল থেকে লাইব্রেরি-ঘরটা নিয়ে বড্ড ব্যস্ত ছিলুম। বইগুলোকে সব বাক্সবন্দী ক'রে তুলে দিয়েছি চারতলার চিলেকোঠায়। শেলফগুলোকেও সেখানে পাঠিয়ে দিয়েছি। বিদ্যা তো কিছু কম হয় নি, দিন রাত এক গাদা মোটা মোটা বই সামনে নিয়ে ব'সে থাকতে আর ভাল লাগছিল না। চশমার লেন্স মোটা হচ্ছিল ক্রমশই। মাথা-ধরাটাও যেন নিত্যকার ব্যাধি হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

লাইব্রেরি-ঘরটা এখন বসবার ঘর হ'ল। মাঝে মাঝে নিশীথ এসে উঁকি দিয়ে দেখে যাচ্ছিল আমার লাইব্রেরি-ঘরের নতুন পরিবর্তন। একবার সে আমায় জিজ্ঞাসা করল, 'লেখাপড়া সব ছেড়ে দিলে বুঝি?'

'হ্যাঁ।'

'কেন?'

'এখন কেবল এখানে ব'সে হাওয়া খাব আর ফুলের গন্ধ শুঁকব।'

'তা ওখানে আবার একটা খাট পাতলে কেন?'

'কখনো যদি কোন অতিথি আসে, তা হ'লে থাকতে দেব কোথায়?'

'অতিথি ?'—নিশীথের সুরে যেন মস্ত বড় একটা জিজ্ঞাসার চিহ্ন ভেসে উঠল। সুরটা মিলিয়ে যাওয়ার আগে নিশীথই আবার বলল, 'চল, খাবার সব টেবিলে দিয়ে দিয়েছি। জিতেনের মা আজ আর ও-বেলায় আসবে না।'

'কেন ?'

'কালীঘাটে যাবে পুজো দিতে।'

'জিতেন ছাড়া তো ওর আর কেউ নেই। যত দূর শুনেছি, জিতেন তার স্ত্রী-পুত্র নিয়ে সুখেই আছে। তবে সে অত পুজো দেয় কার জন্যে ? আমার সুখের জন্যে নিশ্চয়ই না!' আমি জানতুম, নিশীথ কোন জবাব দেবে না। বোধ হয় ওকেই খানিকটা আঘাত দেওয়ার জন্যে বললুম, 'তোদের তো শুনেছি কোটি কোটি দেব-দেবী, কিন্তু ওঁরা বোধ হয় কেউ চোখে দেখতে পান না। জিতেনের মাকে বল্ না, আমায় একটা তাবিজ কিনে এনে দিতে। জানিস, এমন তাবিজ আছে যা পরলে সব কিছু পাওয়া যায় ?'

'তোমার অভাব কিসের, দিদিমণি ?'

এবার আমি আর জবাব দিলুম না, কেবল বললুম, 'খিদে পেয়েছে।'

বারান্দায় এসে দাঁড়ালুম। ট্রাম-লাইনের ওধার থেকে একটা গাড়ি এসে থামল আমাদেরই ম্যানসনটার সামনে। তোর গাড়ি। গাড়ির হর্ন বাজাচ্ছিল ড্রাইভার। আমি তাড়াতাড়ি নীচে নেমে এলুম। তুই বললি, 'শীগগির চ'লে এস, জয়াদি।'

'কোথায় ?'

'যে দিকে দু চোখ যায়। শাড়ি বদলাবার দরকার নেই।'

'তুই চল্ না ওপরে, একদিনও তো আমার ফ্ল্যাটটা দেখলি না, রত্না?'

'আজ নয়, অন্য একদিন হবে। তুমি বরং কাপড়টা বদলেই এস, আমি গাড়িতে বসছি।'

তোর হুকুম পালন করতে আমার দশ মিনিটও লাগল না। গাড়ি চলতে লাগল। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'এত দিন কোথায় ছিলি?'

'নেচে বেড়াচ্ছিলুম, জয়াদি।'

একটু ভেবে নিয়ে তুই-ই আবার বললি, 'ভারতবর্ষের এ প্রান্ত থেকে সে প্রান্ত, সৈনিকদের শিবিরে শিবিরে। বোধ হয় শিল্পের জন্যে নয়, স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যে আমি নেচে বেড়িয়েছি।'

তোর কথা শুনে আমি ঘুরে বসলুম। ভাল ক'রে দেখতে লাগলুম তোকে। দেহটা তোর সত্যিই একটু চর্বিপ্রধান হয়ে উঠেছে। তোর শিল্পের জন্যে তোর দেহটার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'বিয়ের পরে একটু অসতর্ক হয়ে পড়েছিলি, না? সাধনা ছাড়া দেহশিল্পকেও রক্ষা করা যায় না।'

'এ সম্বন্ধে পরে কথা হবে, জয়াদি।'—এই ব'লে তুই ড্রাইভারের দিকে ইশারা ক'রে আমায় আবার বললি, 'নিউ মার্কেটে যাচ্ছি। অফিসের কাজে ভবতোষ বিলেত গেছে। বড়দিন শেষ ক'রে তবে সে কলকাতায় ফিরবে। ওর জন্যে কটা জিনিস কিনব, উপহার পাঠাব। জানুয়ারি মাসের দশ তারিখ পর্যন্ত ভবতোষ লণ্ডনেই থাকবে।'

'ভবতোষবাবুকে এই সময় বিলেতে যেতে দিলি কেন? ভয় করল না তোর? সেদিন কলেজে শুনছিলুম, জার্মানির ডুবো-জাহাজগুলো নাকি বড্ড বেশী উৎপাত শুরু করেছে!'

'ভবতোষ গেছে উড়ো-জাহাজে। অবিশ্যি তাতেও ভয় কম নয়। কিন্তু ওকে যেতেই হ'ল। আমিও খানিকটা অবকাশ চেয়েছিলুম।'

'রত্না!'

'চল, এসে গেছি।'

মার্কেট থেকে জিনিসপত্র কিনতে খুব দেরি হ'ল না। সুটের জন্যে সাড়ে তিন গজ বিলিতী কাপড় কিনলি তুই। তোর রুচির প্রতি শ্রদ্ধা বাড়ল আমার। পুরো হাতের বিলিতী উলের 'পুল-ওভার'টা যখন কিনলি

তখন আমি দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করলুম, 'এর জুড়ি নেই?' দোকানদার ঠিক ওই রকমের একটা পুল-ওভার আমার হাতে দিয়ে বলল, 'সাধারণত ঠিক এক রকমের ছুটো পাওয়া যায় না। ভাগ্যগুণে আপনি আজ পেয়ে গেলেন।'

তারপর তোর মত স্যুটের কাপড়ও কিনলুম সাড়ে তিন গজ। প্যাকেটটা হাতে নিয়ে বললুম, 'ফরসা মানুষের পক্ষে রঙটা খুব ভাল হবে।'

গাড়ির দিকে হাঁটতে হাঁটতে তুই বললি, 'ভবতোষ কিন্তু ফরসা নয়।'

'ও! তাই নাকি!'—এই ব'লে আমি তোর আসল প্রশ্নটা শোনবার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলুম। গাড়িবারান্দার তলায় এসে তুই আমায় জিজ্ঞাসা করলি, 'এ সব কার জন্যে নিলে? তোমার ফরসা মানুষটি কে, জয়াদি? আমায় কেন বল নি?'

'সত্যি বলছি, কেউ নয়!'

'তবে এ সব কিনলে কেন?'

'এমনি। ইচ্ছে করল কিনতে, কিনে ফেললুম।'

'কাউকে তুমি ভালবাস নি, জয়াদি?'

'তোর সেই 'প্রেমের প্রতিশোধ' নাচ দেখবার পরে সাহস সব হারিয়ে ফেলেছি। কোন কিছুর জন্যেই আমি প্রতিশোধ নিতে রাজী নই।'

'তবে এ সব কিনলে কেন?'

'তোর বিয়েতে তো কিছুই দিই নি। আমার হয়ে এটাও না হয় ভবতোষবাবুকে পাঠিয়ে দে।'

'না, জয়াদি। তার সঙ্গে দেখা হ'লে তুমি নিজেই তাকে দিয়ো।'

'বেশ, তাই হবে।'

আমরা আবার গাড়িতে এসে উঠলুম। চৌরঙ্গীর রাস্তায় এসে তুই

বললি, 'আমার ওখানে গিয়েই চা খাওয়া যাবে। আমার বাড়ি যেতে তোমার আপত্তি নেই তো? চাকর চাপরাসী ছাড়া আমার ওখানে আর কেউ নেই।'

'বেশ তো, চল্, আপত্তির কি আছে! তোরা কোথায় বাড়ি নিয়েছিস?'

'এখান থেকে খুবই কাছে, রডন ষ্ট্রীটে।'

রডন ষ্ট্রীটের বাড়িটার কথা আজ তোর মনে পড়বে কি না জানি না। ও-বাড়িতে তোরা বেশীদিন থাকিস নি। আজ চিঠি লিখতে ব'সে সেই বাড়িটার কথা স্পষ্ট মনে পড়ছে আমার। দুতলা বাড়ি। একতলায় তোরা থাকতিস। ওপরের তলায় থাকতেন বার্মা-শেল কোম্পানিরই একজন উঁচুদরের সাহেব। বিলিতী কায়দায় বাড়িঘর সাজানো ছিল। গাড়িটা বাড়ির ভেতরে ঢুকতেই তোর বেয়ারা রণবীর সিং এসে সামনে দাঁড়াল। তার হাতে তুই তোর কাপড়ের প্যাকেটটা দিয়ে দিলি। আমারটা আমি গাড়িতেই রেখে যাচ্ছিলুম, তুই বললি—'জয়াদি, ওটা নিয়ে এস। ড্রাইভারকে এবার ছেড়ে দিতে হবে।'

ভেতরে এলুম আমরা। দু পা সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে দেখলুম, ডান দিকের ঘরটাই তোদের ড্রইং-রুম। মস্তবড় ঘর। দরজাটার ঠিক উল্টো দিকের দেয়ালে বিরাট একটা ছবি টাঙানো রয়েছে। ক্রুশ-বিদ্ধ যীশুখ্রীষ্টের ছবি। পেছন দিকে চেয়ে দেখলুম, তুই সেখানে নেই। আমি এগিয়ে গেলুম দেয়ালের দিকে। পঞ্চদশ শতাব্দীর সিসিলি দেশের এক বিখ্যাত শিল্পীর আঁকা ছবি এটা। হাতের তালু থেকে রক্ত পড়ছে—মনে হয় রঙ নয়, সত্যিকারের রক্ত। উনিশ শো একচল্লিশ খ্রীষ্টাব্দের এই স্মরণীয় সন্ধ্যাটিতে ভবতোষের ড্রইং-রুমে এসে দেখলুম রক্তের বিন্দুগুলো আজও শুকয় নি।

'এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি দেখছ, জয়াদি?'—ঝড়ের বেগে তুই

এসে ঘরে ঢুকলি। আমি বললুম, 'চোর। একটা নয়—দু দিকে দুটো। তাদের হাত থেকে রক্ত পড়ছে।'

'মাঝখানটায় কিছু দেখলে না?'

'না। মাঝখানটা ফাঁকা!' তুই তখন বলতে লাগলি, 'তুমি ঠিকই বলেছ। ধর্ম পালনের জন্যে ভবতোষের চেষ্টার ত্রুটি নেই। ধর্ম-জীবনের এবং চাকরি-জীবনের দুটো উন্নতিই ওর সমান কাম্য। বড় সাহেবের সুনজরে পড়বার জন্যে ভবতোষ এই সময়েও বিলেত যেতে রাজী হ'ল। অন্য কেউ যেতে চায় নি। জয়াদি, ভবতোষের মত ফ্যানাটিক ভগবানের রাজ্যে দু-চারজন থাকতে পারে, কিন্তু শিল্পের রাজ্যে একজনও নেই। জান, আজ পর্যন্ত ভবতোষ একদিনও আমার নাচ দেখে নি?'

'না, তুই না বললে কি ক'রে জানব?'

'তা হ'লে চল, আমার ঘরে গিয়ে বসবে। সেখানেই চা আনতে বলেছি।'

'তোর ঘর কি আলাদা না কি রে, রত্না?'

'না, এখনও আলাদা নয়।'

'তা হ'লে এখানেই চা আনতে ব'লে দে।'

'কেন? তুমি কি খুব গোঁড়া না কি, জয়াদি?'

'সে প্রশ্ন অবান্তর। স্বামী-স্ত্রীর শোবার ঘরটা বাইরের লোকের না দেখাই উচিত।'

'তুমি তো বাইরের লোক নও।'—আমার হাত ধ'রে টানতে লাগলি তুই। তোদের শয়ন-কামরায় আমি গিয়ে উপস্থিত হলুম। কেন যে হঠাৎ তুই আমায় তোদের শোবার-ঘরে নিয়ে সব কিছু দেখাতে লাগলি আমি তা তখন বুঝতে পারি নি। দুটো খাট দেখলুম ঘরের দু দিকে পাতা রয়েছে। মাঝখানে অনেকটা দূরত্ব। বিছানা থেকে শুরু ক'রে ঘরের প্রত্যেকটা জিনিসই খুব সুন্দরভাবে সাজানো। নতুন বিবাহিতার অসতর্কতা কোথাও দেখতে পেলুম না।

চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে দক্ষিণ দিকের দেয়ালের দিকে এগিয়ে গেলি তুই। একটা ছবির দিকে আঙুল তুলে তুই বললি, 'এটা আমাদের বিয়ের ছবি। হিন্দু মতে হয় নি ব'লে পোশাক-পরিচ্ছদ আমাদের অন্য রকমের।'

'তা হোক। বিয়ের চেয়ে পোশাক-পরিচ্ছদ বেশী মূল্যবান নয়। হ্যাঁ রে রত্না, চট ক'রে ধর্মটা বদলে ফেললি কি ক'রে?'

'প্রথমে তাই নিয়ে তো ভবতোষের সঙ্গে খুবই গণ্ডগোল বেধে গিয়েছিল। আমার হোটেলে কোথা থেকে ভবতোষ একজন পাদ্রীকে ধ'রে নিয়ে এল। পাপ কি? স্বর্গ কি? নরক কি?—দিনরাত কানের কাছে ফিসির ফিসির করতে লাগলেন পাদ্রী সাহেব। আমরা তখন ভেনিসে ছিলাম। নাচ দেখাতে গেছি। টিকিট সব বিক্রি হয়ে গেছে। পাদ্রী সাহেব আর ভবতোষ জোঁকের মত লেগে রয়েছে—শেষে সাজঘরে যাওয়ার আগে মত দিয়ে দিলুম। কাপড় বদলাবার চেয়েও দেখলুম ধর্ম বদলানো সহজ হ'ল। এমন জানলে, বেচারী ভবতোষকে এত কষ্ট দিতুম না। জয়াদি, তোমার চা যে ঠাণ্ডা হয়ে গেল, আর এক পেয়ালা গরম চা এনে দেবে?'

'না, ঠাণ্ডা চা-ই আমি খাই। তোর কথা শুনতে ভাল লাগছে। তার পর কি হ'ল?'

'ভেনিসে তখন বড্ড মশার উৎপাত—মসটিকা। কেষ্টনগরে বাবার একটা পুরনো বাড়িতে কিছুদিন আমরা ছিলুম—'

বাধা দিয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'ভেনিস থেকে হঠাৎ আবার কেষ্টনগরে চ'লে এলি কেন?'

'মশার জন্যে, জয়াদি। কেবল মশাই বা বলব কেন, ভবতোষই বা কম যায় কি? যাক, সে কথা পরে বলব। নাচ দেখে তো ভেনিসের লোকেরা পাগল! পরের দিন দলের লোকেরা গ্রীসের দিকে রওনা হয়ে গেল। আমি রইলুম ভেনিসেই। পাদ্রী সাহেবের পাঁচটার সময়

হোটেলে আসবার কথা ছিল। ভবতোষকে নিয়ে আমি বেরিয়ে পড়লুম সাড়ে চারটেতে।'

'কোথায় গেলি ?'

'গণ্ডোলায়—কী মজা যে গণ্ডোলায় চেপে বেড়াতে, তুমি নিজে না চাপলে বুঝতে পারবে না! লেকের জলে এতটুকু ফাঁক নেই, জোড়া জোড়া স্ত্রী-পুরুষ, যুবক-যুবতী, বুড়ো-বুড়ী সবাই গণ্ডোলায় চেপে ভাসছে। ভবতোষ কবি নয়, তাই সে খানিকটা সময় ভাসবার পরেই বিয়ের কথা উত্থাপন করল। বিয়ের কথা উঠতেই আবার সে ওর ধর্মের কথা তুলল। পোপ আর পাদ্রীর কথা বলতে ভবতোষের ক্লান্তি আসে না। বিয়েটা ও খুব ঘটা ক'রেই করবে ভেবেছিল। কিন্তু হাতে ওর পুঁজি খুব বেশী ছিল না। যাক, তারপরে আমাদের বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের পরেই ভেনিসের গির্জেগুলোর মত নিজেকে শূন্য মনে হতে লাগল, জয়াদি।...একটা কথা বলতে তোমায় ভুলে গেছি। বার্মা-শেল কোম্পানির একজন বুড়ো ডাইরেক্টার ইতালি ভ্রমণ করছিলেন। তাঁর সঙ্গে আমার খুব ভাব হয়। তাঁকে দিয়ে ভবতোষের চাকরি জুটিয়ে দিয়েছি আমিই। বিয়ের পরে সে চাকরি পেয়েছে। হয়তো চাকরি পাওয়ার জন্যেই আমায় ও বিয়ে করেছে।'

'এমন কথা কেন বলছিস রে, রত্না ?'

'ভবতোষ কেবল ফ্যানাটিক নয়, ভবতোষ বর্বর। সেই জন্যেই কেবল খাট দুটো আমাদের আলাদা নয়, আমিও ক্রমশ আলাদা হয়ে যাচ্ছি।'

চায়ের পেয়ালাটা আমি টেবিলের ওপর রেখে দিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলুম, 'তুই কি চাস, রত্না ?'

'দেহটা আমার কেবল উপভোগের জিনিস নয়। শিল্পের জন্যে এ দেহটার আমার সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন। সন্ধ্যে হয়ে এল, তুমি একটু ব'স। আমি কাপড় বদলে নিই। আমার রিহার্সাল আছে। কাল

ভবতোষের একটা চিঠি এসেছে। তুমি বরং ব'সে ব'সে ততক্ষণ চিঠিটা পড়।'

'স্ত্রীর কাছে লেখা চিঠি আমি কেন পড়ব, রত্না?'

'পড়, কোন দোষ নেই। বরং ভালই হবে, কোন জরুরী কথা থাকলে আমি জেনে নিতে পারব। চিঠিটা আমি পড়ি নি।'—এই ব'লে তুই খামখানা আমার হাতে দিয়ে ঢুকে পড়লি স্নান-ঘরে।

খামখানা হাতে নিয়ে আমি অনেকক্ষণ ব'সে ছিলুম। নিজের জীবনটার দিকে দৃষ্টি ফেলবার লোভ হ'ল আমার। আশেপাশের প্রতিটি জীবনের সঙ্গে আমার কেবল যোগাযোগ নেই, তাদের দুঃখের সঙ্গেও যেন আমি জড়িয়ে যাচ্ছি। বড়মামার দুঃখ ভুলে যেতে পারি না। ছোটমামাও যেন কোন্ এক সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে তাঁর সমস্যার জটিলতা নিয়ে ঢুকে পড়লেন আমার জীবনে। কি তাঁরা পেলেন আর কি তাঁরা পেলেন না তার হিসেবের অংশ নিয়ে আমিও মাঝে মাঝে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠি। ভবতোষের দিকেও আমার আর চাইবার দরকার ছিল না। কিন্তু তুই যেন আজ আবার পেছন দিকে ফিরে দেখবার জন্যে আমার দৃষ্টির অস্পষ্টতা সব ঘুচিয়ে দিতে চাস। তোর কথা শুনে স্পষ্টই বুঝতে পারলুম, তোদের বিবাহিত জীবনের রাজপথ সরু হয়ে এসেছে। অন্ধকার গলির রাস্তায় দুটো জীবন যেন এরই মধ্যে পথ চলতে গিয়ে পরিসরের অভাবে দম আটকে মারা যাচ্ছে। ছোটমামার কথাই বোধ হয় ঠিক যে, দুঃখ ভোগই হচ্ছে জীবনের নিয়ম—ল অব লাইফ।

চিঠিখানা খুললুম আমি। খুলতে সময় লাগল। এতগুলো বছর পরেও আমার পরিষ্কার মনে পড়ছে, চিঠিখানা খুলতে গিয়ে আঙুলগুলো আমার কাঁপছিল। একদা ভবতোষের চিঠি পাওয়ার জন্যে দিনের পর দিন আমি ছটফট ক'রে মরেছি, আর আজ তারই লেখা চিঠি খোলবার জন্যে এমন কি রডন স্ট্রীটের রত্নারও সময়ের অভাব ঘটেছে!

ভবতোষ লিখেছে: লণ্ডনের পরিবর্তন লক্ষ্য ক'রে অবাক হয়ে গেছি। জার্মান উড়ো-জাহাজ থেকে দিনরাত বোমা পড়ছে। চার দিকের ক্ষতের চিহ্ন দেখে চোখে আমার জল আসে। কিন্তু ইংরেজদের দেখে মনে হচ্ছে, জার্মান বারুদের সাধ্যই নেই এদের চরিত্রে বিন্দুমাত্র ক্ষতের সৃষ্টি করা। খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এরা। বীরেশবাবুর মুখে একদিন এই লণ্ডনে ব'সেই শুনেছিলুম যে, আমাদের দেশে বড় উপন্যাস লেখা হয় না, কারণ বড় চরিত্রের অভাব আছে ব'লে। আমাদের দেশের উপন্যাস-লেখকেরা এখানে এসে যদি দু-একটা মাস থেকে যেতে পারতেন! আমার মনে আছে, কালীপুজোর রাত্রে পটকার আওয়াজ শুনে মা আমায় ঘরের মধ্যে বন্ধ ক'রে রাখতেন। তাই ভাবছি, বাংলা দেশের দরজা খুলে ওঁরা নিশ্চয়ই এখানে কেউ আসতে চাইবেন না। হোয়াট এ পিটি!

ঝরনার সঙ্গে দেখা হ'ল হোটেলের মাটির তলায়—এয়ার-রেড শেল্‌টারে। বোমা পড়ছিল বৃষ্টির মত। ভয়ে দেখলুম, বাচ্চা হাতীর মত ভারী একজন ভারতীয়ের হাত ধ'রে চোখ বুজে দাঁড়িয়ে আছে ঝরনা। পাশে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, ও কে?

আমার স্বামী দেশাই। তুমি? তুমি কোত্থেকে এলে?

কলকাতা থেকে। প্রায় পনেরো দিন হয়ে গেল। অফিসের কাজে এসেছি।

বা রে, এক হোটেলে আছি, অথচ দেখা হয় নি?

এবার হবে। দেশাই লোকটি কে?

কোটিপতি—গুজরাটী। বোম্বে, দিল্লী, কলকাতায় বারোটা কারখানা আছে। আর বাড়ি আছে বোধ হয় এক শো বারোটা। ঠিক মনে নেই। এত বড় হিসেবের এত কাছে এই তো আমি প্রথম এলুম! আমার স্বামীর দিকে এমন ক'রে দেখছ কেন? একটু বেশী মোটা, না? হিসেব বড় হ'লে দেহটাও একটু বড় হয়, তা কি তুমি জান না,

ভবতোষ? এর ওপরে আমার স্বামী আবার পেট্রিয়ট। কংগ্রেস-ফাণ্ডে মোটা অঙ্কের চাঁদা দেন।

তা তো দেবেনই। গান্ধীজীর রাজনৈতিক বুদ্ধির তারিফ করতে হয়। সে যাক, কেমন আছ? ভারতবর্ষের কথা মনে আছে কি?

অল্-ক্লীয়ার হয়ে যাক, পরে বলব। আমার মুখ থেকে গন্ধ পাচ্ছ না, ভবতোষ?

পাচ্ছি—একটু বেশী গন্ধই পাচ্ছি। তোমার নার্ভের ওপরে কী ভীষণ যে চাপ পড়ছে, তা কি আর বুঝতে পারি না?

ভাল জিনিস ভাই ব্ল্যাকে কিনতে হয়। অল্-ক্লীয়ার হয়ে যাক, তোমায় ভাল হুইস্কি দেব। পাঁচমিশেলী পছন্দ কর না কি? আমার স্বামী এ সব স্পর্শ করেন না।

তিনি আপত্তি করেন না?

না। শুধু মাছ মাংস আমায় ছুঁতে দেন না। উনি কেবল হিন্দু নন, ধার্মিকও।

কেবল ধার্মিকও নন, কোটিপতি এবং পেট্রিয়ট। ভাল স্বামী পেয়েছ, ঝরনা।

এই সময় অল্-ক্লীয়ারের সংকেত শোনা গেল।

ঝরনা আমায় 'বারে' নিয়ে এসে বসল। মিস্টার দেশাই এলেন না। তিনি ব'লে গেলেন—ডারলিং, লণ্ডনে আর নয়। আমি যাচ্ছি প্যাসেজ ঠিক করতে। এই সপ্তাহের মধ্যেই ভারতবর্ষে ফিরে যেতে হবে। তিনি চ'লে গেলেন।

আমি বললুম, প্যাসেজ পাওয়া খুবই কঠিন হয়ে উঠেছে।

তার জন্যে তুমি ভেবো না। আমার স্বামীটি সোজা মানুষ নন, হয়তো দেশে ফেরবার জন্যে একটা এরোপ্লেনই কিনে ফেলবেন। নাও, আরম্ভ করা যাক, তোমার দাম্পত্য জীবনের শান্তির উদ্দেশ্যে—এই

পর্যন্ত ব'লে ঝরনা তার গেলাসে চুমুক দিল। আমি ওর দিকে একটা সিগারেট এগিয়ে দিতেই সে বলল, তুমি ধরিয়ে দাও। হেসে উঠল ঝরনা। হাসতে হাসতেই ও বলল, ও, তুমি তো রোমান ক্যাথলিক, ছোঁয়াছুঁয়ি মানো। আজ না হয় সিগারেটের মারফত তোমার ঠোঁটের ছোঁয়া একটু লাগুক। রত্না তো আর দেখতে আসছে না! ও ডিয়ার! ডিয়ার! আমি সিগারেট ধরাতে দেরি করছি ব'লে ঝরনা এবার নিজেই আমার হাত থেকে ওটা নিয়ে বলল, কী নিষ্ঠুর! বাইরে গিয়ে দেখে এস, মৃতদেহের শোভাযাত্রা চলেছে—জীবন ও মৃত্যুর মাঝখানে এক সুতোরও ব্যবধান নেই। ভবতোষ, এমনভাবে মানুষকে মরতে আমি আর কোনদিনই দেখি নি। কি হবে তোমার ছোঁয়াছুঁয়ির ধর্ম মেনে? বড় ক'রে একটা টান দিয়ে ঝরনাই আবার বলতে লাগল, এমন দিনেও তোমায় কিছু বলা যাবে না! তুমি মানুষ নও, তুমি কেবল রোমান ক্যাথলিক। আজ রাত্রের মত একবার মানুষ হওয়ার চেষ্টা করবে, ভবতোষ?

কি রকম? জানবার কৌতূহল হ'ল আমার।

গেলাসের প্রায় সবটুকু শেষ ক'রে ঝরনা জবাব দিল, চল, আজকের রাতটা আমরা চেনা-জগৎ থেকে পালিয়ে থাকি। জায়গাও ঠিক আছে। পার্লামেন্ট হাউসের দক্ষিণ দিকের দেয়ালটা ভেঙে পড়েছে—ভেঙে দিয়ে গেছে নাৎসী বৈমানিকেরা। ইতিহাসের কোথাও তুমি এমন জায়গা পাবে না, ভবতোষ। যাবে?

না।

তা হ'লে এখানে ব'সেই আজ নিশি যাপন করি। বাইরে যেতে ভয় করছে—সেই দৃশ্যটার কথা কিছুতেই ভুলতে পারছি না।

আমি প্রশ্ন করতে বাধ্য হলুম, কোন্ দৃশ্যটা?

একটা নতুন সিগারেট ধরাল ঝরনা। দু-তিনটে টান দিয়ে সে বলল, এমার্সনকে চিনতে? তোমাদের সঙ্গে পড়ত?

চিনতুম।

তার প্রেমে পড়েছিলুম আমি। তোমার চেয়েও তার স্বাস্থ্য ছিল হাজার গুণে ভাল। সে সত্যিকারের রোমান ক্যাথলিক ছিল।

সত্যিকারের মানে?

সে চুমু খাওয়াকেও ব্যভিচার মনে করত। এক মুহূর্তের জন্যেও সে আমায় তার কাছে ঘেঁষতে দেয় নি। আজ তার শেষ আমি দেখলুম। সত্যিই শেষ। বোমা পড়েছিল মাথায়, জামা-কাপড় ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। হাত নেই, পা নেই—একেবারে স্টার্ক নেকেড! আমি দেখলুম, এমার্সনের সবটুকু রহস্যই লণ্ডনের রাস্তায় প'ড়ে আছে। এর পরে তুমিও আর আমায় কোন রকম লোভ দেখাতে পারবে না। আপেলের পাপ আমি ধ'রে ফেলেছি। আমি তাই এখন অস্তিবাদী।

কবে থেকে?

এমার্সনের শেষ দেখবার পর থেকে।—এই ব'লে ঝরনা ফুড়ুক ফুড়ুক ক'রে ঘন ঘন সিগারেটে টান দিতে লাগল। খানিকটা সময় কেটে যাওয়ার পর আমি বললুম, তোমার স্বামীর খবর এবার বল। সব কিছু জানতে খুবই কৌতূহল হচ্ছে।

একটু যেন অস্বাভাবিকভাবে ঝরনা গম্ভীর হয়ে গেল। প্রতিটি মুহূর্তের গাম্ভীর্য ওর আমায় পীড়া দিতে লাগল। একটু বাদেই সে বলতে লাগল, ওর দেহ দেখে বুঝতেই পারছ, অকেজো। বয়স বোধ হয় পঞ্চাশের কাছাকাছি, কিন্তু দেশাই বলে—পঁয়তাল্লিশ। ছেলেবেলায় বিয়ে করেছিল। বউ মারা গেছে বছর পাঁচ আগে। সন্তানের সংখ্যা দশটি। কৃষ্ণ মেননের ওখানে আমার পরিচয় হয় ওর সঙ্গে। প্রথম দর্শনেই দেশাই প্রেমে পড়ল—আমার সঙ্গে নয়, বাংলার সংস্কৃতির সঙ্গে। টেগোরের বই যেন কি একটা সে প'ড়ে ফেলেছিল। তার পর থেকে কেবল বাঙালী মেয়েরা ওর স্বপ্নের মধ্যে এসে উঁকি দিতে

লাগল। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, দেশাই স্বপ্ন দেখে! অস্তিবাদী হতে বাধ্য হলুম।

বিয়ে না করলেই পারতে।

বিয়ে না ক'রে উপায় ছিল না, ভবতোষ। বিয়ের এক সপ্তাহ আগে দু লাখ টাকা আমায় ও উপহার দিল। চেক নয়। রুমালে বেঁধে সব পাউণ্ড নিয়ে এসে উপস্থিত। আমি নিলুম। তবু ওকে বললুম, আমার মাতাঠাকুরাণীর আদেশ না পেলে বিয়ে করতে পারি না। আমাকে দিয়ে দেশাই একটা কেব্‌ল্ পাঠাল মায়ের কাছে। সে প্রায় একটা চিঠি লিখলুম কেব্‌লে। দু লাখ টাকার কথাও উল্লেখ করলুম তাতে। মায়ের জবাব এসে গেল। জবাবটার বাংলা অনুবাদ করলে এই রকম দাঁড়ায় : উত্তম পাত্র—বিয়ে কর। এর পরে তুমি কি বলতে চাও, ভবতোষ ?

না, আর কিছু বলতে চাই না। এমন দিনে নন্তুর কথাই কেবল মনে পড়ছে।

শাট আপ্!—মুহূর্তের মধ্যে ঝরনা অত্যন্ত রূঢ় হয়ে উঠল। তারপর থেমে থেমে সে আবার বলতে লাগল, বিচারক অপূর্ব মিত্রের বিচার আমি মাথা পেতে গ্রহণ করেছি।

সহসা আমি আর কোন কথা বলতে পারলুম না। আমি জানি, বিচারক অপূর্ব মিত্রের বিচার সে মাথা পেতে নেয় নি। নিলে, অমিত মিত্রকে ও এমন ক'রে নষ্ট ক'রে দিত না।

চোখের জল মুছল ঝরনা। তারপর সে বলল, অমিত দেশে ফিরে গেছে। মাথায় একটা গান্ধীটুপি প'রে গেছে। এখানে কোন কিছুই করতে পারল না সে। বোধ হয় ব্যারিস্টারি পাস করেছে। দেশাই ওকে পরামর্শ দিয়েছিল, এখানকার শ্রমিক আন্দোলন সম্বন্ধে খানিকটা জ্ঞান অর্জন ক'রে যাবার জন্যে। দেশে ফিরে গিয়ে একটা হিল্লে হয়ে যেতে পারে। কংগ্রেসের মধ্যে শ্রমিক আন্দোলন সম্বন্ধে অভিজ্ঞ

লোক নেই। ভবিষ্যতে অমিতের সুবিধে হতে পারে। শ্রমিক আন্দোলন সম্বন্ধে অভিজ্ঞ হতে অমিতের মাত্র ছ মাস লেগেছিল। যাওয়ার সময় দেশাই একটা চিঠি দিয়ে দিয়েছে কংগ্রেস হাই-কমাণ্ডের কাছে। অমিতের পুনর্বাসনের পথ তৈরি ক'রে দিলুম আমিই। ভবতোষ, বিচারক অপূর্ব মিত্রকে আমি ক্ষমা করেছি।

এই সময়ে আবার সাইরেন বেজে উঠল। আমরা সবাই ছুটে চললুম এয়ার-রেড শেল্‌টারের দিকে। মাঝপথে ঝরনা আমার হাত চেপে ধ'রে এক রকম চেঁচিয়ে চেঁচিয়েই বলতে লাগল, ভবতোষ, আমি রাস্তায় যাচ্ছি। এমার্সনের মত আমি ম'রে যেতে চাই।...যদি আমায় স্টার্ক নেকেড দেখতে পাও, তা হ'লে—তা হ'লে তোমার এই গায়ের জামা দিয়ে ঢেকে দিয়ো আমায়।

ঝরনা প্রায় চ'লেই গিয়েছিল, আমি জোর ক'রে ওকে ধ'রে নিয়ে এলুম এয়ার-রেড শেল্‌টারে।

ঝরনা এখনও বেঁচে আছে। ইতি—

আমার চিঠি পড়া শেষ হওয়ার আগে তুই স্নান-ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিলি। নিজেকে দেখাবার জন্যে এরই মধ্যে বার কয়েক তুই চেষ্টা করেছিস। আজ স্বীকার করতে আমার লজ্জা নেই যে, ভবতোষের চিঠিটা যত না মনোযোগ দিয়ে পড়ছিলুম তার চেয়ে অনেক বেশী মনোযোগ দিয়ে তোকে আমি দেখছিলুম। ভবতোষ ছাড়া অন্য কেউ বোধ হয় তোর এত বেশী দেখতে পায় নি। সেদিন সম্ভবত কয়েক মুহূর্তের জন্যে আমি ভেবেছিলুম যে, এমন দেহসৃষ্টির পেছনে কেবল পিতামাতার পুণ্য নেই, হয়তো ভগবানের কারুকার্যও রয়েছে। এমন কারুকার্যের প্রসন্নতায় ভবতোষ যদি শিল্পের সন্ধান না পেয়ে থাকে, তা হ'লে তোর ব্যর্থতার কারণ খুঁজে পেতে আমাদের কষ্ট হবে না। নিজেকে সেদিন কত তুচ্ছ মনে হয়েছিল রত্না, সে কথা লিখে তোকে আর কষ্ট দেব না।

ব'সে ব'সে তোর বেশ-ভূষার পরিবর্তন দেখছিলুম আমি। শাড়ির বদলে সালোয়ার পরলি। বিনুনি দুটো ঝুলিয়ে দিলি ঘাড়ের দু দিক দিয়ে। ওমর খৈয়ামের প্রেয়সী ব'লে চিনে নিতে কারও আর ভুল হবে না। কবির কল্পলোক থেকে তুই যেন সত্যিই নেমে এলি বাস্তব-পৃথিবীতে। রডন স্ট্রীটের একতলার ফ্ল্যাটে এমন আবির্ভাব কেমন ক'রে যে সম্ভব হ'ল আমি তাই ব'সে ব'সে ভাবতে লাগলুম।

নাচের ভঙ্গিতে আমার সামনে এসে তুই জিজ্ঞাসা করলি, 'ভবতোষ কি লিখেছে?'

'না, তেমন কোন জরুরী কথা নেই। 'ডারলিং' ব'লে শুরু ক'রে 'আমার ভালবাসা নিয়ো' ব'লে চিঠি শেষ করেছেন তিনি।'

'মাঝখানে আর কিছু নেই?'

'আছে। ঝরনার কথা লিখেছেন। কোন্ এক গুজরাটী কোটিপতিকে সে বিয়ে করেছে।'

'হাউ লাভ্‌লি! তা হ'লে বোধ হয় যীশুখ্রীষ্ট আমার দিকে মুখ তুলে চাইলেন।'

'কেন রে?'

'একটা নাচের স্কুল খোলবার স্বপ্ন ছিল আমার, জয়াদি। কোটিপতির সাহায্য ছাড়া স্কুলটা খুলতে পারছিলুম না। তাড়াতাড়ি ফিরে আসবার জন্যে ঝরনাকে একটা কেব্‌ল্ পাঠাব কাল। জয়াদি, ঝরনাকে তুমি চেন না?'

'সামান্য। বোধ হয় দু বার দেখা হয়েছিল।'

'আমি জানতুম, কোটিপতি ছাড়া ঝরনা কাউকে বিয়ে করবে না। চল, রিহার্সাল আছে, রণবীর বোধ হয় ট্যাক্সি নিয়ে এল।'

'ট্যাক্সিতে কেন রে? ড্রাইভারকে ছুটি দিয়ে দিলি কেন?'

'ড্রাইভার তো ভবতোষের। সব জায়গায় ওকে আমি নিয়ে যাই

কেবল একটা জায়গা ছাড়া। হয়তো ওর কাছ থেকে ভবতোষ সব খবর জানতে চাইবে।'

'রত্না! ছিঃ!'

'হ্যাঁ, জয়াদি। ভবতোষের কাছে আমি শুধু মেয়েমানুষ।'

নিঃশব্দে তোর সঙ্গে এসে ট্যাক্সিতে উঠলুম। লোয়ার সারকুলার রোড দিয়ে এসে আমরা চৌরঙ্গীর রাস্তায় পড়লুম। একটা কথাও আমি তোর সঙ্গে বললুম না। চৌরঙ্গী কোর্টের সামনে এসে হঠাৎ তুই বললি, 'ড্রাইভার, রোকো।' এই ব'লে ট্যাক্সি থেকে নেমে তুই আমায় বললি, 'গুড নাইট, জয়াদি।'

'এখানে কোথায় যাচ্ছিস, রত্না?'

'কবি বীরেশ রায়ের কাছে।'

কাপড়ের প্যাকেটটা বুকে চেপে ধ'রে আমি চ'লে এলুম লেক প্লেসের ফ্ল্যাটে।"

॥ পঞ্চদশ রাত্রি

"নিশীথ আজকাল আর ধুতি পরছে না। জানুয়ারি মাসের প্রথম দিকেই খুব শীত পড়ল। মার্কেট থেকে কেনা সেই বিলিতী গরম কাপড়ের স্যুট পরছে নিশীথ। এর মধ্যে আমি আবার একবার মার্কেটে গিয়েছিলাম। আরও অনেক কাপড়চোপড় ওর জন্যে কিনে এনেছি আমি। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার, এত সব দামী দামী কাপড়চোপড় পেয়েও নিশীথ একবারের জন্যেও একটু অবাক হয় নি। এমন কি এ সম্বন্ধে সে একটা প্রশ্ন পর্যন্ত করে নি।

আজ সকালবেলা ওকে ডেকে বললুম, 'নিশীথ, আজকে সেই নতুন ফ্ল্যানেলের ট্রাউজারটা পরবি।'

'আচ্ছা।'

'আর এই নে পুল-ওভার। রঙটা পছন্দ হয়েছে তোর?'

'হ্যাঁ।'

'তোর ফরসা রঙের সঙ্গে এটা খুব ভাল মানাবে।'

'মানাবে ব'লেই তো মনে হয়।'

'তোর বুকের ছাতিটা দেখছি খুবই চওড়া, পুল-ওভারটা ছোট হবে না তো?'

'বোধ হয় না। গায়ে দিয়ে দেখব?'

'হ্যাঁ, সেই বরং ভাল।'

গম্ভীরভাবে নিশীথ পুল-ওভারটা পরতে লাগল গায়ে। হাতের দিকে যেন একটু ছোট হয়েছে ব'লেই মনে হ'ল আমার।

'এ দিকে আয় তো নিশীথ, আমি সব ঠিক ক'রে দিচ্ছি।'

'হ্যাঁ, তুমিই ঠিক ক'রে দাও, দিদিমণি।'—এই ব'লে নিশীথ এগিয়ে এসে দাঁড়াল আমার সামনে। পুল-ওভারের হাতটা তলার দিকে টানতে টানতে বললুম, 'ভবতোষের চেয়েও দেখছি তোর হাত দুটো

লম্বা। আরও একটু কাছে আয় তো, বুকের দিকটা দেখি। ওখানে আবার ভাঁজ পড়ল কেন?'

ওর বুকের ওপরের ভাঁজটা যখন আমি পরীক্ষা করছিলুম, তখন 'জয়া আছ না কি? জয়া—' বলতে বলতে আমাদের প্রিন্সিপ্যাল মিসেস সুজাতা রায় এসে ঢুকে পড়লেন ঘরে। হাতটা আমি নামিয়ে নিলুম বটে, কিন্তু সুজাতাদি তবু তাঁর চশমার তলা দিয়ে নিশীথকে খুব গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন। প্রথমে মুখের দিকে, তারপর বুকের দিকে, শেষে ওর পায়ের দিকে চেয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'এই রাজকুমারটি কে?'

নিশীথের দিকে চেয়ে আমি বললুম, 'যা, চা নিয়ে আয়। আর কি খাবেন, সুজাতাদি?'

নিশীথের দিকেই চোখ রেখে তিনি বললেন, 'না, আর কিছু না। এইতেই হবে।' নিশীথ চ'লে গেল।

সোফার ওপর পা গুটিয়ে ভাল ক'রে বসলেন সুজাতাদি। চার-দিকটা ভাল ক'রে দেখে নিয়ে তিনি বললেন, 'সিঁড়ি থেকে ঘর পর্যন্ত পুরো ফ্ল্যাটটাই দেখছি কার্পেট দিয়ে মুড়ে ফেলেছ। ভাল করেছ, জয়া। হঠাৎ এসে কেউ ঢুকে পড়লে জুতোর আওয়াজ পাবে না। কিন্তু—'

একটু ন'ড়ে চ'ড়ে ব'সে তিনিই আবার বলতে লাগলেন, 'এরই নাম তা হ'লে নিশীথ। তা বাপু, বাইরের লোকেরা এত খবর রাখে কি ক'রে? একটু ঢেকেঢুকে রাখলেই তো পার।'

'ঢাকবার তো কিছু নেই, সুজাতাদি।'

'আছে জয়া, আছে। মানুষ তিলকে তো তাল করবেই। কিন্তু তিলের সন্ধানই বা মানুষ পাবে কেন? যাক, আমার কাছ থেকে কেউ কোন কথা জানতে পারবে না। আমাদের চেয়ারম্যান— মিস্টার গুপ্ত কিছু না শুনে ফেলেন। ভা-রি খুঁতখুঁতে মানুষ।

এবার বোধ হয় তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহরের মেয়র নির্বাচিত হবেন। কলকাতার সর্বপ্রধান নাগরিকের কানে যেন নিশীথের নামটা কোনক্রমেই না পৌঁছতে পারে তার ব্যবস্থা আমি করব। তোমার কোন ভয় নেই, জয়া।'

সুজাতাদির কথায় ভয় পেলুম আমি। গলিত লাভার মত তাঁর মুখ থেকে কী পরিমাণ কাদা যে নির্গত হবে তার একটা আন্দাজ পেয়ে বুকের ভেতরটা শুকিয়ে উঠল আমার। চাকরি খোয়াবার ভয় আমার নেই, কিন্তু ইজ্জত হারাবার ভয় আমার নিশ্চয়ই ছিল।

এরই মধ্যে নিশীথ চা নিয়ে এল। চায়ের ট্রে-টা সামনে সাজিয়ে দিয়ে নিশীথ বলল, 'নতুন প্যাণ্টটা প'রে এসেছি।'

সারা মুখে আমার বোধ হয় আর বিন্দুমাত্র রক্ত রইল না। কোন রকমে খানিকটা শক্তি সঞ্চয় ক'রে বললুম, 'হ্যাঁ, ভালই তো ফিট করেছে।' এই কটা কথা বলতে আমি যেন হাঁপিয়ে পড়লুম। সুজাতাদি লক্ষ্য করলেন তা। তাঁর দৃষ্টি থেকে কোন কিছুই বাদ পড়তে পারছে না। নিশীথ চ'লে যাওয়ার পরে তিনি বললেন, 'বড্ড বিপদে প'ড়েই তোমার কাছে এসেছি, ভাই।'

সুজাতাদির বিপদের কথা শুনে দেহে আমার প্রাণ এল। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে রইলুম তাঁর দিকে। তিনি বললেন, 'আমার মেয়ে রমাকে তো তুমি দেখেছ। টাকার সংস্থান না ক'রে ওর বিয়ে আমি ঠিক ক'রে ফেলেছি। দু হাজার টাকা আমায় ধার দিতে হবে।'

'রমার বয়স কত হ'ল ? বড্ড ছেলেমানুষ না ?'

আসছে বছর আই. এ. পরীক্ষা দেওয়ার কথা। বিয়ের পক্ষে এমন কিছু ছেলেমানুষ নয়। ষোল চলছে। বাড়ন্ত গড়ন। এর মধ্যেই গোটা শা'নগরটা গরম হয়ে উঠেছে। পনেরো-ষোল বছরের সব অর্ধ-শিক্ষিত ভদ্রলোকের ছেলেগুলো রমাকে কেন্দ্র ক'রে উপন্যাসের 'হিরো' হতে চায়। এমন অবস্থায় বিয়ে ঠিক করতে বাধ্য হলুম। তা ছাড়া

কলেজে তো দেখছি, গাদা গাদা মেয়ে গরম দেশের হাওয়ায় কেবল ঘামছে। এম. এ. পাস ক'রে বেরুতে বেরুতে কিছুই আর থাকে না, ভাই। তার ওপর বয়সটাকে ক্ষয় ক'রে ক'রে যে-বিদ্যে এরা শেখে তার নমুনা দেখলে আতঙ্কে শিউরে উঠতে হয়। এ দেশের শিক্ষার ধোঁয়া যে কত কালো তার একমাত্র প্রমাণ দেখতে পাবে তুমি ভারতবর্ষের স্ত্রীশিক্ষার উনুনে। কোন্ ব্যাঙ্কের ওপর চেক দেবে, ভাই? এ টাকা আমি ফিরিয়ে দেব। আগের টাকাটাও শোধ দেওয়া হয় নি। প্রাইভেট কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হওয়া যে কতবড় দুর্ভাগ্য তা তুমি জান না।'

আমি ভাবলুম, দেরি ক'রে কোন লাভ নেই। চেক কেটে টাকাটা দিতে পারলেই আমি যেন বেঁচে যাই। শোবার-ঘর থেকে চেক-বইটা নিয়ে এলুম। সুজাতাদির সামনেই চেক লিখে দিলুম আমি। চেকখানা হ্যাণ্ডব্যাগে রেখে দিয়ে তিনি আমায় ধন্যবাদ জানালেন। হাতঘড়িতে সময় দেখে নিয়ে সুজাতাদি বললেন, 'সাড়ে নটা হ'ল। চৌরঙ্গীর ব্যাঙ্কে পৌঁছতে আধ ঘণ্টা তো লাগবেই। তোমার আজ ক্লাস কটায়?'

'দেড়টায়।'

'ও, তা হ'লে তো দেরিই আছে। আমি তা হ'লে চলি। তোমার এই নিশীথ লোকটিকে বেশ ভালই লাগল। অতি সুপুরুষ। ভাই জয়া—।' মিসেস সুজাতা রায় এগিয়ে গেলেন দরজার দিকে। সেখানে দাঁড়িয়েই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার ছোটমামার খবর কিছু রাখো?'

'না।'—আমি উঠে গিয়ে তাঁর কাছে দাঁড়ালুম।

'তোমার ছোটমামার ছেলে অমিত দেশে ফিরেছে। বাবার সঙ্গে থাকে নি। এখন সে জেল খাটছে।'—এই ব'লে তিনি সিঁড়ির ওপরে গিয়ে দাঁড়ালেন।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'জেল খাটছে কেন?'

'উনিশ শো বিয়াল্লিশের আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল। গান্ধীজীর

দলের লোক। সেদিন কাগজে পড়ছিলুম অমিত মিত্রের কথা। ব্যারিস্টার। কিন্তু ব্যারিস্টারির সোনা সে ত্যাগ করেছে—দেশের জন্যে। ভবিষ্যতের বিরাট প্র্যাকটিস সে বিসর্জন দিয়ে এল। পিতা আই. সি. এস., জ্যাঠা বিশ্ববিখ্যাত ঐতিহাসিক—'

'কিন্তু অমিতদার তো এক পয়সারও প্র্যাকটিস হয় নি ব'লে শুনেছি।'

'হয় নি, হ'ত। ব্যারিস্টার বিমল গুপ্তের জুনিয়র ছিল সে। তার প্র্যাকটিস হতে বাধ্য। তা ছাড়া, অত অল্পবয়সে শ্রমিক আন্দোলন সম্বন্ধে এত বেশী অভিজ্ঞতা অন্য কেউ আর অর্জন করতে পারে নি। আমি চলি ভাই।'

সুজাতাদি দু-তিনটে সিঁড়ি নীচে নেমে গিয়ে আবার ঘুরে দাঁড়ালেন, জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার মামীমা সুনন্দা মিত্রের খবর কিছু রাখো?'

'না, তাঁকে আমি চিনি না।'

'তাঁর সঙ্গে মিস্টার গুপ্তের বিয়ে হচ্ছে। হিন্দু মতে হওয়ার উপায় নেই। তাই সুনন্দা দেবী মোল্লার কাছে গিয়ে ধর্ম বদলেছেন। এখন নাম তাঁর নূরে হোসনা জেঁহা বেগম। বিয়ের পর আর্যসমাজ ওঁদের আবার হিন্দু ক'রে নেবে। এ ভালই হ'ল, জয়া। আসছে বছর যদি মিস্টার গুপ্ত মেয়র হতে পারেন, তা হ'লে সুনন্দা দেবী হবেন কলকাতার সবচেয়ে সম্মানিত নাগরিকের স্ত্রী। ফুঃ!' সুজাতাদি পেছন দিকে আর দৃষ্টি ফেললেন না। আমি ওখানেই দাঁড়িয়ে রইলাম অনেকক্ষণ পর্যন্ত। বিষাক্ত আবহাওয়া দেহটাকে যেন আজ অবশ ক'রে ফেলেছে!

কদিনের মধ্যেই আমি টের পেলুম, আমার নিজের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ছে। ভেতরে ভেতরে অসুস্থ হয়ে উঠেছি। বোধ হয় আমার

পরিচিতদের দুঃখের জন্যেই আমার এ অসুস্থতা। দূরে ব'সেও তাঁদের অস্তিত্বকে আমি আমার মন থেকে মুছে ফেলতে পারি নি। এমন কি স্বল্পপরিচিত ঝরনা পর্যন্ত আমার মনোবেদনার কারণ হয়ে উঠেছে। ভেবেছিলুম, তিনতলার ফ্ল্যাটে আলাদা একটা জগৎ বুঝি ক্রমে ক্রমে গ'ড়ে উঠবে। কিন্তু তাই বা হ'ল কই ?

জগদীশবাবু কাল ডাক্তার সেনকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি আমায় পরীক্ষা ক'রে দেখলেন। রোগের সন্ধান করতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত ডাক্তার সেন ঘোষণা করলেন, 'অসুখ কিছু নেই। নার্ভ খুব দুর্বল। যে-কোন রকম উত্তেজনা আপনার পক্ষে হানিকর হবে।'

আমি বললুম, 'মাঝে মাঝে তিনতলায় উঠতে পর্যন্ত হাঁপিয়ে পড়ি। ক্লাস শেষ ক'রে বাড়ি ফেরবার মুখে এক-একদিন ট্রামে চেপে আসতে পারি না, ট্যাক্সিতে আসি। মনে হয়, হঠাৎ যেন আমার চোখের সামনে অন্ধকার নেমে এল। অথচ ঘড়িতে তখন মাত্র তিনটে, বেলা তিনটে।'

'দুর্বলতার জন্যেই এসব হয়। এক কাজ করবেন। এমার্জেন্সির জন্যে ঘরে খানিকটা ব্র্যাণ্ডি রেখে দেবেন। বেশী নয়, আউন্স চার কিনলেই চলবে। খুব দুর্বল বোধ করলে গরম জলের সঙ্গে দশ ফোঁটা মিশিয়ে নিয়ে খেয়ে ফেলবেন। কোন স্বাস্থ্যকর জায়গা থেকে ঘুরে আসুন। আপনাদের তো ছুটির অভাব নেই। বয়সও খুব বেশী মনে হচ্ছে না, বিয়ে ক'রে ফেলুন।'

'বিয়ে ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনারা সব লেখাপড়া শিখে স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের কথা যদি না জানেন, তা হ'লে আমাদের আয়ের দিক দিয়ে অবিশ্যি সুবিধে হয় অনেক, কিন্তু সামাজিক কল্যাণ তাতে হয় না।'

'সমাজের কথা থাক্, আমার নিজের কল্যাণের উপায় এবার বাতলে দিন, ডক্টর সেন।'

'ব্র্যাণ্ডির সঙ্গে ডিমের হলদেটা মিশিয়ে দু-একদিন খেয়ে দেখুন তো। আপনার চাকরকে পাঠিয়ে বরং একটা পাঁইট বোতল কিনিয়ে আনুন। যুদ্ধের বাজারে বিলিতী জিনিসের অভাব, তা হোক; জগদীশবাবু নিশ্চয় যোগাড় ক'রে দিতে পারবেন। একটা সপ্তাহের প্রোগ্রেস-রিপোর্ট দেবেন আমায়। আপনার এখানে টেলিফোন আছে কি?'

'আছে।'

'তা হ'লে তো কোন অসুবিধেই নেই। আজকেই ওজনটা নিয়ে রাখবেন। একটা প্রেসক্রিপশন লিখে দিয়ে যাচ্ছি। এগুলো ঠিক ওষুধ নয়, নানা রকমের ভাইটামিন। খানিকটা উপকার নিশ্চয়ই পাবেন, কিন্তু বিয়ের অভাব মেটাবার মত ভাইটামিন এগুলো নয়। তা ছাড়া প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবার মত মেডিক্যাল-বুদ্ধি আমি আপনাকে দিতে পারি না। এই রইল প্রেসক্রিপশন, আপনার চাকর-বাকর কেউ নেই?'

'ঠাকুর আছে।'

'ডাকুন না একবার তাকে।'

'নিশীথ, নিশীথ—'

'এই যে দিদিমণি—'

নিশীথ ঘরে এসে উপস্থিত হতেই ডক্টর সেন অনেকক্ষণ পর্যন্ত ওর দিকে চেয়ে রইলেন। ডক্টর সেনের চাইতেও ভাল চেহারা নিশীথের। আমি বললুম, 'আমার ঠাকুর এসেছে।'

'ঠাকুর? মাই গুডনেস! আপনার ঠাকুর দেখছি, বিলিতী ট্রপি-কেল কাপড়ের ট্রাউজার পরেছে! গায়ের পুল-ওভারের যা দাম তা বোধ হয় আমার তিনটে ভিজিটের সমান হবে। আচ্ছা, তুমি এখন

যাও, ঠাকুর। ও, ইয়েস, ঠাকুরই বটে।' নিশীথ চ'লে যাওয়ার পরে ডক্টর সেনই পুনরায় বলতে লাগলেন, 'এসব ভাইটামিন খেয়ে আপনার কোন উপকার হবে না। আপনার দুর্বলতার কারণ মানসিক। মিস বোস, ডাক্তারের কাছে কোন কথা গোপন করতে নেই। জগদীশবাবু আমার বিশেষ বন্ধু, আপনাকে আমি সাহায্যই করতে চাই।'

'তা হ'লে ডিমের হলদেটা ব্র্যাণ্ডির সঙ্গে মিশিয়ে খেয়ে নোব। সাত দিনের প্রোগ্রেস-রিপোর্ট আপনাকে দেব। আপনার ভিজিট কত, ডক্টর সেন?'

'জগদীশবাবুর খাতিরে ষোল টাকাই নেব, নইলে বত্রিশ।'

'আপনি বত্রিশই নিন। এর পর চৌষট্টি দিয়ে আরও বড় ডাক্তার ডাকব। তিনি হয়তো রোগটা ধরতে পারবেন। আপনি কি চললেন?'

টাকাগুলো ভাঁজ ক'রে পকেটে রাখতে রাখতে ডাক্তার সেন বললেন, 'যাঁরা চৌষট্টি দিয়ে ডাক্তার ডাকেন তাঁদের তখন শেষ অবস্থা। আপনার তো কেবল শুরু। সে যাক। আমি শুনেছি, মেয়েদের আপনি শিক্ষা দেন—'

বাধা দিয়ে বললুম, 'ভুল শুনেছেন আপনি, ডক্টর সেন। মেয়েদের আমি শিক্ষা দিই না, লেকচার দিই।'

'ও, আই সি—তা লেকচারই আপনি দিন, আমার কিছু বলবার নেই। আমি বলছিলাম, যাঁরা শিক্ষার কাজ নিয়েছেন, তাঁদের নিজেদের তো ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা চাই—নমস্কার, মিস বোস। আমায় খবর দেবেন।'

ডাক্তার সেন চলে গেছেন তাও প্রায় সাতদিন হ'ল। প্রোগ্রেস-রিপোর্ট কিছু তৈরি করি নি। তবে শরীর খানিকটা ভালই হয়েছে। ব্র্যাণ্ডির বিন্দুগুলো ভেতরে গিয়ে কাজ করছে। বিন্দুগুলো ক্রমশ বড় হচ্ছে। ঝরনা কেন অস্তিবাদী হ'ল তাও যেন বুঝতে খুব কষ্ট

হচ্ছে না। বোতলের সংখ্যা বাড়তে লাগল। কলকাতার বাজারেও ভাল জিনিস পাওয়া যাচ্ছে না। নিশীথ খুঁজে খুঁজে কালোবাজারের সন্ধান পেল। খুঁজে বার করবার জন্মে সে কী তার উৎসাহ!

একদিন হঠাৎ সে ব'লে বসল, 'এ জিনিস আমি আর আনতে যাব না। টাকা তুমি ফিরিয়ে নাও, দিদিমণি।'

'কেন, কি হ'ল? পাওয়া যাচ্ছে না কি? দশগুণ দাম দিলে তো পাওয়া যাবে।'

'তা নয়। এ যে মদ!'

'হ'লই বা মদ, আমার কাছে তো ওষুধ। আমার ভালর জন্মেই তো ডাক্তার সেন খেতে ব'লে গেছেন রে।'

'এ খেলে তোমার ভাল হবে?'

'হ্যাঁ।'

'তা হ'লে যাচ্ছি আনতে।'

ওর সামনেই হেসে ফেলেছিলাম আর কি!

বোধ হয় ফেব্রুয়ারি মাসের শেষের দিকের কথা। কলেজে গেছি টিফিনের একটু আগেই। আজকাল কলেজে গিয়ে একটু বিশ্রাম ক'রে নিতে হয়। স্টাফ-রুমে ঢোকবার সঙ্গে সঙ্গে দীপ্তিদি উঠে এসে বললেন, 'প্রিন্সিপ্যাল তোকে ডেকে পাঠিয়েছেন। হ্যাঁ রে জয়া, এসব কি শুনছি? কোন্ রাজকুমারকে দিয়ে নাকি রান্নার কাজ করাচ্ছিস? কবে দেখতে যাব লো?'

'তোমরা কোথায় খবর পেলে?'

'খবর? বলিস কি? ইভনিং-ইন-প্যারিসের মত খবর যে সারা কলকাতার আকাশে উড়ছে রে, জয়া।'

'তুমি কোথায় শুনলে বল না?'

দীপ্তিদি আমার কানের কাছে মুখ এনে বললেন, 'এসব আমাদের প্রিন্সিপ্যালের কাজ। যা, দেখা ক'রে আয় একবার।'

'যাচ্ছি।'

দম নেবার জন্তেই বোধ হয় চেয়ারে গিয়ে ব'সে পড়লুম। মিনিট দশ পরে প্রিন্সিপ্যালের ঘরে গিয়ে ঢুকলুম। চশমার তলা দিয়ে সুজাতাদি চেয়ে রইলেন আমার দিকে। তারপর একটু হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বিলেতে তোমার কে আছেন?'

'কেউ নেই তো!'

'নেই? তোমার নামে একখানা চিঠি এসেছে। হাতের লেখা দেখে মনে হচ্ছে পুরুষমানুষ।'—এই ব'লে একখানা খাম আমার হাতে দিয়ে দিলেন তিনি। দিয়ে বললেন, 'কলেজের ঠিকানায় যখন লিখেছেন, তখন বোধ হয় অনেক দিন হ'ল তাঁর সঙ্গে তোমার যোগাযোগ নেই। এত গোলাবারুদের মধ্যে মানুষ সেখানে এখনও টিকে আছে কি ক'রে তাই ভাবছি। ভদ্রলোকটি কে, জয়া?'

ফস ক'রে মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল আমার, 'ভবতোষ—ভবতোষ ঘোষ।'

'ভবতোষ? মানে—'

'আপনি চেনেন নাকি?'

'না। তবে রত্নার স্বামীরও নাম শুনেছি—ভবতোষ ঘোষ।'

সংশোধন করবার কিংবা মিথ্যে বলবার আমার আর উপায় ছিল না। সুজাতাদির মুখের দিকে চেয়ে বুঝতে পারলুম, আমার পুরনো সম্পর্কের বেড়ালটা আবদ্ধ থলে থেকে বেরিয়ে পড়ল তাঁর সামনে। আমি চ'লেই যাচ্ছিলাম, তিনি আবার ডেকে বললেন, 'নিশীথকে দেখে বড় ভাল লেগেছে। বড় ভাল ছেলেটি। কিন্তু লোকের মুখ তুমি বন্ধ করবে কি ক'রে?'

ক্লাস শেষ ক'রে বাড়ি ফিরে এলুম। ফিরতে প্রায় সন্ধ্যেই হয়ে গেল। বসবার ঘরে ব'সে ভবতোষের চিঠিখানা পড়তে লাগলুম আমি। ভবতোষ লিখেছে—

আমার চিঠি পেয়ে নিশ্চয়ই তুমি অবাক হবে। তোমাকে অবাক করবার জন্যে এ চিঠি তোমায় আমি লিখছি না।

ঝরনা মরে গেছে।

ওর জন্যেই জানুয়ারি মাসে দেশে ফিরতে পারি নি। এবার ফিরব। ঝরনা আত্মহত্যা করেছে।

না ক'রে ওর উপায় ছিল না।

কেন উপায় ছিল না সেটা বলবার জন্যেই তোমাকে চিঠি লিখছি। তোমার কাছে এই আমার শেষ চিঠি। ঝরনার আত্মহত্যার খবর তোমাকে জানানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে, ওর মত তুমিও যেন কোনদিন আত্মহত্যার মহাপাপে নিমগ্ন না হও।

ঝরনার সঙ্গে তোমার এক জায়গায় ভীষণ মিল আছে।

তোমরা দুজনেই নাস্তিক। তোমার মুখোশ আমার সামনে খুলে পড়েছে অনেক দিন আগে। কিন্তু দুজনের মধ্যে অমিলও আছে।

তুমি ইনটেলেকচুয়েলি নিরীশ্বরবাদে বিশ্বাস কর। ঝরনা বৈজ্ঞানিক শুচিতা নিয়ে নিরীশ্বরবাদের বিশ্বাসের মধ্যে বাস করত। তোমার প্রায় সবটুকুই মেকি ; ঝরনার সবটুকুই খাঁটি। নিরীশ্বরবাদের মূলে গিয়ে পৌঁছেছিল সে। এটাই আবিষ্কার করবার জন্যে অফিস থেকে ছুটি নিয়ে আমি এত বেশী দিন লণ্ডনে র'য়ে গেলুম।

খাঁটি নিরীশ্বরবাদীর জীবন সে যাপন করছিল। আত্মহত্যা করবার দিন দুপুরবেলার দিকে ওর সঙ্গে আমার শেষ দেখা। হোটেলের 'বারে' ব'সেই গল্প হচ্ছিল। এত শান্ত ও স্বাভাবিক ওকে আর আমি কোনদিনই দেখি নি। চটুলতার চিহ্ন নেই। জীবনে যা চেয়েছিল তার সবই যেন সে পেয়েছে। অদ্ভুত ধরনের একটা আত্মতৃপ্তির কঠিন সংযম দিয়ে চোখ মুখ আবৃত ক'রে রেখেছে। ভাল ক'রে চেয়ে দেখলুম ওর দিকে, না, পাপের পরিচয় কোথাও নেই। ভগবানকে অস্বীকার ক'রে ঝরনা যেন তার নিজের সম্পূর্ণ স্বাধীনতার ওপর একক কর্ত্রী

হয়ে বসেছে। সে ছাড়া পৃথিবীতে আর কিছু নেই, সে নিজেই যেন পরম সত্তা, সুপ্রিম রিয়ালিটি!

হঠাৎ এক সময়ে সে বলল, তর্কের মেজাজ নিয়ে নয়, মন্তব্য হিসেবে: মানবপ্রেমিক হতে যদি না চাও তা হ'লে সিদ্ধপুরুষ হওয়া সহজ। দু-একজন সেন্টের জীবনী আমি পড়েছি।

মনে মনে ভাবলুম, এর চেয়ে বড় মিথ্যে নিরীশ্বরবাদীর মুখ থেকে উচ্চারিত হতে কেউ কখনো শোনে নি।

জিজ্ঞাসা করলুম, কথাটা কি তোমার নিজের?

না। ইয়োরোপেরই একজন বিগত শতাব্দীর সিদ্ধপুরুষের কথা। তবে তিনি ছিলেন মানবপ্রেমের সিদ্ধপুরুষ। ভবতোষ, নিরীশ্বরবাদের বাইরে আমি কোন রিয়ালিটি খুঁজে পাই নি। এর দ্বিতীয় কোন প্রতিদ্বন্দ্বী আছে ব'লে আমি বিশ্বাস করি না।

তোমার বিশ্বাসের গভীরতা দেখবার জন্মেই লণ্ডনে এতদিন র'য়ে গেলুম। কিন্তু—

বাধা দিয়ে ঝরনা বলল, 'কিন্তু' দিয়ে আবার একটা তর্ক শুরু করতে চাও? মিষ্টি হেসে ঝরনাই বলল, সন্ধ্যের সময় আমার কামরায় এসো, কথা হবে। ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে ঘোষণা ক'রে গেল, সব চেয়ে দুঃখ কি আমার জান? একদিন হয়তো নিরীশ্বরবাদকে সবাই বুর্জোয়া ডেকাডেন্স ব'লে মনে করবে। সন্ধ্যের সময় তুমি এসো, ভবতোষ।

সন্ধ্যের দিকে গিয়ে দেখি, ওর কামরার সামনে ভিড় জমেছে। ডাক্তার একজনকে দেখতে পেলুম। তিনি বললেন, প্রায় তিন ঘণ্টা আগে মারা গেছেন। মনে হয় পোটাসিয়াম সাইনাইড ব্যবহার করেছেন।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, মিস্টার দেশাই কোথায়?

হোটেলের ম্যানেজার বললেন, ইণ্ডিয়ায় ফেরবার প্যাসেজ পেয়েছেন ওঁরা কাল। মিস্টার দেশাই গেছেন টিকিট কাটতে।

দু-পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ভিড় ক'মে গেল। হাজার হাজার মৃত্যুর মধ্যে ঝরনার মৃত্যুটা কারও কাছেই তেমন ভয়াবহ ব'লে মনে হ'ল না। দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম আমি। শেষবারের মত ঝরনাকে দেখলুম। মাথার চুল সব সুন্দর ক'রে বাঁধাই রয়েছে। লম্বা চুলের গর্ব ছিল ওর। বাঁ হাত থেকে একটু দূরে ঘড়িটা রয়েছে। দেখলুম টিক টিক আওয়াজ হচ্ছে। ডান হাতটা প'ড়ে রয়েছে একটা ফোটোর ওপর। মনে হ'ল ফোটোখানা নন্তুর।

ঝরনা মরেছে একেবারে উলঙ্গ হয়ে।

একটু বাদেই ছুটতে ছুটতে মিস্টার দেশাই এলেন। শুনলেন সব। দেখলেনও বটে। অতবড় মোটা দেহের কোথা থেকে জলের স্রোত এল বুঝতে পারলাম না। ঝর ঝর ক'রে কাঁদতে লাগলেন তিনি। ঝরনা এবং মিস্টার দেশাই দুজনেরই হিসেবের ভুল দেখতে পেলুম আমি। মনে হ'ল, মিস্টার দেশাই এখনও বাচ্চা ছেলে। পঁয়তাল্লিশ কিংবা পঞ্চাশ বছর বয়স তাঁর নয়। ঝরনার কাপড় দিয়ে ঝরনাকে ঢেকে দিলুম আমিই।

গির্জা থেকে যখন ফিরে এলুম, রাত বোধ হয় তখন দশটাই হবে। পুলিশ-তদন্তের জন্যে হোটেল থেকে মৃতদেহ সরিয়ে ফেলা হয়েছে। ঝরনার মৃত্যুর সাত দিন পরে তোমায় এ চিঠি লিখছি।

আত্মহত্যা ছাড়া ঝরনার আর কোন উপায় ছিল না। কারণ সত্যিকারের নিরীশ্বরবাদীর জীবন যাপন করা সম্ভব নয়।

ডস্টয়ভস্কির বিখ্যাত একটি চরিত্র কিরিলভের কথা মনে আছে কি তোমার? আত্মহত্যা করবার পূর্বমুহূর্তে নিরীশ্বরবাদী কিরিলভ বলছে পিটার স্টেপানোভিচকে, 'ভগবানকে যদি স্বীকার করতে হয়, তা হ'লে সব কিছু তাঁর ওপরেই নির্ভর করছে। তাঁর ইচ্ছার বাইরে আমার কিছু করবার ক্ষমতা নেই। কিন্তু ভগবানের অস্তিত্ব যদি না থাকে, তা হ'লে সব কিছুই আমার ওপরে নির্ভর করছে। আমার স্বাধীনতার

পথে কোন বাধা থাকতে পারে না।...গত তিন বছর থেকে আমি আমার নিজস্ব দিব্য-শক্তির ধর্ম খুঁজে বেড়াচ্ছিলুম। আমি তা পেয়েছি। আমার এই দিব্য-শক্তির ধর্ম হচ্ছে স্বাধীনতা। কিন্তু এই স্বাধীনতা ভীষণ সাংঘাতিক। আমার এই সাংঘাতিক স্বাধীনতার সত্য প্রমাণ করবার জন্যে আমি আত্মহত্যা করছি।'

কিরিলভকে আত্মহত্যা করতেই হ'ল, নইলে সে উন্মাদ হয়ে যেত।

কিরিলভ সত্যিকারের নিরীশ্বরবাদী ছিল ব'লেই সে প্রমাণ করতে বাধ্য হয়েছে যে, তার এই সর্বনেশে স্বাধীনতার কাছে তার নিজের অস্তিত্ব পরাধীন।

জয়া, ঝরনার সঙ্গে কিরিলভের কি সামঞ্জস্য দেখতে পাচ্ছ না? তোমাকে আর কিছু লেখবার প্রয়োজন নেই। কোনদিনও আর লিখব না। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন। ইতি ভবতোষ।

চিঠিটা শেষ ক'রে উঠতে আমি যেন ঘেমে উঠলুম। নিজের মনে বার বার ক'রে বলতে লাগলুম, ভবতোষ, তুমি প্রতারক। কলমটা নিয়ে ওর চিঠির উপরেই লিখে ফেললুম: তুমি মূর্খ। তোমার নিজের সংসারের ভাঙন তুমি দেখতে পাও নি।

সামনের দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকলেন কবি বীরেশ রায়। চিঠিখানা ভাঁজ ক'রে রেখে দিলুম হ্যাণ্ডব্যাগের মধ্যে। দিয়ে নরম সুরে বললুম, 'আসুন—অনেকদিন পরে এলেন।' ভেতরের উত্তেজনা সব লুকিয়ে ফেললুম মুহূর্তের মধ্যে। কবি বীরেশ রায় বসলেন আমার মুখোমুখি হয়ে। মনে হ'ল, কবি বীরেশ রায় বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন। অত অল্প বয়সে সামনের দিকের অনেকগুলো চুলও গেছে পেকে। সিগারেট ধরাতে গিয়ে দেখলুম, তাঁর হাত কাঁপছে।

জিজ্ঞাসা করলুম, 'শরীরের এমন হাল হয়েছে কেন?'

'ইনসম্নিয়া, বহু দিন থেকে অনিদ্রারোগে ভুগছি। ওষুধ খেয়েও আজকাল আর ঘুম আসছে না। আপনার এখানে আসবার আগে

হঠাৎ আমার মনে হ'ল, পৃথিবীর ভাল লোকগুলোও সব অনিদ্রারোগে ভুগছেন—আপনিও, মিস বোস।……সব কিছু বড্ড অস্বাভাবিক ঠেকছে।'

হাসবার ভান করতে বাধ্য হলুম আমি।

বীরেশবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'হাসছেন যে ?'

'এমনিই। পৃথিবীটা বোধ হয় ঠিকই আছে।'

'বোধ হয়।' দ্বিতীয় সিগারেটটি ধরাতে গিয়ে বীরেশবাবু পর পর তিনটে কাঠি নষ্ট ক'রে ফেললেন। আঙুলগুলো এত বেশী জোরে জোরে কাঁপছিল যে, জ্বলন্ত কাঠি মুখ পর্যন্ত পৌঁছতে পারছিল না। আমি তাই তাঁর হাত থেকে দেশলাইটা নিয়ে বললুম, 'মুখটা একটু এগিয়ে আনুন, আমি ধরিয়ে দিচ্ছি।'

ধরিয়ে দিলুম। তিন-চারটে টান দিয়ে বুক ভরে ধোঁয়া নিয়ে তিনি বললেন, 'কোথায় যে ব্যাধি ঠিক ধরতে পারছি না। আপনার কথামত পৃথিবীটা বোধ হয় ঠিকই আছে। বোধ হয়···মানুষ তার নিজের মুখের প্রতিরূপটাকে পৃথিবী ব'লে ভুল করে। বোধ হয় করে।'

বীরেশবাবু আর কথা বললেন না। আমি নিজেও খুব পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছি। শীতের শেষের ঝরা পাতার মত প'ড়ে রয়েছি পৃথিবীর বুকে। কবে যে পাতাকুড়ুনীরা এসে আমাকে কুড়িয়ে নিয়ে জ্বালানোর কাজে লাগিয়ে দেবে তারই জন্যে যেন দিন গুনছি! ভেতরের সবটুকু দুর্বলতাই বুঝি আজ ধরা পড়বে বীরেশবাবুর কাছে।

আমি বললুম, 'নতুন ক'রে জীবনটা শুরু করলে কেমন হয় ?'

'কি রকম ?'—নিস্তেজ কৌতূহল বীরেশবাবুর প্রশ্নে।

বললুম, 'যদি বিয়ে করেন, তা হ'লে হয়তো—'

'না না, মিস বোস। স্ত্রীলোকের ভালবাসার প্রতি আমার বিন্দুমাত্র মনোযোগ নেই।'

'সে তো পুরনো কথা। আজকাল কি আপনার মতের কোন পরিবর্তন হয় নি ?'

মলিন হাসি ভেসে উঠল বীরেশবাবুর মুখে। এর চেয়ে মলিনতর হাসি মানুষ হাসতে পারে না।

সিঁড়ির দিক থেকে জগদীশবাবুর গলা শুনতে পেলুম। বীরেশবাবু বললেন, 'বাবা এলেন বোধ হয়। বাবার জন্যেও দুঃখ আমার কম নয়।'

'আপনি বসুন, আমি দেখছি।'

ঘরের বাইরে গিয়ে দেখি, জগদীশবাবু সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে আসছেন।

'এই যে মা জয়া, কেমন আছ ? অমিতাভকে আজ সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসেছি। রাত্রে আমার ওখানেই আজ থাকবে'—পেছন ফিরে তিনি ডাকলেন, 'এস, এস হে অমিতাভ।'

এত কুৎসিত চেহারার মানুষ জীবনে আমি এই প্রথম দেখলুম ! একটা হাত তুলে তিনি আমায় নমস্কার করলেন। আমার নিজের হাত তুলতে দেরি হ'ল। জগদীশবাবু ব্যথা পেয়েছেন বুঝলুম। বিরক্তির দৃষ্টিতে তিনি চেয়ে রইলেন আমার দিকে।

অমিতাভ সেনের দিকে চেয়ে আমি বললুম, 'আসুন।' জগদীশবাবুকে বললুম, 'চলুন, ডাইনিং-রুমে গিয়ে বসি।'

'সেখানে কেন, মা ? তোমার বসবার-ঘরে কি হ'ল ?'

জবাব দিলুম না। একটা মুহূর্তই বিলম্বিত হতে লাগল। একটা মুহূর্তের উত্তাপে আমি ঘেমে উঠেছি।

'জয়া-মা, তুমি বোধ হয় অন্য লোকের সঙ্গে ব্যস্ত আছ। আজ আমরা যাই তা হ'লে। অন্য একদিন আসব।'

'না না—তা হয় না। চলুন।'

ওঁদের পেছনে পেছনে আমি হাঁটতে লাগলুম। জগদীশবাবু ড্রয়িং-রুমে গিয়ে ঢুকলেন। অমিতাভ সেন গেলেন তাঁর পরে।

আমি বাইরে থেকে শুনলুম জগদীশবাবু বলছেন, 'এই যে বীরেশ। তুমি কতক্ষণ? অমিতাভকে নিয়ে এসেছি।'

'কে?'—বীরেশবাবুর গলার স্বরে কম্পান।

'অমিতাভ সেনকে কি তুমি ভুলে গেলে, বীরেশ? যুদ্ধে আহত হয়েছে ও।'

'না—না—'

তারপর দরজার বাইরে দাঁড়িয়েই আমি শুনতে পেলুম বিকট একটা চিৎকার। সারা লেক প্লেসের বাড়িগুলোর গায়ে চিৎকারটা প্রতিধ্বনি তুলল। মুহূর্ত কয়েক পর্যন্ত আমার কানের পর্দায় ধ্বনির মূর্ছনা লেগে রইল। মনে হ'ল, কানের পর্দা ভিজে উঠেছে। ধ্বনিটার বুক চিরে বোধ হয় জলের বিন্দু গড়িয়ে পড়ল আমার কানে। সেই পুরনো ব্যথা, সেই পুরনো সুর, সেই পুরনো ক্রন্দন।

কবি বীরেশ রায় মূর্ছা গেছেন। জগদীশবাবু চেঁচাতে লাগলেন, 'ড্রাইভার, নিশীথ, ডাক্তার, জয়া-মা—'

আমার কিছুই করবার ছিল না। ড্রাইভার এল, নিশীথ এল, এল দারওয়ানও। জগদীশবাবু বললেন, 'ডাক্তার সেনকে একবার ফোন কর।' ফোন করলুম। ডাক্তার সেন এলেন। কিন্তু তার আগে অমিতাভ সেনকে ওখান থেকে সরিয়ে নিয়ে এলুম। বসতে দিলুম ডাইনিং-রুমে। বললুম, 'কিছু মনে করবেন না। আপনারও তো শরীরটা ভাল না। এখানে বসুন নিরিবিলিতে।'

'ধন্যবাদ।' বলল অমিতাভ।

প্রায় এক ঘণ্টা পরে সবাই মিলে ধরাধরি ক'রে বীরেশবাবুকে নিয়ে গাড়িতে তুললেন। জ্ঞান তাঁর ফিরে আসে নি। ডাক্তার সেনের পরামর্শমতই বীরেশবাবুকে নিয়ে ওঁরা চ'লে গেলেন চৌরঙ্গী কোর্টে। যাওয়ার সময় আমি জগদীশবাবুকে বললুম, 'অমিতাভকে আজ আমি এখানেই রেখে দিলুম। ওর জন্যে ভাববেন না।'

সেই সকালের কাপড় এখনও ছাড়া হয় নি। এবার আমি তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকে পড়লুম। অমিতাভকে ব'লে এলুম, 'আমায় আর পনেরো মিনিট সময় দিন। সারাটা দিন আমার বড্ড হৈ-চৈয়ের মধ্যে দিয়ে কেটে গেল। আপনাকে কি দেব বলুন তো? চা? কফি? না, হুইস্কি?'

নিজের পকেট থেকে কাগজ বার ক'রে অমিতাভ গভীর মনোযোগ দিয়ে ছবি আঁকছিল। আঁকছিল বাঁ হাত দিয়ে। পাশের ঘরে যে একটু আগে এমন একটা কাণ্ড হয়ে গেল তা যেন ও জানেই না। যেমন ভাবে সে এসে ড্রয়িং-রুমে ব'সে ছিল এক ঘণ্টা পরেও ঠিক তেমনি ভাবে ব'সেই সে ছবি আঁকছে। আমার কথা শুনে বলল, 'হুইস্কি।'

কাছে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, 'কি করছেন?'

'ছবি আঁকছি। হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে অবধি আর ছবি আঁকি নি।' কাগজটার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, 'কি ছবি এটা?'

'শূন্যতার— নাথিংনেস।'

'শূন্যতা? একটি মেয়ের মত মনে হচ্ছে—'

'মেয়ের মত কেন, মেয়েই তো। মাথাটা ধামা দিয়ে ঢেকে দিয়েছি। চন্দননগরের বাজারে এই রকমের ধামা দেখেছি। ধামাটা চন্দননগরের, কিন্তু মেয়েটি ফরাসী দেশের।'

'এমন কেন আঁকলেন? মেয়েটি তো চন্দননগরের হতে পারত?'

'চন্দননগরে মেয়ে আছে না কি? ভারতবর্ষে আমার ছ মাস হয়ে গেল, মেয়ে দেখি নি একটিও। আমার একটা চোখ নেই বটে, কিন্তু অন্য চোখ দিয়ে ভালই দেখি। ধামাটা কেমন লাগছে দেখতে?'

হেসে বললুম, 'আমি আসছি—এসে দেখব।'

কাপড়চোপড় বদলে আসতে আমার মিনিট কুড়ি লাগল। অমিতাভর সঙ্গে দু-চারটে কথা ক'য়ে এরই মধ্যে আমার শ্রান্তি অনেকটা ক'মে গেছে। মনে হচ্ছে, আজকের রাতটা শেষ না হতেই ধরবার মত নতুন

কিছু একটা পাওয়া যাবে। অমিতাভকে নিয়ে আমি যখন ড্রয়িং-রুমে এসে বসলুম, তখন পুরনো জগৎটার গোটা অস্তিত্বটাই গ'লে গেছে আমার মন থেকে।

ছবিটা আমায় দেখাবার জন্যে অমিতাভ উঠে এসে ব'সে পড়ল আমার পাশে। বলল সে, 'আপনি যখন স্নান-ঘরে গিয়ে ঢুকলেন, তখন আমি মেয়েটির মাথা থেকে ধামাটা তুলে নিয়ে গেলাম।'

'তুলে নিয়ে কি করলেন ?'

'এই দেখুন, মাথার ওপরে একটা কমোড উল্টো ক'রে বসিয়ে দিয়েছি। ব্যাপারটা তা হ'লে বলি।'

'বলুন।'

'ব্যাপারটা হচ্ছে শূন্যতা, মানে মানব-জীবনের একমাত্র সত্য, রিয়ালিটি। মেয়েটির অনেক পয়সা, সে সুন্দরী, লোভনীয় স্বাস্থ্য, এক কথায় বলতে গেলে এমন আদর্শ জীব স্বর্গেও পাওয়া যায় না। ঐশ্বর্য এবং ভাল স্বাস্থ্য থাকলেই তার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হবে বাইরের দিকে ছড়িয়ে পড়া। তাতে সে তার নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন হতে পারবে না। সে বেঁচে আছে কি নেই তা বুঝতে হ'লে তার দৃষ্টি ফেলতে হবে ভিতরের দিকে। ভিতরের দিকে দৃষ্টি ফেলতে গিয়েই সে বুঝতে পারল যে, সে অসুস্থ। এক খণ্ড কালো মেঘ কখন যে এসে তার গোটা অস্তিত্বটাকে অন্ধকার দিয়ে ছেয়ে ফেলেছে তা সে টের পায় নি। টের পেল যখন সে অসুস্থ হয়ে পড়ল। সে বেঁচে আছে কি না বোঝবার জন্যেই যেন তাকে অসুস্থ হতে হ'ল। তার পর সে কি দেখল ? মৃত্যুর ছায়া। মেয়েটি এবার বুঝতে পারল, সে একা, সে পরিত্যক্তা। পৃথিবীর যাবতীয় বাস্তব থেকে সে ছিন্ন হয়ে গেছে। চারদিকে তার শূন্যতা ছাড়া আর কিছুই নেই। মেয়েটি এখন কি করবে ? শূন্যতার সঙ্গে সংগ্রাম করবে। অস্তিবাদীর জীবনে আর কিছু করবার নেই। গোটা পৃথিবীর দার্শনিক আর সিদ্ধপুরুষদের

ফাঁকি সে ধরে ফেলেছে। রাজমুকুট আর কমোডের মধ্যে পার্থক্য কি? কিচ্ছু না। কেবলমাত্র চেতনার কম-বেশীর ওপরে এক-আধটু পার্থক্য থাকতে পারে। তাতেও মেয়েটির সুবিধে একটু বেশী। রাজমুকুটের নিরর্থক ঝামেলার চেয়ে কমোডের সীমায়িত অন্ধকারে শান্তি অনেক বেশী। মিস বোস তো গেলাসে এখনও মুখ লাগালেন না? আপনার স্বাস্থ্য ভাল আছে তো?'

'অ্যাঁ! হ্যাঁ, স্বাস্থ্য বোধ হয় আমার ভালই হচ্ছে। এখন ছবিটার কি ব্যবস্থা করবেন?'

'আপনাদের দেশে গ্যালারির তেমন ভাল ব্যবস্থা নেই, আপনাকেই উপহার দিলুম। এর ব্যাখ্যাটুকুও আপনার।'

আমাদের কথা যখন শেষ হ'ল, তখন লাইব্রেরি-ঘরের দরজা দিয়ে ভোরের আলো ঢুকে পড়েছে।

রাত্রির ঘুম আমার অমিতাভ সেন কেড়ে নিয়ে গেল।

এর পরে প্রায় দু সপ্তাহ কেটে গেছে। অমিতাভ একদিন এসেছিল। বেশীক্ষণ বসতে পারে নি। অন্য একদিন আসবে ব'লে প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেছে।

সকালবেলার দিকে একদিন টেলিফোন করলেন জগদীশবাবু। বীরেশবাবু খুবই পীড়িত ব'লে আমি জানতুম। মাঝে মাঝে জ্ঞান আসে, আবার অচৈতন্য হয়ে পড়েন তিনি। কলেজের পরীক্ষা নিয়ে ব্যস্ত ছিলুম ব'লে তাঁকে দেখতে যেতে পারি নি।

আজ জগদীশবাবু টেলিফোনে বললেন, 'বীরেশের অবস্থা বেশ খারাপ ব'লেই মনে হচ্ছে। তোমার যদি সময় হয় একবার এসো।'

'হ্যাঁ, বিকেলের দিকে নিশ্চয়ই যাব।'

'তুমি নিজে সুস্থ আছ তো, মা?'

'অসুখ কিছু নেই।'

'চিৎকার ক'রে বীরেশ যে মেঝেতে প'ড়ে গিয়েছিল, তাতে মাথায় খুব লেগেছিল। এখন সব আরও অনেক রকমের জটিলতা বেড়েছে। আমি তো প্রায় পনেরো দিন থেকে এখানেই আছি। বাড়ি যেতে পারি নি। তা ছাড়া বাড়িতে কেউ নেইও।'

'কেন? ওঁরা সব কোথায় গেলেন?'

'আমার স্ত্রী ছেলে দুটিকে নিয়ে লণ্ডনে চ'লে গেছেন। তাও কম দিন হ'ল না। আমারও তো এরই মধ্যে সেখানে একবার যাওয়ার কথা ছিল, মা। তুমি একবার এসো।'

'আচ্ছা।'

কলেজে বেরুবার মুখে রন্তার বেয়ারা রণবীর সিং এসে উপস্থিত হ'ল। জিজ্ঞাসা করলুম, 'কি খবর? ঠিকানা পেলে কোথায়?'

'আপনার কলেজ থেকে। টেলিফোন ক'রে সাহেবই ঠিকানা জেনে নিলেন।'

'সাহেব?'

'তিনি আজ বিলেত থেকে ফিরেছেন।'

'তা বেশ, বেশ।'—সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে নামতে আবার জিজ্ঞাসা করলুম ওকে, 'খবর কি?'

'মেম-সাহেব আজ তিন দিন থেকে বাড়ি ফেরেন নি। ড্রাইভার পর্যন্ত খবর কিছু বলতে পারল না। আপনার এখানে কি তিনি আসেন নি?'

'কই, না তো।'

'তা হ'লে, আপনি কি অন্য কোন ঠিকানা জানেন?'

'না, আমি কোন ঠিকানা জানি না।'

রাস্তায় এসে সামনেই একটা ট্যাক্সি পেলুম। একটু দেরিই হয়ে গেল। বোধ হয় ঘণ্টা প'ড়ে গেছে। মেয়েগুলো নিশ্চয়ই বারান্দায় দাঁড়িয়ে হল্লা করছে।

দোতলার সিঁড়ির কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলেন সুজাতাদি। তিনি বললেন, 'লেট করেছ অনেক। মেয়েরা বড্ড বেশী চেঁচামেচি করছিল। তাদের ক্লাসে পাঠিয়ে দিয়ে আমি এখানে পাহারা দিচ্ছি। ওঃ, ভাল কথা মনে পড়ল। রত্নার স্বামী ভবতোষ ঘোষ টেলিফোন করেছিলেন। টেলিফোন ধরেছিলাম আমি। তিনি তোমার নতুন ঠিকানাটা চাইলেন। পুরনো ঠিকানাটা তাঁর জানা আছে দেখলুম। রত্নার সঙ্গে খুব মেলামেশা করছ না কি ?'

'আপনি তো জানেন, আমার সময় খুব কম। এখান থেকে মেয়েদের গলা শুনতে পাচ্ছি, যাই।'

'আর কোনদিনও লেট ক'রো না। আমাদের চেয়ারম্যান বড্ড কড়ামেজাজের মানুষ। কোন্ দিন হয়তো হঠাৎ এসে উপস্থিত হবেন। যাচ্ছ ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'শোন।'—এই ব'লে তিনি নিজেই এগিয়ে এলেন আমার কাছে। এসে নীচু স্বরে বললেন, 'তোমার ছোটমামীর বিয়ে হয়ে গেছে। শুদ্ধির কাজও শেষ। আচ্ছা, এবার এস।'

বাড়ি ফিরতে আমার প্রায় সন্ধ্যেই হয়ে গেল। আজ কোথা থেকে কেমন ক'রে যেন সব কাজেই বাধা প'ড়ে যাচ্ছে। চৌরঙ্গী কোর্টের রাস্তা খুব সরল ব'লে মনে হ'ল না।

সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে নিশীথকে ডেকে বললুম, 'খাবার কি আছে শিগগির নিয়ে আয়। আমায় এখুনি একবার বেরুতে হবে। হ্যাঁ রে, জগদীশবাবু টেলিফোন করেছিলেন ?'

'না।'

'তা হ'লে বোধ হয় বীরেশবাবু ভালই আছেন।'

আমি চ'লে যাচ্ছিলাম আমার শোবার-ঘরের দিকে। নিশীথ ডাকল, 'দিদিমণি, ভবতোষবাবু এসে ব'সে আছেন।'

'কে ?'

'ভবতোষ ঘোষ, নাম বললেন।'

'ভবতোষ ঘোষ ?'

'হ্যাঁ।'

'রত্নাদির স্বামী ভবতোষ ঘোষ ?'

'তিনি তাই বললেন।'

'নিজের মুখে তিনি রত্নাদির স্বামী বললেন ?'

নিশীথ জবাব দিল না, হতভম্বের মত চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। আমি একটু চাপা সুরে ওকে বললুম, 'প্রথম দিন তোর জন্যে যে সুটটা তৈরি ক'রে এনেছিলাম, সেটা কোথায় ?'

'আলমারিতে।'

'তা থেকে প্যাণ্টটা প'রে আয়। আর সেই পুল-ওভারটা ?'

'আমার ঘরে।'

'সেটাও প'রে আয়।'

নিশীথ আমার কাছে তার মুখ এনে ঘোষণা করল, 'দিদিমণি, ঠিক ওই রকমের একটা জামা রত্নাদির স্বামীও প'রে এসেছেন।'

'আঃ! এমন সুযোগ আর আসবে না, নিশীথ। তুই প'রে আয় সব। জামাকাপড় প'রে তবে চা নিয়ে আসবি।'

'আচ্ছা, ওগুলো সব প'রে আসি আগে।'

দ্রুতপদে নিশীথ অন্তর্হিত হ'ল।

দরজার ও-পাশে দাঁড়িয়েই একটু জিরিয়ে নিলুম আমি। তারপর বসবার-ঘরে ঢুকলুম। আমাকে দেখে ভবতোষ দাঁড়িয়ে পড়ল। হাত বাড়িয়ে দিল আমার দিকে। বললুম, 'ব'স।'

ভবতোষ জিজ্ঞাসা করল, 'কেমন আছ ?'

আমি জবাব দিলুম, 'ভাল আছি।'

'তোমার বাড়িঘর দেখে তো তাই মনে হয়। সুন্দর ফ্ল্যাট নিয়েছ।'

'অনেকক্ষণ থেকে ব'সে আছ, না ?'

'হ্যাঁ, তা প্রায় এক ঘণ্টাই হবে। ব'সে ব'সে তোমার দেওয়ালে টাঙানো ওই ছবিটা দেখছিলাম।'

'ভাল লাগে নি তোমার? ফ্রেম করতে অনেক টাকা খরচ করতে হয়েছে।'

'সাধ্য থাকলেই মানুষ খরচ করে। কিন্তু মাথার ওপরে অত বড় একটা কমোড চাপিয়েছেন কেন শিল্পী বুঝতে পারলুম না। রেখা-টানার মধ্যে পাকা হাতের ছাপ রয়েছে। কমোডের অংশটুকুই কেবল আমাকে পীড়া দিচ্ছিল।'

'ওই অংশটুকুর মধ্যেই আমি শিল্পীর প্রতিভা দেখতে পেয়েছি। যীশুখ্রীষ্টের ছবি ছাড়া তোমার কোন ছবিই ভাল লাগবে না আমি জানি। আমার এখানে কি মনে ক'রে? বউ খুঁজতে বেরিয়েছ না কি ?'

এই সময় নিশীথ ট্রেতে সাজিয়ে চা আর কিছু খাবার নিয়ে এল। আমি এবার অনুরোধের সুরেই বললুম, 'খাও। খবর দিয়ে এলে আমি তোমার সেই প্রিয় খাবারটা তৈরি ক'রে রাখতুম। আজকাল তো পুরোদস্তুর সাহেব ব'নে গেছ। গরম লুচি আর বেগুনভাজা বোধ হয় ভাল লাগে না ?'

ভবতোষ নিশীথকে দেখছিল। দেখছিল ওর জামা-কাপড়। পুল-ওভারটা ভাল ক'রে দেখাবার জন্যেই যেন নিশীথ দম নিয়ে বুকের ছাতিটা আরও চওড়া ক'রে ফেলল। আমি বললুম, 'নিশীথ, এবার তুই যা। তুমি খাও, ভবতোষ।'

খাওয়ার আগে দেখলুম, ভবতোষ হাত দিয়ে একটা ক্রুশের চিহ্ন আঁকল, তারপর খেতে আরম্ভ করল। খেতে খেতে সে বলল, 'ওপরে উঠে এই লোকটির সঙ্গেই আমার প্রথম দেখা হ'ল। পরিচয় দিতে পারছিলুম না। শেষ পর্যন্ত রত্নার নাম বলতে হ'ল। আমি জিজ্ঞাসা

করলাম—তুমি এখানে কি কর? লোকটি বলল—আমি দিদিমণির চাকর। ভাল চাকর পেয়েছ, জয়া।'

'নিশীথ চাকর নয়, ও আমার ঠাকুর।'

খাওয়া শেষ না হতে নিশীথ এসে বলল, 'জগদীশবাবু এইমাত্র টেলিফোন করেছিলেন। তোমাকে এক্ষুনি একবার যেতে বললেন তিনি।'

ভবতোষকে আমি বললুম, 'বীরেশবাবুর খুব অসুখ। আমি তাঁকে দেখতে যাচ্ছি। তুমি যাবে না কি আমার সঙ্গে?'

'আমি?'

'রত্নাকে তো খুঁজতেই বেরিয়েছিলে তুমি, সেখানে গেলে রত্নাকে হয়তো পেতে পার।'

ভবতোষের গাড়িতেই চৌরঙ্গী কোর্টে এসে পৌঁছলুম। মনে হ'ল, বড় ফটকটা দিয়ে ডাক্তার সেনের গাড়িটা বেরিয়ে গেল। লিফ্‌টে ক'রে উঠে এলুম ওপরে। সামনের বসবার-ঘরে দেখলুম জগদীশবাবু ব'সে রয়েছেন। বীরেশবাবুর বেয়ারাটা ব'সে আছে মেঝেতে, জগদীশ-বাবুর পায়ের কাছে। এত বড় একটা বিরাট ম্যান্‌সনের কোথাও এতটুকু আওয়াজ নেই। ভবতোষকে নিয়ে আমি এসে দাঁড়ালুম জগদীশবাবুর সামনে। শোবার-ঘরের দরজাটা ভেজানো রয়েছে।

জগদীশবাবু বললেন, 'প্রায় আধ ঘণ্টা আগে কবি বীরেশ রায় মারা গেছে। দশ বছর আগে ঠিক এই মাসের ঠিক এই তারিখেই ভগ্ন-হৃদয়ে বীরেশ এসে উঠেছিল এই ফ্ল্যাটে। আজকে এখান থেকে বিদায় নেবার আগে বীরেশ রত্নাকে দেখে গেছে। মিনিট পাঁচেকের জন্যে জ্ঞান হয়েছিল।'

আমি আরও একটু তাঁর কাছে এগিয়ে গিয়ে বললুম, 'ইনি হচ্ছেন রত্নার স্বামী ভবতোষ ঘোষ।'

জগদীশবাবু মাথা নীচু করলেন।

শোবার-ঘরের দরজাটা আমি খুললুম। ওখানে দাঁড়িয়েই বীরেশ-বাবুকে আমি দেখতে লাগলুম। আমাকে দেখাবার জন্যে জগদীশবাবু একদিন এই মানুষটিকেই নিয়ে এসেছিলেন বড়মামার লাইব্রেরি-ঘরে। সেদিন সেখানে ভবতোষ ছিল, আজও সে এখানে আছে।

বীরেশবাবুকে ভবতোষ আজ দেখল কি না জানি না—আমার মাথার ওপর দিয়ে উঁকি দিয়ে সে রত্নাকে আজ দেখল। বীরেশবাবুর খাটের ওপাশে, একটু দূরেই, একটা সোফার ওপর শুয়ে রত্না ঘুমচ্ছে। পরনে ওর সেই সালোয়ার আর ওড়না।

দরজাটা আবার ভেজিয়ে দিলাম আমি। ভবতোষকে নিয়ে জগদীশবাবুর সামনে দিয়ে চ'লে যাচ্ছিলাম, তিনি ডাকলেন আবার। বললেন, 'তিনটে দিন তিনটে রাত ক্রমাগত মেয়েটা ঘুময় নি। বীরেশকে সেবা করবার জন্যে রত্না এখানে আসে নি, দুজন নার্স রেখেছিলাম। রত্না যেন কি একটা কথা বলতে চেয়েছিল বীরেশকে। গত তিন দিনের মধ্যে বীরেশকে সে সজ্ঞান অবস্থায় পায় নি। আজ পেয়েছিল। বোধ হয় কথাটা ও বলতে পেরেছে। ভবতোষবাবু, রত্নাকে আমি নিজে গিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসব।'

লিফ্‌টে ক'রে নেমে এলুম নীচে। লিফ্‌টের আলোয় ভবতোষের মুখ আমি এই প্রথম দেখলুম। শান্ত, স্নিগ্ধ, সৌম্য—এই তিন রকম গুণের আলোয় ভবতোষের মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। আজ অন্তত ওকে ফ্যানাটিক ব'লে মনে হ'ল না।

গাড়ি থেকে নামবার আগে ভবতোষকে আমি বললুম, 'গাড়ি ক'রে নিয়ে গেলে আবার পৌঁছেও দিয়ে গেলে। ধন্যবাদ, ভবতোষ।'"

॥ ষোড়শ রাত্রি ॥

"দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। পেছন দিকে দৃষ্টি ফেলতে গিয়ে দেখি, কলকাতার সীমান্তগুলোতে যুদ্ধ এখনও থামে নি। লাইব্রেরি-ঘরে বসে বড়মামা জীবনের সত্য আবিষ্কারের জন্যে আজও সংগ্রাম করছেন। ছোটমামা তাঁর ঘরে ব'সে আধুনিক সভ্যতার গলদ সব খুঁজে খুঁজে তালিকাভুক্ত করছেন। ছোটমামার তালিকাটির ভবিষ্যৎ কি আমি তা জানি না।

রত্না, তোর সীমান্তেও যুদ্ধ থেমেছে ব'লে আমার মনে হয় না। গত ছু বছরের মধ্যে তোর সঙ্গে বোধ হয় বার ছুই দেখা হয়েছে। চ্যারিটি-শোর টিকিট বিক্রি করতে এসেছিলি। ওপরে উঠিস নি। আমার বাড়ির সামনে গাড়িতে ব'সেই তুই টিকিট বিক্রি ক'রে গেলি। সেই ছু-পাঁচ মিনিটের মধ্যে তোর কথা শুনে মনে হয়েছে যে, তোর সীমান্তেও এখনও যুদ্ধের অবসান ঘটে নি। তুই ঘোষণা ক'রে গেলি, ভবতোষ এখনও বর্বরই আছে। শিল্পের মানে ও আজও জানে না। তুই ভবতোষকে নাকি জানিয়ে দিয়েছিস যে, শিল্পই সত্য। কিন্তু ভবতোষ বলে যে, শিল্প সুন্দর, আর কিছু নয়।

সুজাতাদির পারিবারিক সীমান্তে নতুন গণ্ডগোলের হাওয়া উঠেছিল। কিন্তু চেয়ারম্যান বিমল গুপ্তের দয়ায় সেখানে এখন পূর্ণ শান্তি বিরাজ করছে। তাঁর স্বামী নতুন চাকরি পেয়েছেন বিমল গুপ্তের কাছে। সুনন্দা গুপ্ত সুপারিশ না করলে বুড়ো বয়সে তাঁর স্বামীর আর কোন গতি হ'ত না। মাস ছয়েক আগে জগদীশবাবুর অফিস থেকে তাঁর চাকরি চ'লে গিয়েছিল। কেন গিয়েছিল, তার কারণ অবশ্য আমি আজও জানি না। জগদীশবাবু গত ছু বছরের মধ্যে আমার এখানে এসেছিলেন মাত্র একবার।

আমার লেক প্লেসের সীমান্তেই কেবল যুদ্ধের কোন লক্ষণ দেখতে

পাচ্ছি না। নিশীথ তার সরলতার সাম্রাজ্যে আজও একচ্ছত্র সম্রাট। আমার মঙ্গলের জন্যে সে প্রাণ দিতে পারে, কিন্তু প্রাণ গেলেও অমঙ্গলের কাজ তাকে দিয়ে করানো যায় না। মদ খেলে যে আমার মঙ্গল হবে তেমন বিশ্বাসটুকু ওর বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে আমায় একটু পরিশ্রম করতে হয়।

অমিতাভ চন্দননগরের বাস তুলে দেয় নি। আমার এখানেই সে সময় কাটায় বেশী। মাঝে মাঝে পুরো সপ্তাহটাই এখানে কাটায়। বসবার ঘরে সে শুয়ে থাকে। জামাকাপড় প'রেই ঘুমোয়। আমার মনে হয়, এক হাত দিয়ে বেশ-পরিবর্তন করতে অসুবিধে হয় ওর খুব। কিংবা ইচ্ছে ক'রেই জামাকাপড় খোলে না ও। হয়তো সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন আছে ওর।

গত দু বছরের সারাংশটা লিখতে গিয়ে একটা কথা মনে পড়ল। কলকাতার সমাজে অমিতাভকে নিয়ে কোন কথা ওঠে নি। অমিতাভর সঙ্গে আমার সম্পর্ক খুব নিবিড় হয়ে উঠেছে। এই নিবিড়তাকে আমি ইচ্ছে ক'রেই লোকের সামনে আরও বেশী নিবিড়তর ক'রে প্রকাশ করতুম। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার, এমন কি সুজাতাদি পর্যন্ত অমিতাভর নাম উল্লেখ ক'রে আমার কুৎসা কখনও রটনা করতেন না। আমি হয়তো এমন ধরনের কুৎসা-রটনাই চেয়েছিলাম।

গত দু বছরের মধ্যে অমিতাভর বন্ধু-সংখ্যা বেড়েছে। বাংলাদেশকে ভালবাসবার জন্যে বন্ধু সে চেয়েছিল। বন্ধু পেয়েছে ও। বাড়িতে নেমন্তন্ন ক'রে তাঁদের আমি আপ্যায়িত করেছি—শিল্পী, সাহিত্যিক এবং কবির সংখ্যা তাঁদের মধ্যে কম ছিল না। এমনি একদিন নৈশ-ভোজের পরে সবাই যখন চ'লে গেলেন, অমিতাভ আমায় বলল, 'আজ বোধ হয় ওঁরা নিজেদের মধ্যে তোমাকে আর আমাকে নিয়ে অনেক কিছু আলোচনা করেছেন।'

'কি ক'রে বুঝলে?'

'মনে হ'ল। আমাদের দিকে চেয়ে ওঁরা কি যেন বলাবলি করছিলেন।'

'আমার তো সে রকম কিছু মনে হয় না। বরং আমার তো ওঁদের দু-একটা কথা শুনে মনে হ'ল, ওঁরা নিশীথকে নিয়ে আলোচনা করছিলেন। ওঁদের মুখ থেকে নিশীথের নামটা আমার কানে এসে পৌঁছল।'

অমিতাভ যেন একটু দ'মে গেল। আমাদের নিয়ে যে একটা কথাও রটছে না সেই জন্যে অস্তিবাদী অমিতাভর দুশ্চিন্তার আর শেষ নেই। কিছুদিনের জন্যে ছবি আঁকা ছেড়ে দিল অমিতাভ। দিনরাত সে চিন্তা করছে, কি ক'রে অপরের মুখ দিয়ে আমাদের সম্বন্ধে কুৎসা রটনার পথ তৈরি করা যায়। অমিতাভকে সাহায্য করবার জন্যেই অন্য একদিন ডিনার-পার্টিতে সুজাতাদিকে ডাকলুম। তাঁর সম্বন্ধে অমিতাভ সব কথাই জানত।

সুজাতাদি পৌঁছলেন এসে সন্ধ্যার আগে। বসবার ঘরে তাঁকে বসতে দিয়ে অমিতাভ এল আমার কাছে। বললুম, 'চল, দুজনে একসঙ্গে গিয়েই তাঁর সামনে দাঁড়াই।'

'হ্যাঁ, সেইটেই ভাল হবে।'

বসবার-ঘরের দরজার কাছে গিয়ে অমিতাভ তার বাঁ হাত দিয়ে আমার একটা হাত চেপে ধ'রে ভেতরে গিয়ে পৌঁছল। এমন একটা নিবিড় নৈকট্যের নমুনা দেখলেন সুজাতাদি। দেখাল অমিতাভই। অমিতাভ বসল আমার পাশে। আলোচনা খানিকটা এগিয়ে যাওয়ার পরে অমিতাভ আরও অনেকটা স'রে এল আমার দিকে। সুজাতাদির দৃষ্টি তবু সেদিকে যাচ্ছে না। অমিতাভর উপস্থিতিও যেন এখন আর সুজাতাদির চোখে ধরা পড়ছে না। আলোচনার মাঝখানে তিনি জিজ্ঞাসা ক'রে বসলেন, 'নিশীথ? মানে, তোমার সেই নিশীথকে তো দেখছি না।'

একটা বিষাদ-মগ্ন মুহূর্ত অমিতাভর সারা মুখে ক্রমশই ছাপ ফেলতে লাগল। ডিনার শেষ হওয়ার পরে আমাকে আড়ালে পেয়ে সুজাতাদি বললেন, 'এমন অকর্মণ্য লোকটিকে এত প্রোটিন খাইয়ে কোন লাভ হবে না, জয়া।' ধারে কাছে কোথাও কেউ আছে কি না দেখে নিয়ে তিনি একটু নীচু স্বরে বললেন, 'শুনলুম, ফরাসী দেশের হাসপাতালে ওর শুধু হাত-পা কাটা যায় নি, আরও কি যেন সব নষ্ট হয়ে গেছে। সত্যিই নাকি ? তা তুমিই বা জানবে কি ক'রে, জয়া ? তুমি তো আর মেডিকেল রিপোর্ট দেখ নি। রমার তো কোলে বাচ্চা এসে গেছে, জান ? তবে হ্যাঁ, লোকটি নাকি শুনেছি ভাল ছবি আঁকে। এখন আর এ দেশে ছবি এঁকেই বা কি হবে, ওরা তো চলল। দেশ স্বাধীন হচ্ছে। কংগ্রেসী আমলে শিল্পের মর্ম কে আর বুঝবে বল ? ও কি, তুমি কাঁদছ জয়া ? তোমায় তো কিছু বলি নি ভাই।'

আমাকে কেউ কোনদিন কাঁদতে দেখে নি, সুজাতাদি আজ দেখলেন।

আমরা চ'লে এলুম বসবার ঘরে। বাইরের দিকের বারান্দায় অমিতাভ পায়চারি করছিল। হঠাৎ সে ভেতরে এসে বলল, 'আমি আজ চন্দননগরে ফিরে যাচ্ছি।'

জিজ্ঞাসা করলুম, 'কেন ? এখন ট্রেন পাবে কি ক'রে ?'

'শেষ ট্রেনটা পাব, যদি ট্যাক্সি চেপে যাই। নমস্কার, মিসেস রায়।'

সুজাতাদিও উঠলেন। সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বললেন তিনি, 'কাল তো কলেজের প্রতিষ্ঠা-দিবস। একটু সকাল সকাল এসো। সংস্কৃত নাটকটা পরিচালনার ভার তো তোমার ওপরেই।'

বললুম, 'মেয়েরা ভালই শিখেছে। আমার দরকার হবে না।'

'সে কি ? প্রতিষ্ঠা-দিবসে তুমি আসবে না ?'

'তা আসব।'

'হ্যাঁ, সুনন্দা দেবী কাল তোমার সঙ্গে আলাপ করবেন।'

'তিনিই তো প্রধান অতিথি! তিনি আমার কথা শুনলেন কোথায়?'

'কি জানি বাপু, তা তো জানি না। তিনি নিজে যখন বলেছেন আলাপ করবেন, তখন আর আপত্তি কি? ছোটমামার সঙ্গে যে তোমার খুব ভাব হয়েছিল এক সময়, তাও তিনি জানেন। বড় সুন্দর কথাবার্তা বলেন। বড় সুখের জীবন তাঁর। স্বাধীন ভারতবর্ষে তো সুখ আরও বাড়বে এঁদের। শুনলুম গুপ্ত সাহেব এরই মধ্যে গান্ধী-টুপি তৈরি ক'রে রেখেছেন দু ডজন। এখন মাথায় পরতেই যা সময় লাগবে! কাল এসো, তোমার মামীমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব। চলি ভাই।'

অমিতাভ সেই যে চ'লে গেল, অনেক দিন পর্যন্ত আর আসে নি। যখন এল তখন ভারতবর্ষ সবেমাত্র স্বাধীন হ'ল। অমিতাভর কথায় পরে আমি ফিরে আসব।

কলেজের প্রতিষ্ঠা-দিবসে আমি যে যাই নি, সুনন্দা দেবী তা মনে রেখেছিলেন। তিনি প্রধান অতিথি হয়ে না এলে হয়তো যেতুম। কিন্তু আমার সেদিনের অনুপস্থিতিতে সুনন্দা দেবী সম্ভবত অপমানিত বোধ করেছিলেন। পরের দিন সুজাতাদির কাছে শুনেছিলুম যে, তিনি নাকি আমাকে অনেক বার খোঁজ করেছিলেন।

আজ কলেজে গিয়ে পৌঁছতেই প্রিন্সিপ্যাল আমায় ডেকে পাঠালেন। স্টাফ-রুমের আবহাওয়াতেও দেখলুম খানিকটা চাপা-হাসির হিল্লোল। এতদিন একসঙ্গে কাজ করলুম, অথচ কারও কাছ থেকেই কিছুমাত্র করুণা পাওয়ার মত পুণ্য অর্জন করতে পারলুম না। কেউ একটা কথাও বললেন না আমার সঙ্গে। কোথাও কিছু একটা বড় রকমের অঘটন ঘটেছে ব'লে মনে হ'ল আমার।

ঘরে ঢুকতেই প্রিন্সিপ্যাল খানিকটা অফিসিয়াল হয়ে উঠলেন। তিনি বললেন, 'মেয়েরা কম্প্লেন করছিল যে, ওদের কোর্স নাকি শেষ

হয় নি। কলেজ ছুটি হওয়ার আগে শেষ হওয়ার সম্ভাবনাও নেই। তা ছাড়া—তা ছাড়া তোমার মুখ থেকে ওরা নাকি মদের গন্ধ পায়।'

'দিনের বেলা আমি মদ খাই নে। কলেজ বন্ধ হওয়ার আগে কোর্স শেষ হয়ে যাবে। বোধ হয় আমার কোর্সই শেষ হবে সবার আগে। আপনি নিশ্চয়ই ফোর্থ ইয়ারের মেয়েদের কথা বলছেন?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ।'—একটু হেসে সুজাতাদি এবার বললেন, 'আমি কিছুই বলছি না—বলছেন আমাদের চেয়ারম্যান মিস্টার গুপ্ত। দরজাটা আটকে দিয়ে এস।'

'যা বলবার আপনি বলুন। আমার কোন কিছুই আর গোপন নেই। আমার ওপর আপনার খুব বেশী অনুগ্রহ আছে ব'লেই এমন কাণ্ড সম্ভব হয়েছে। মিসেস রায়—'

'একটু দাঁড়াও।'—তিনি নিজেই দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে এসে বললেন, 'তুমি আজ বড্ড বেশী উত্তেজিত, জয়া। একটু ঠাণ্ডা হয়ে নাও। পরে কথা হবে। জগদীশবাবু যে আজ বিলেতে রওনা হয়ে যাচ্ছেন জান?'

'জানি। তিনি কাল আমার সঙ্গে দেখা ক'রে গেছেন। নিশীথ বোধ হয় দমদম গেছে তাঁকে পোঁছে দিয়ে আসতে।'

'নিশীথ? আবার নিশীথ কেন, জয়া? সে যাক। প্রায় এক বছর আগে জগদীশবাবুর ব্যবসা সব ফেল প'ড়ে গিয়েছিল জান?'

'না।'

'শেয়ারের বাজারে তাঁর সব গেছে। যুদ্ধের শেষের দিকটাতে তিনি নিজে আর ব্যবসা দেখতেন না।...আমার স্বামীর হাতে সব ছেড়ে দিয়ে তিনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারতেন, কিন্তু উল্টে জগদীশবাবু তাঁর পুরনো অফিসারটিকে কাজ থেকে বরখাস্ত করলেন। কেন বরখাস্ত করলেন জান?'

'না, জানবার তেমন সুযোগ ছিল না আমার। জগদীশবাবু আমায়

স্নেহ করতেন খুবই, কিন্তু তাঁর ব্যবসা সম্পর্কে আমি কিছুই জানতুম না।'

'আমি সব খবরই রাখতুম। যাঁর নুন খাব তাঁর গুণ গাইব না কেন? জগদীশবাবু তোমাকে বীরেশের বউ করতে চেয়েছিলেন। ঠিক কি না বল?'

'ঠিক। কিন্তু আপনার স্বামীর চাকরি গেল কেন?'

'জগদীশবাবুর উপকার করতে গিয়ে। শেয়ারের বাজারে তোমার নামে অনেক টাকা লগ্নী করা ছিল। সেই শেয়ারের কাগজগুলো শেষ পর্যন্ত ওজনদরে বিক্রি করবার মত অবস্থা হয়। কিন্তু জগদীশবাবু সেই সব শেয়ারই বিশগুণ দাম দিয়ে নিজের নামে কিনতে লাগলেন। আমার স্বামী তাতে একদিন আপত্তি জানিয়েছিলেন।'

'আমি সে সব বিশগুণ দাম এখনও পাই নি। আপনার খবর হয়তো সত্যি নয়।'

'সত্যি নয়? আমি কখনও মিথ্যে বলি না, জয়া। আর আমার স্বামী তো দেবতুল্য মানুষ। নইলে গুপ্ত সাহেব তাঁকে ঝট ক'রে চাকরি দিতেন না। যাক, তর্ক ক'রে লাভ নেই। শেয়ারের লোকসান সব মেটাতে গিয়ে জগদীশবাবু কতগুলো বাড়ি বিক্রি ক'রে ফেলেছেন। বাকি যে-কখানা ছিল তাও বেচে দিয়েছেন। বেচে টাকাগুলো সব নিয়ে গেছেন বিলেতে।' একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে তিনি পুনরায় বলতে লাগলেন, 'অনেক টাকা। আর কয়েকটা দিন পরে হ'লে ভারতবর্ষের এত সোনা নিয়ে তিনি পালাতে পারতেন না। পণ্ডিত নেহরু আটকে দিতেন। তুমি তো খবরের কাগজ পড় না?'

'আজ্ঞে না।'

'পণ্ডিত নেহরু ভারতবর্ষের প্রধান মন্ত্রীর আসন অলঙ্কৃত করেছেন। ...মদের গন্ধ পেলুম যেন?'—এই ব'লে সুজাতাদি নাক দিয়ে ঘন ঘন নিশ্বাস টানতে লাগলেন।

আমি বললুম, 'দিনের বেলা আমি মদ খাই না।'

'রাত্রি বেলাই বা খাও কেন ?'

'আমার শরীরের যা অবস্থা তাতে একটু যদি না খাই, তবে কাজ করব কি ক'রে ?'

'না বাপু, শিক্ষার মূল নীতি হচ্ছে মদ না খাওয়া। তুমি দেখছি ঠিক এর উল্টো। জান, রমা এবার এম. এ. পরীক্ষা দিয়েছে ?'

'না। বিয়ের পরে রমা পড়ছিল বুঝি ? কই, আমাদের কলেজে তো দেখি নি ?'

সুজাতাদি তাঁর হ্যাণ্ড-ব্যাগ থেকে একটা সেণ্টের শিশি বার করলেন। ছিপিটা খুলে নিজের গায়ে লাগালেন একটু। তারপর আমার দিকে এগিয়ে ধ'রে বললেন, 'তুমি একটু বেশী ক'রে লাগিয়ে নাও।'

'কিছু দরকার হবে না।'

'ও, বেশ বেশ। রমাকে অন্য কলেজে পড়তে পাঠিয়েছিল ওর স্বামী। বি. এ. পরীক্ষায় সেকেণ্ড ক্লাস ফার্স্ট হয়েছিল। এখন এম. এ.তে কি করেছে একমাত্র ভগবানই জানেন। রমার সাবজেক্ট হ'ল ফিলজফি।'

'তাই নাকি ? আমার মতই তা হ'লে। সুজাতাদি, টিফিনের সময় তো প্রায় শেষ হয়ে এল। এর পরে আমার ক্লাস আছে। ডেকেছিলেন কেন ?'

সেণ্টের শিশি থেকে দু-তিন ফোঁটা সেণ্ট তিনি ঢেলে ফেললেন টেবিলের ওপর। তারপর শিশিটা হ্যাণ্ড-ব্যাগের মধ্যে পুনরায় রেখে দিয়ে বললেন তিনি, 'গতকাল আমাদের গভর্নিং বডির একটা জরুরী মীটিং হয়ে গেছে। তোমার ব্যাপার নিয়েই মীটিংটা হয়েছিল। মীটিংয়ে প্রস্তাব পাস হয়েছে—।' সুজাতাদি থেমে গেলেন। সুজাতাদি মদ খান না। মাছ মাংস ডিম দুধ খান। অথচ এরই মধ্যে তাঁর যেন দম ফুরিয়ে গেল। আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম।

সুজাতাদি বললেন, 'তোমাকে প্রথমে পনেরো দিনের সময় দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু আমাদের চেয়ারম্যানের কথায় এক মাসের সময় দেওয়া হ'ল। এই সময়ের মধ্যে তোমাকে, ভাই, দুটি কাজ করতে হবে। প্রথম, নিশীথকে কাজ থেকে বরখাস্ত ক'রে লেক প্লেসের এলাকা থেকে দূর ক'রে দিতে হবে। দ্বিতীয়, মদ খাওয়া ছেড়ে দিতে হবে। চেয়ারম্যান বললেন, এখানে যাঁরা শিক্ষার কাজ নিয়ে এসেছেন তাঁদের চরিত্রে দুর্নীতির সিকি ইঞ্চি আঁচড় থাকলেও চলবে না। তিনি আরও বললেন যে, রিপোর্ট প'ড়ে মনে হচ্ছে, মিস জয়া বসুর চরিত্রে কেবল আঁচড় লাগে নি, দাগ পড়েছে এবং তা সিকি ইঞ্চি নয়, সতেরো গজ। এখন যা করবার তুমি কর ভাই। হাতে সময় খুব বেশী নেই, মাত্র এক মাস।'

আমি চ'লে আসছিলাম। চেয়ারে ব'সেই প্রিন্সিপ্যাল আবার আমায় ডাকলেন, 'শোন। আর একটা কথা। আমার নিজের, ভাই, এ সম্বন্ধে কোন কিছুই করবার নেই। চেয়ারম্যানকে আমি নিজেও খুব ভয় পাই। ওঁরা এখন দলে ভারী। দেশ স্বাধীন হ'ল। সুনন্দা দেবীর একমাত্র সন্তান অমিত—হ্যাঁ, অমিত মিত্র মন্ত্রী হয়েছে।...আবার গন্ধ পেলুম যেন?'—এই ব'লে সুজাতাদি তাঁর চেয়ার থেকে উঠে পড়লেন।

সামনের দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ল একদল মেয়ে। তাদের মধ্যে ফোর্থ ইয়ারের মেয়েরাও আছে দেখলুম। সুজাতাদির মুখে ভয়ের চিহ্ন।

তিনি নরম সুরে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমাদের এখানে কি দরকার? একসঙ্গে সবাই কথা বললে কিছুই বুঝতে পারব না। তোমাদের মধ্যে লীডার কে? তার মুখ থেকেই তোমাদের বক্তব্য শুনতে চাই।'

দেখলুম, ফোর্থ ইয়ারের একটি মেয়ে—ইরা ব্যানার্জি এগিয়ে এসে বলল, 'আমিই লীডার। আমরা শুনতে পেলুম—'

বাধা দিয়ে প্রিন্সিপ্যাল জিজ্ঞাসা করলেন, 'শুনতে পেলে মানে কি? কার কাছ থেকে শুনতে পেলে আগে তার নাম জানতে চাই।'

ইরা জবাব দিতে দেরি করল না, বলল, 'ইংরিজীর দীপ্তিদির কাছে শুনলুম। তিনি বললেন যে, জয়াদিকে কলেজ থেকে ছাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। তা যদি সত্যি হয়, আমরা তা হ'লে ধর্মঘট করব। আমাদের দাবি : জয়াদিকে কলেজে রাখতে হবে। কারণ, তাঁর মত এত যত্ন নিয়ে এত ভাল ক'রে এখানে কেউ আর পড়াতে পারেন না।'

'ওঃ!'—সুজাতাদির গলায় যেন আর্তনাদের সুর : 'তোমাদের দাবি কাগজে লিখে নিয়ে এস। অফিসিয়াল না হ'লে দাবির কোন মূল্য নেই।'

ইরা বলল, 'লিখে নিয়ে আসছি। আমরা আরও শুনতে পেয়েছি যে, এম. এ. পরীক্ষার ফল বেরুবার আগেই আপনি আপনার মেয়ে রমা দেবীকে কলেজে চাকরি দেওয়ার প্রস্তাব পাস করিয়ে নিয়েছেন। তা যদি হয় আমরা ধর্মঘট করব। জয়াদির বদলে রমাদিকে নেওয়া চলতেই পারে না। আমরা খবরের কাগজে লিখব।'

'না না, অতদূর যাচ্ছ কেন আগেই? গভর্নিং-বডির সদস্যদের কাছে তোমাদের দাবি সব পেশ করব পরের মীটিংয়ে। যাও, ক্লাসে যাও সব। ছি-ছি, লেখাপড়া শিখছ, অথচ ডিসিপ্লিন শেখ নি!'

মেয়েদের সঙ্গে সঙ্গে আমিও বেরিয়ে এলুম প্রিন্সিপ্যালের ঘর থেকে।

ক্লাস নিয়ে বাড়ি ফিরলুম প্রায় চারটের সময়। সারাটা রাস্তা কেবল নিজের কথাই ভাবলুম। চাকরি ছেড়ে দেওয়া আমার পক্ষে খুব বেশী একটা আর্থিক ক্ষতি নয়, কিন্তু সম্ভ্রম হারানোর ক্ষতি দেখলুম অনেক। চাকরি বাঁচিয়ে রাখবার একটা পথ বার করতে না পারলে জীবনের সবগুলো সীমান্তে আমার পরাজয় প্রমাণিত হবে।

কলেজের কাপড়চোপড় প'রেই এসে শুয়ে পড়লুম। আর যেন এক মুহূর্তও দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিলুম না। দু পা হাঁটবার জন্যেও যেন একটা লাঠির ওপর নির্ভর করতে চাই।

নিশীথ ঘরের বাইরে থেকে জিজ্ঞাসা করল, 'আসব দিদিমণি?'

'আয়।'

একটা স্যুটকেস নিয়ে নিশীথ ভেতরে এল। আমার হাতে একটা চিঠি দিয়ে সে বলল, 'এই চিঠিটা আর স্যুটকেসটা জগদীশবাবু যাওয়ার আগে দিয়ে গেছেন। তোমার কাছে পৌঁছে দিতে বলেছেন।'

চিঠিটা হাতে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, 'ওই স্যুটকেসটাতে কি আছে?'

'তা তো জানি না। তিনি কেবল সাবধানে স্যুটকেসটা নিয়ে যেতে বললেন।'

'আচ্ছা, তুই এবার যা।'

আমার বিছানার পাশে স্যুটকেসটা রেখে নিশীথ চ'লে গেল। জগদীশবাবু লিখেছেন: মা জয়া, তোমার শেয়ার বিক্রির কিছু টাকা আমার কাছে ছিল। ভারতবর্ষের কোন ব্যাঙ্কেই আমার আর অ্যাকাউন্ট নেই। তাই ক্যাশই পাঠিয়ে দিলুম। ইতি—

স্যুটকেসের ডালাটা খুলেই চমকে গেলুম আমি। কিছু টাকা নয়, ওতে অনেক টাকা রয়েছে। স্যুটকেসটা ফেলে রাখলুম মেঝের ওপরে, ড্রেসিং-টেবিলটার কাছে। কার্শিয়ং যাওয়ার আগে বোধ হয় একদিনই কেবল আমি ওটাকে ছুঁয়ে দেখেছিলুম।

নিশীথের পায়ের শব্দ শুনতে পেলুম ঘরের বাইরে। সে ওখান থেকেই বলল, 'রত্না দিদিমণি গাড়িতে ব'সে আছেন।'

'ওপরে ডেকে নিয়ে আয় না।'

'সময় নেই তাঁর। তোমায় এক্ষুনি একবার যেতে বললেন। কোথায় যেন যেতে হবে।'

'পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করতে বল্।'

'আচ্ছা।'

পাঁচ মিনিট নয়, দশ মিনিটই লাগল নীচে নামতে। নীচে নামবার মত শক্তি আমার ছিল না। হুইস্কির বোতল খুলতে হ'ল আবার।

গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, 'ব্যাপার কি রে? বছরের

মধ্যে একবার ক'রে দেখা দিবি, তাতে আবার ওপরে উঠতে চাইবি না। আমার বাড়িটা কি তোর দর্শনের যোগ্য নয়?'

'তা নয়, জয়াদি। বড্ড কাজ প'ড়ে গেছে। জান তো, পূর্ববঙ্গ থেকে সব রিফিউজীরা আসছে?'

'শুনেছি আসছে, আমি দেখি নি।'

'আমায় তো দিনরাত দেখতে হচ্ছে। প্রতি সপ্তাহে একটা ক'রে 'চ্যারিটি শো' করছি। নাচতে নাচতে হাত-পা সব ভেঙে গেল। টাকা তুলতে হচ্ছে। ওদের দুর্দশা দেখলে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা তুমি চাইতে না। উঠে এস। অনেক কাজ আছে।'

তোর আদেশ উপেক্ষা করা অসম্ভব। গাড়িতে উঠে বসলুম। গাড়ি চলতে লাগল। একটু পরে আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'আমায় কোথায় নিয়ে যাচ্ছিস রে?'

'জগদীশবাবুর কাছে। তাঁর অনেক টাকা। আসছে সপ্তাহের 'চ্যারিটি শো'র জন্যে তাঁর কাছ থেকে মোটা টাকা পাইয়ে দিতে হবে, জয়াদি। তিনি ধনীলোক। এমন কাজে যদি তিনি টাকা না দেন, তা হ'লে তাঁর টাকা থেকে লাভ কি?'

'তুই তো তাঁকে চিনিস।'

'চিনি—খুব সামান্য। আমার কথা তাঁর হয়তো মনে নেই। বীরেশের অসুখের সময় উনি বাইরের ঘরে ব'সে থাকতেন, তারপর যে কি হ'ল আমি আর মনে করতে পারছি নে। মা গো!'—দু হাত দিয়ে মুখ ঢাকলি তুই।

আমি এবার বললুম, 'জগদীশবাবু কলকাতায় নেই। আজকেই তিনি লণ্ডনে রওনা হয়ে গেছেন। টু লেট।'

'তা হ'লে?'—বীরেশবাবুর ঘর থেকে তুই বোধ হয় ফিরে এসে বললি, 'তা হ'লে চল, টালিগঞ্জের কলোনিটা একবার ঘুরে আসি। নিজে চোখে দেখবে চল। জয়াদি—'

'কি রে ?'

'একটা পনেরো-ষোল বছরের ব্রাহ্মণের মেয়ে এসে পড়েছে আমাদের কলোনিতে। দেখতে ভা-রি সুন্দর। কেউ নেই ওর। বাপ-মা আর এক ভাই মারা গেছে দাঙ্গায়। মেয়েটির নাম সাবিত্রী। ওকে বাঁচাবার জন্যেই সবাই মরেছে। বরিশালের এক পাড়াগাঁয়ের মেয়ে। কেউ নেই ওর, জয়াদি। দিনরাত কেবল কাঁদে। কাল থেকে জ্বর। জয়াদি—'

'কি রে ?'

'না, কিছু না। চল। 'চ্যারিটি শো'র জন্যে কিছু টাকা তুলে দাও। ভবতোষের অফিসের কাউকে আর বাকি রাখি নি। বড় সাহেবগুলোকে ভয় দেখিয়ে টাকা বার করেছি। লণ্ডনের সেই বুড়ো ডাইরেক্টার যে আমায় কি রকম ভালবাসে তার দু-একটা নমুনা তাদের কায়দা ক'রে শুনিয়ে দিয়েছি।'

'কিন্তু আমি তো কাউকে চিনি না। আমি নিজে একশো টাকার টিকিট কিনলুম। ফেরার পথে টাকাটা তোকে দিয়ে দেব।'

'এস, তোমায় একটু আদর করি। তুমি কী ভাল মেয়ে, জয়াদি! কিন্তু সাবিত্রীকে নিয়ে বড্ড মুশকিলে পড়েছি।'

'কি মুশকিল ?'

'এর মধ্যেই অনেক রকমের দালাল জুটে গেছে। ব্যাপার শুনে আমার মনে হচ্ছিল যে, কলকাতার পঞ্চাশ ভাগ লোকই বোধ হয় দালাল। আমাদের কর্মীদের সতর্ক নজর না থাকলে এর মধ্যেই হয়তো ওকে ছোঁ মেরে কেউ নিয়ে যেত। জয়াদি—'

'কি রে, যা বলবি বল্ না!'

'তুমি ওকে এনে রাখ না, জয়াদি।'

'আমি ওকে এনে রাখতে পারি, কিন্তু ওর ভবিষ্যৎ তৈরি করব কি ক'রে ?'

'নিশীথের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে।'

তোর কথা শুনে আমি গম্ভীরভাবে ব'সে রইলুম অনেকক্ষণ পর্যন্ত। ভাবতে লাগলুম। নিশীথ যদি বিয়ে করে তা হ'লে আমার সামাজিক সম্মান ফিরে আসতে পারে। কলেজের গভর্নিং-বডির সদস্যদের মনের ভুল ধারণা তাতে ভাঙবে নিশ্চয়ই। কিন্তু বিবাহিত-নিশীথের সান্নিধ্য সহ্য করা আমার পক্ষে হয়তো সম্ভব হয়ে উঠবে না। সহসা যেন মনের মধ্যে ঈর্ষার তাপ অনুভব করলুম। এ ঈর্ষা কেন? ভেবে তার মূল খুঁজে পেলুম না। টালিগঞ্জের কলোনিতে এসে পৌঁছবার আগে আমি বললুম, 'তোর প্রস্তাব আমি ভেবে দেখব।'

'তোমার কথা শুনে আশা হচ্ছে একটু।'

কলোনির দৃশ্য দেখলুম আমি। বোধ হয় আদিম মানুষেরা এমনি ক'রেই প্রথমে বাসস্থান তৈরি করেছিল। ক্রমে ক্রমে বাসস্থানই আশ্রয় হ'ল। আশ্রয়ের স্থায়িত্ব থেকে এল সংসার। তারপর সমাজ। রিফিউজীরাও যেন সেই আদিম মানুষ। খোলা মাঠে বাঁশের খুঁটি নিয়ে ছেলেরা সব দৌড়াদৌড়ি করছে। বাস্তু নির্মাণের কলাকৌশল এখনও এরা শেখে নি। ক্রমে ক্রমে শিখবে। সংসারও গড়বে—নতুন সমাজের বাঁশগুলো চিনে নিতে আমার ভুল হ'ল না।

আমার মতামতের অপেক্ষা না রেখে ইতিমধ্যে তুই সাবিত্রীর বিয়ের খবরটা প্রচার ক'রে দিয়ে এলি কলোনির শেষ সীমানা পর্যন্ত। সাবিত্রীকে দেখলুম আমি। সুন্দরী বটে, কিন্তু মুখের রঙ অত্যন্ত ফ্যাকাশে। শিক্ষার ছাপ বলতে যা বোঝায় তা ওর মুখে নেই। মাটির মেঝের ওপর অপরিষ্কার একটা শতরঞ্জির ওপর শুয়ে ছিল সাবিত্রী। ঘরের তিন দিকটাতে কঞ্চির বেড়া রয়েছে, সামনের দিকটা খোলা।

তুই বললি, 'তুমি সাবিত্রীর সঙ্গে কথা কও, আমি আমাদের কর্মীদের সঙ্গে দু-একটা কাজের কথা সেরে নিই।'

সাবিত্রীকে জিজ্ঞাসা করলুম, 'পুরো নাম কি তোমার?'

'সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়। দাঙ্গার সময় দুর্বৃত্তেরা আমায় ছুঁতে পারে নি।' ভয়ে সাবিত্রীর শুকনো মুখ আরও বেশী শুকিয়ে গেল। বললুম, 'ছুঁয়ে যদি দিতও, তবুও তোমার তাতে বিয়ে আটকাত না। তোমার ভয় নেই, সাবিত্রী। আমি আবার আসব।'

আমি বাইরে এসে দাঁড়াতেই একজন মহিলা এসে দাঁড়ালেন আমার কাছে। ঘোমটা দিয়ে চোখের তলা পর্যন্ত ঢাকা। তিনি বললেন, 'শুনুন।' তাঁর দিকে একটু স'রে দাঁড়ালাম। ফিসফিস ক'রে ঘোমটার তলা থেকেই তিনি বললেন, 'সাবিত্রীর বিবাহের প্রস্তাব শুনলাম। সাবিত্রীর কিন্তু রোজ সন্ধ্যাবেলা জ্বর আসে। খুসখুস ক'রে কাশেও।' এই ব'লে তিনি ঘোমটাটা আরও খানিকটা টেনে দিয়ে দ্রুতপদে সেখান থেকে চ'লে গেলেন। মনে মনে ভাবলুম, আদিম মানুষদের বলিষ্ঠতা কি এরা পায় নি?

তুই এলি। এসে বললি, 'চল, জয়াদি। কাজ হয়ে গেছে। সাবিত্রীকে কেমন লাগল?'

'খুব ভাল। বিয়ের সব ব্যবস্থা কর্। কালকে ওর জন্যে একটা বিছানারও ব্যবস্থা করিস।'

'পায়ের ধুলো দাও, জয়াদি। আজকেই আমি নতুন বিছানা কিনে পাঠিয়ে দেব।' রাস্তার দিকে চলতে চলতে তুই আবার বললি, 'জান জয়াদি, সাবিত্রীর পাশে শুয়ে দুটো রাত আমি এখানে কাটিয়ে গেছি? ভবতোষ জানে না।'

বললুম, 'সত্যিকারের শিল্পীর কাছে কোন রাতই কালো নয়, কোন শয্যাই কলঙ্কের নয়।'

বিয়ে ঠিক হতে দিন পনেরো লাগল। তুই কন্যাপক্ষ, আর বরপক্ষ হ'ল অমিতাভ। চন্দননগর থেকে চিঠি লিখে ওকে আনিয়ে নিয়েছি। ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে সাবিত্রীর জন্যে জিনিসপত্র কেনাকাটা করছে

অমিতাভই। আমি কেবল একদিন সাবিত্রীকে নিয়ে ধর্মতলা গিয়েছিলাম। ডাক্তার চ্যাটার্জিকে দিয়ে ওর বুকের একটা এক্স-রে প্লেট তুলিয়ে নিয়েছি। আমি ছাড়া অন্য কেউ আর এ খবর রাখত না। তোকে আমি বলি নি। সাবিত্রীর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে তোর একদিনের জন্যেও সন্দেহ জাগে নি। কেবল বিয়ের দিন নাকি সন্ধ্যের দিকে চুল বাঁধতে ব'সে তুই টের পেয়েছিলি যে, ওর গায়ে জ্বর, বুকে সর্দি।

বিয়ের দু দিন আগে নিশীথকে বললুম, 'সাত দিনের জন্যে ছুটি দিয়ে দিলুম তোকে। মনে কর্, ছুটি নিয়ে তুই দেশে যাচ্ছিস বিয়ে করতে। যেহেতু তোর দেশ ব'লে কিছু নেই, তোর দেশ আপাতত এইটেই হ'ল। ওপাশের ওই ঘরটা তো রইলই। তা ছাড়া, এখানে আমি আর ক'ঘণ্টাই বা থাকি, গোটা ফ্ল্যাটটাই তোরা ব্যবহার করিস।'

'এই ব্যবস্থাই ভাল হবে তো দিদিমণি?'

'হ্যাঁ।'

'তা হ'লে তাই করব।'

'চ'লে যাচ্ছিস কেন, শোন্। বিয়ের পরে তোর মনের ভাব কি রকম হবে জানি না। আসলে আমি তো তোর কেউ নই, কিন্তু সাবিত্রী হবে তোর স্ত্রী। সাবিত্রীকে ভালবাসাই হবে তোর সত্যিকারের কর্তব্য। যাচ্ছিস? আর একটা কথা শোন্। আমার দিকে যদি দৃষ্টি নাও দিতে পারিস, সাবিত্রীকে কিন্তু কষ্ট দিস নে, অবহেলা করিস নে। যে যা-ই বলুক না, আমি তো তোর আত্মীয় নই।'

'কিন্তু আমি যে তোমার চাকর, দিদিমণি।'

'তুই বামুন, অমন কথা মুখে আনিস নে, আমার পাপ হবে। আমি বোধ হয় এবার শয্যা নিলুম, কলেজ থেকে ছুটি নিয়েছি। এই নে, শ-দুই টাকা রেখেছি তোর জন্যে, তোর ইচ্ছেমত সাবিত্রীর জন্যে কিছু কিনিস।'

'অমিতাভবাবুকে দিয়ে তো অনেক জিনিস কেনালে। আর কেন, দিদিমণি?'

'ওসব তো আমার দেওয়া, তোর নিজের দেওয়া ব'লে কিছু একটা থাক্।'

'বেশ, তাই হবে। কিন্তু এত টাকা নিয়ে আমি এখন রাখব কোথায়? হয়তো হারিয়ে যাবে। তোমার কাছেই থাক্। পরে নেব।'

নিশীথ চ'লে যাওয়ার একটু বাদেই অমিতাভ এল। হাতে একটা ক্যামেরা রয়েছে দেখলুম। নিশীথের বিয়ের ব্যাপারে অমিতাভরই যেন আনন্দ হয়েছে সবচেয়ে বেশী। এত বেশী আনন্দিত হওয়ার অর্থ আমি সব সময়ে খুঁজে পাই না।

ঘরে এসে অমিতাভ বলল, 'আজকে সত্যিকারের লোকেশনে গিয়েছিলাম। মাই গুডনেস, তোমরা ওগুলোকে ঘর বল নাকি? রিফিউজীদের প্রত্যেকটা ঘরই আমি দেখে এসেছি, ছবিও তুলেছি।'

'তোমাদের ফরাসী দেশে এগুলোকে ঘর বলে না বটে, কিন্তু আমরা বলি। আমরা গরিব, অমিতাভ। তোমাদের মত আমাদের যদি উপনিবেশ থাকত, তা হ'লে আমরা ওদের জন্যে পাকা বাড়ি তৈরি ক'রে দিতুম। এসব কথা থাক্। সাবিত্রীকে দেখলে?'

'হ্যাঁ, ছবি নিয়েছি একটা।'

'এত ছবি-পাগলা হয়ে উঠলে কেন? দেশে ফিরে গিয়ে বুঝি দেখাবে যে, এই হ'ল স্বাধীন ভারতবর্ষের চেহারা?'

'দেশ তো আমার ভারতবর্ষ, নইলে এখানে এলুম কেন?'

'ও, তাই তো ভুলে গিয়েছিলাম! বোধ হয় জ্বরটা আমার আবার বেড়েছে। যাক, এখন বল, কাপড়চোপড় সব সাবিত্রীর পছন্দ হয়েছে তো? রত্না কি বলল? পরিচয় হ'ল তো?'

'হ'ল। তিনি বললেন, এখানে আর বেশী জিনিস নিয়ে এলে

দিনের বেলাতেই ডাকাতি হতে পারে। আশপাশের গরিব লোকদের লোভ বাড়াতে তিনি বারণ ক'রে দিলেন।'

'তা হ'লে ওখানে আর কিছু নিয়ে যেয়ো না। ঘটা ক'রে আমি তো মাত্র একটা মেয়ের বিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু অন্য সব লক্ষ লক্ষ রিফিউজী মেয়েদের বিয়ে দেবে কে? ওরা হয়তো পাশে দাঁড়িয়ে এসব দেখতে পেয়ে মনে মনে কষ্ট পাচ্ছে। তোমার কি মনে হয়, অমিতাভ? একেবারে এত বেশী গম্ভীর হয়ে গেলে কেন? নিশীথের বিয়েটা কি তোমার মনঃপূত হয় নি?'

অমিতাভর চোখটা একটু নেচে উঠল, বোধ হয় আনন্দেই। পাথরের চোখটাও যেন একটু চকচক ক'রে উঠল ব'লে মনে হ'ল আমার। অমিতাভ হেসে হেসে বলতে লাগল, 'মনঃপূত হয় নি কেন বলছ? খুব ভাল ব্যবস্থা করেছ। নিশীথকে নিয়েই তো কলকাতার সমাজে অনেক কথা উঠেছিল। বিয়ের পর তার অবসান ঘটবে। নিশীথ যে তোমার চাকর, শুধু চাকরই—সেটা অন্তত প্রমাণিত হ'ল।'

বিছানায় উঠে বসলুম আমি: 'অমিতাভ, নিশীথ আমার চাকর নয়, নিশীথ আমার ঠাকুর।'

'আই মীন ছাট—বাংলা কথাটা ব্যবহার করতে আমার ভুল হয়ে গেছে। তুমি রাগ করলে না কি?'

'না। তুমি যদি অপমান করবার মন নিয়ে বলতে রাগ করতুম। কিন্তু তুমি বলেছ ঈর্ষার মন নিয়ে।'

অমিতাভ উঠে পড়ল। অস্তিবাদীর মুখ থেকে প্রতিবাদের ভাষা পর্যন্ত আজ লোপ পেয়েছে। শূন্যতা ছাড়া জীবনের আর কোন সত্য নেই জেনেও অমিতাভ নিশীথকে ঈর্ষা করে।

বিয়ে ক'রে পরের দিন নিশীথ ফিরে এল। অমিতাভ নিজে গিয়েই ওদের নিয়ে এসেছে। সাবিত্রীকে দেখলুম আমি। লজ্জায় মুখ নীচু ক'রে ব'সে ছিল। নিশীথের মুখে লজ্জার কোন চিহ্ন দেখলুম না।

হাসি-হাসি মুখ। সরলতার সংমিশ্রণে মুখের চরিত্র অবিশ্বাস্যভাবে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। পৃথিবীর কোন রাজকুমারের মুখের সঙ্গে এ মুখের মিল পাওয়া অসম্ভব।

অসুস্থ শরীর নিয়ে আমি গিয়ে বসলুম সাবিত্রীর পাশে। নীচু স্বরে জিজ্ঞাসা করলুম, 'স্বামী পছন্দ হয়েছে তো ?'

সাবিত্রীর কাছ থেকে কোনও জবাব পাওয়া গেল না। পাওয়া যে যাবে না তা আমি জানতুম। জবাব আমি শুনতেও চাই নি, সাবিত্রীর আজও জ্বর এসেছে কি না পরীক্ষা করবার জন্যেই আমি ওর পাশে গিয়ে বসেছিলুম। গায়ে হাত দিয়ে দেখলুম, জ্বর আছে।

একটু বাদে অমিতাভ আমায় জিজ্ঞাসা করল, 'অমনি ক'রে সাবিত্রীর গায়ে হাত দিচ্ছিলে কেন ?'

'তুমি দেখেছ বুঝি ?'

'হ্যাঁ।'

'মনে হ'ল, ওর গা-টা গরম।'

'কেন, ওর জ্বর এসেছে না কি ? বোধ হয় উত্তেজনার জন্যে দেহের উত্তাপ একটু বেড়েছে।'

বললুম, 'আমার তো তাই মনে হয়। কিংবা আমার নিজের গায়েই বোধ হয় জ্বর আছে।'

অমিতাভর মুখ দেখে মনে হ'ল, আমার কথা ওর বিশ্বাস হয় নি। একটা চোখ দিয়েই অমিতাভ যা দেখতে পায় আমি দুটো চোখ দিয়েও তা দেখতে পাই না। আমি কেন, আমার বিশ্বাস, পৃথিবীর বহু লোকই ওর মত ক'রে দেখতে পায় না। অমিতাভর প্রতিভার প্রতি পরম শ্রদ্ধায় মাথা নত করলুম।

বউ-ভাতের আয়োজন বেশ ভালভাবেই করা হ'ল। অমিতাভকে সঙ্গে নিয়ে ট্যাক্সি চেপে আমিই গিয়েছিলাম সবাইকে নেমন্তন্ন করতে। তোর কাছে গেলুম আগে। ভবতোষ এই সময়ে বাড়ি থাকবে না

জেনেই তোর ওখানে গিয়ে পৌঁছলুম বেলা এগারোটায়। আমি বললুম, 'এবার তো তোকে আসতেই হবে ভাই। ওপরে উঠতে হবে।'

'উঠব। ওপরে ওঠা তো আমার বারণ নেই।'

সেখান থেকে গেলুম কলেজে। সুজাতাদিকে বললুম, 'আসতেই হবে কিন্তু।'

'যাব, নিশ্চয়ই যাব।'

'রমাকে সঙ্গে নিয়ে আসবেন। ঠিকানা দিলে আমি নিজেই যেতে পারি।'

'কিচ্ছু দরকার নেই। অসুস্থ শরীর নিয়ে তোমার এত ছোটাছুটি করা উচিত নয়। আর কাকে বলবে? আমাদের গভর্নিং-বডির সদস্যদের বলবে না কি? চেয়ারম্যানকে বললে ভাল হয়।'

'কি ভাল হয়, সুজাতাদি?'

'খবরের কাগজে দশ-বিশ লাইন সংবাদ বেরুত। তিনি ফোন ক'রে দিলেই সবাই সব খবর ছাপে। চললে?'

'হ্যাঁ। দীপ্তিদি, বেলাদি—তাঁদেরও বলতে হবে।'

সুজাতাদি আমার সঙ্গে সঙ্গে দরজা পর্যন্ত এলেন। বোধ হয় আরও কিছু বলতে চান তিনি। তাঁর কোন কথাই আজকাল আর আমায় ব্যথা দিতে পারে না। তিনি বুঝতে পারেন নি যে, আমি পাথরের মত শক্ত হয়ে গেছি। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি যাচ্ছ, জয়া?'

'হ্যাঁ।'

'জান, রমার পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে?'

'না।'

'সে ফার্স্ট ক্লাস সেকেণ্ড হয়েছে।'

'খুব খুশী হলুম শুনে। তাকেও সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসবেন। অনেক দিন দেখি না ওকে।'

সবাইকে নেমন্তন্ন ক'রে যখন ফিরে যাচ্ছিলুম, তখন মনে পড়ল কালিপদর কথা। কালিপদ আমাদের স্টাফ-রুমের বেয়ারা। তাকেও নেমন্তন্ন করতে হবে। এ-যাবৎকাল ওর দিকে ভাল ক'রে নজর দিতে পারি নি। গোড়ার দিকে কালিপদই ছিল আমার সবচেয়ে প্রিয়। বয়স বোধ হয় চল্লিশের ওপর। আজও বিয়ে করে নি।

কলেজ প্রতিষ্ঠার সময় কালিপদ খুব অল্প মাইনেতে কলেজে ঢোকে। বয়স তখন ওর ছিল কুড়ি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে পর্যন্ত কলেজের আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। অতএব, কলেজের সঙ্গে সঙ্গে কালিপদকেও সংগ্রাম করতে হয়েছে এই দীর্ঘ সময়। দু-মুঠো ভাতের জন্যে ওকে যে কী ভীষণ কষ্ট পেতে হয়েছে তার টুকরো বিবরণ কালিপদর কাছ থেকেই শুনেছি।

আজ কালিপদর মাইনে বেড়েছে। ভাতের সমস্যা আর নেই। দু-দশ টাকা উদ্বৃত্তও থাকতে পারে। কিন্তু বয়সের ক্ষয় সে বন্ধ করতে পারে নি। এখন অল্প আয়ুর সংস্থান নিয়ে নতুন সংসার পাতবার পরিকল্পনা ওর মন থেকে বিদায় নিয়েছে চিরদিনের জন্যে।

অভাবের দিনেও কালিপদকে দেখেছি। মেয়ে-কলেজের এই চার-দেয়ালের মধ্যে কালিপদর তাজা বয়সগুলোকে ক্ষ'য়ে যেতেও দেখলুম। কিন্তু ওকে এক মুহূর্তের জন্যে বিমর্ষ হতে দেখি নি।

কালিপদর কাজের ক্ষেত্র কেবল কলেজের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না। দীপ্তিদি কলেজে এসেই কালিপদকে ডাকতেন, 'কালিপদ! খাবার জল দে।'

জল খাওয়ার পরে তিনি বলতেন, 'এই চিঠিগুলো পোস্ট-অফিসে গিয়ে ফেলে দিয়ে আয়। রাস্তার ডাকবাক্সে ফেলিস নে।'

একটু বাদেই বেলাদি এলেন : 'কালিপদ—'

'আজ্ঞে।'

'আজ, বাবা, তোর একটু খাটতে হবে বেশী।'

'খাটব।'

'তোকে একবার ধর্মতলায় যেতে হবে।'

'যাব।'

'খোকার জন্যে একটা ওষুধ আনতে হবে। ও. এন. মুখার্জির ওষুধের দোকান থেকে আনা চাই। রাস্তার আজেবাজে দোকান থেকে আনিস নে কিন্তু। আমি ক্যাশ-মেমো দেখব।'

বেলা তিনটের সময় এলেন মিসেস পিকো দাশগুপ্ত। তিনি অর্থ-বিজ্ঞান পড়ান। সবেমাত্র বিয়ে হয়েছে। তিনি এসে হুকুম দিলেন, 'কালিপদ, তোকে একবার তিলজলা রোডে যেতে হবে।'

'যাব।'

'এক্ষুনি যেতে হবে। ধোপাটা বড্ড বজ্জাতি করছে। কাপড় নিয়ে গেছে দু-সপ্তাহ আগে। তাকে আজকেই একবার আসতে বলবি। ময়লা জামাকাপড় প'রে ওঁকে অফিসে বেরুতে হচ্ছে।'

কালিপদ ক্ষীণস্বরে বলবার চেষ্টা করল, 'আমায় যে ধর্মতলা যেতে হবে।'

'তিলজলা হয়ে ধর্মতলা যাবি।'

এমন সময় বেলাদি এসে বললেন, 'কোথায় তিলজলা আর কোথায় ধর্মতলা! ও. এন. মুখার্জির দোকান থেকে খোকার জন্যে ওষুধ আনতে যেতে হবে।'

'ওঁর যে কাল অফিসে বেরুবার কাপড় নেই, বেলাদি।'

'কাপড়?'—ইতিহাসের বইখানা টেবিলের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বেলাদিই বললেন, 'কাপড়? কাপড়ের কথা কি বলছিস লো? নতুন স্বামীকে ইস্ত্রি-করা কাপড় পরাতে তোর তো ভাল লাগবেই। কিন্তু ওষুধের চেয়ে কাপড়টা কি বেশী দরকারী নাকি? কি জানি, ইকনমিক্স্ পড়লেই দেখছি, মানুষের সাধারণবুদ্ধি পর্যন্ত লোপ পায়।'

কোথা থেকে দীপ্তিদি উড়ে এসে ফস ক'রে মন্তব্য প্রকাশ ক'রে

বসলেন, 'ইকনমিক্‌স্‌ পড়লে মানবতাবোধ থাকে না। কি ক'রে যে মণি সেন মশাই তাঁর নোট বইতে লিখলেন, ইকনমিক্‌স্‌ শুধু বিজ্ঞান নয়, আর্টও! কালিপদ, সেন মশাইয়ের দোকান থেকে আমার জন্যে চার আনার টিফিন কিনে নিয়ে আয়। এক শো নব্বইটা মেয়ের সামনে লেকচার দিতে আধ সের চালের ভাত পর্যন্ত হজম হয়ে যায়।'

কালিপদ হাসিমুখে সবার হুকুমই পালন করবার চেষ্টা করে। কলেজের বাইরে ওর কাজ করবার কথা ছিল না। পাঁচ-দশ টাকা পুজোর সময় বকশিশ পাবে ব'লে বোধ হয় সে সারা বছর এমনি ক'রে খাটত। কিন্তু পুজোর সময় দীপ্তিদি এবং বেলাদি নিয়মিতভাবে বক্‌শিশ দিতে ভুলে যেতেন। পুজোর পরে কালিপদর সঙ্গে প্রথম দেখা হ'লেই ওঁরা বলতেন, 'এই দেখ্‌, পুজোর সময় তোর জন্যে পাঁচটা টাকা রেখেছিলাম, শেষ মুহূর্তে দিতে ভুল হয়ে গেল। এখন তো পুরী থেকে ফিরছি। শেষ আধলাটি পর্যন্ত খরচ হয়ে গেছে। আচ্ছা আচ্ছা, এবার পুজোর সময় আমায় একটু মনে করিয়ে দিস।'

কালিপদ এখন চল্লিশ পেরিয়ে গেছে, মনে করিয়ে দেবার মত প্রলোভন তার আর নেই।

আজ ওকেও নেমন্তন্ন ক'রে এলুম।

চারতলার ছাদে খাবার ব্যবস্থা করা হ'ল। টেবিল চেয়ার সব পাতা হয়ে গেছে। রান্নার ব্যবস্থাও হয়েছে ছাদের এক কোণায়। দুজন রান্নার ঠাকুর এসেছে। গতকাল তারা এসে জেনে গেছে কি কি জিনিস রান্না হবে। নিশীথ এসে মাঝখানে একবার বলতে চেষ্টা করেছিল, 'তুমি এ সব নিয়ে কেন মাথা ঘামাচ্ছ, দিদিমণি? আমিই সব ঠিক ক'রে দিচ্ছি।'

আমি বলেছিলুম, 'তোর তো এখন ছুটি। মনে কর্‌, তুই এখন এখানে উপস্থিত নেই।'

সন্ধ্যের একটু পরেই কলেজের ওঁরা সব এলেন। সুজাতাদিও এলেন। সঙ্গে রমা এসেছে। চারতলায় উঠে গিয়ে ওঁরা সব নিশীথকে দেখে এলেন। দেখিয়ে নিয়ে এল অমিতাভ। সাবিত্রীকেও দেখলেন ওঁরা। আমি বসবার ঘরেই বসেছিলুম।

একটু বাদেই সবাই এসে বসলেন। লক্ষ্য করলুম, চাপা হাসির আমোদ আর এঁরা কেউ উপভোগ করতে পারছেন না। নিশীথের সত্যি সত্যি বিয়ে হয়ে গেছে। কোথাও এতটুকু ফাঁকি নেই। সব চেয়ে গম্ভীর দেখলুম সুজাতাদিকেই।

বেলাদিকে আর দীপ্তিদিকে বললুম, 'ইনিই হচ্ছেন বিখ্যাত শিল্পী অমিতাভ সেন।'

দীপ্তিদি বললেন, 'পরিচয় হয়ে গেছে আগেই। সুজাতাদি পরিচয় করালেন তোমার একতলার ফটকের কাছে।'

একটু হেসে সুজাতাদি বললেন, 'দেশ তো স্বাধীন হ'ল। শিল্পীদের কি অবস্থা হবে তাই ভাবছি।'

বেলাদি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেন ?'

'স্বাধীন ভারতবর্ষে শিল্পকলা থাকবে না'—অমিতাভর দিকে চেয়ে তিনি কথাটা শেষ করলেন, 'থাকবে কেবল পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা। একটার পব আর একটা। তার পর আরও অনেক। হিসেব ক'রে দেখা গেছে, অমুক খ্রীষ্টাব্দের অমুক তারিখে ভারতবর্ষে একটিও বেকার নেই। কই, পিকো গেল কোথায় ? সে তো অর্থবিজ্ঞান পড়ায়। বেকার যদি না থাকে, তবে মানুষের সব সমস্যা মিটবে তো ? জয়া, আমাদের চেয়ারম্যানকে আজ ডাকলে না কেন ?'

'প্রতিশোধ নিতে আমি চাই নি, তাই।'

দীপ্তিদি বললেন, 'লোকে এবার কি নিয়ে যে কুৎসা রটাবে তাই ভাবছি। জয়া, দেখছি সব রাস্তা বন্ধ ক'রে দিলি।'

সুজাতাদি কোন কিছু বুঝবার আগে কথাটার অর্থ বুঝল অমিতাভ।

আমি দেখলুম, নিমেষের মধ্যে ওর মুখের ওপরে একটা বিষাদের ছায়া পড়ল। ক্রাচে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল অমিতাভ, বলল, 'আপনারা বসুন। ওদিকের কাজগুলো একবার দেখি।'

অমিতাভ চ'লে যাওয়ার পরে দীপ্তিদি আবার কথাটার পুনরুল্লেখ করলেন, 'অনেকের এবার অনেক অসুবিধে হবে।' সুজাতাদি বোধ হয় এবার ইঙ্গিতটা বুঝতে পারলেন। মিষ্টিভাবে হাসবার চেষ্টা ক'রে তিনি বললেন, 'যাদের মুখে ধার আছে তাদের কথা কখনও ফুরুবে না। এ ব্যাপারে বাঙালীদের হারাতে পারে তেমন মরদ-জাতি পৃথিবীর কোন্ অঞ্চলে জন্মেছে ?'

''এ ব্যাপারে'র মানে কি, সুজাতাদি ?'—প্রশ্ন করলেন মিসেস পিকো দাশগুপ্ত।

'তিলকে তাল করবার ব্যাপারে।'

এই সময় 'জয়াদি' 'জয়াদি' বলতে বলতে ঘরে ঢুকলি তুই। তুই, রত্না। সবাইকে নমস্কার করলি তুই। সুজাতাদি তোর হাত চেপে ধ'রে আদরের সুরে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হ্যাঁরে পাগলি, তোর স্বামী কই ? দু দিন তোর বাড়ি গিয়েছিলাম। একদিনও তোদের ধরতে পারি নি। এমন জায়গায় বাড়ি নিয়েছিস, ট্রাম-বাস থেকে হাঁটতে হয় অনেক। স্বামী আসেন নি ?'

'এসেছেন। ডাকছি তাঁকে।'—ব'লে তুই বেরিয়ে গেলি। আমি এবার একটু সতর্ক হলুম। সুজাতাদির মতলবটা বুঝতে আমার কোন অসুবিধে হ'ল না।

একটু পরেই ভবতোষকে নিয়ে তুই ঘরে ঢুকলি। পরিচয় করিয়ে দিলি সবার সঙ্গে। তুই বললি, 'জয়াদি, এই হচ্ছে ভবতোষ।'

সুজাতাদি প্রস্তুত হয়েই ছিলেন। তিনি বললেন, 'খুবই অবাক ক'রে দিলি, রত্না !'

'কেন ?'

'ভবতোষবাবুর সঙ্গে কি জয়ার আগে পরিচয় ছিল না? তবে যে আমার কলেজের ঠিকানায় জয়ার কাছে বিলেত থেকে চিঠি এল? জয়া বলেছিল যে, ভবতোষবাবুর চিঠি।' ভবতোষের দিকে চেয়ে তিনি কথা তাঁর শেষ করলেন, 'সেদিন আপনিই তো জয়ার ঠিকানা চেয়ে কলেজে টেলিফোন করেছিলেন? ফোন ধরেছিলুম আমিই।' হ্যাণ্ড-ব্যাগ থেকে রুমাল বার ক'রে সুজাতাদি মুখের ঘাম মুছলেন। তোর মুখে দেখলুম ঘাম নেই। বিস্ময়ের মেঘে ক্রমে ক্রমে মুখখানা তোর আবৃত হয়ে গেল।

আমি বললুম, 'ভবতোষবাবুর সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল অনেক দিন আগে।'

ঘরের বাইরে থেকে অমিতাভ ঘোষণা করল, 'টেবিলে খাবার দেওয়া হয়েছে, আসুন।'

সবাই উঠে পড়লেন। ক্রাচে ভর দিয়ে অমিতাভ লাফাতে লাফাতে চলল সবার আগে। আমি কেবল ব'সে রইলুম একলা বসবার-ঘরে।

ব'সেও থাকতে পারছিলুম না। দেহের গ্রন্থিগুলো যেন সব আলগা হয়ে গেছে। স্নায়বিক দুর্বলতার সর্বশেষ সীমাও বুঝি অতিক্রম ক'রে গেলাম। নিশীথ এল। জিজ্ঞাসা করল, 'দিদিমণি, তুমি একবার ওপরে যাবে না?'

'বড্ড দুর্বল বোধ করছি।'

'চল, আমি তোমায় ধরে নিয়ে যাচ্ছি।'

'না। শোন্, একটা গোপন কথা আছে তোর সঙ্গে।'

নিশীথ এগিয়ে এসে দাঁড়াল আমার কাছে।

বললুম, 'সাবিত্রী অসুস্থ। ওর ক্ষয়রোগ হয়েছে। বুকের একটা ছবি নিয়েছিলাম। বাঁ দিকটায় দাগ পড়েছে।'

'সাবিত্রীর আজও সন্ধ্যের সময় জ্বর এসেছে।'

'আসবেই। সাংঘাতিক রোগ। আজ উৎসবের রাত। নিশীথ,

সাবিত্রীর খুব কাছে কিন্তু যাস নি। মানে, স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্ক বলতে যা বোঝায় তা এখন বন্ধ থাকবে। নিশীথ, দেখ্ তো দরজার বাইরে কে?'

পর্দা সরিয়ে নিশীথ দেখল, দেখে বলল, 'অমিতাভবাবু।'

'কোথায়?'

'ওপরে উঠে যাচ্ছেন।'

আমাদের কথাবার্তা সব শুনে গেল অমিতাভ!

আমি এলিয়ে পড়লাম সোফার ওপরে।

খাওয়া ওঁদের শেষ হ'য়ে গেল। সবাই এসে বসলেন আবার। ভবতোষও এল। এলি না কেবল তুই। রমা এসে বসল ঠিক আমার পাশে। রমাকে বললুম, 'আমি তো কলেজের চাকরি ছেড়ে দিয়েছি। এবার থেকে মেয়েদের তুমিই পড়াবে।'

সুজাতাদি জিজ্ঞাসা করলেন, 'এ কি কথা বলছ, জয়া? চাকরি ছেড়ে দিলে, অথচ আমি জানলুম না?'

'কাল পরশু জানতে পারবেন। আজ আমি ইস্তফা-পত্রটা রেজেস্ট্রি ডাকে পাঠিয়ে দিয়েছি।'

সুজাতাদির মনের রাজ্যে স্বস্তির হাওয়া বইল। এক এক ক'রে সবাই বিদায় নিয়ে চ'লে যেতে লাগলেন। একটা পরিচিত জগৎ আমার সামনে থেকে একটু একটু ক'রে ক্ষয়ে যেতে লাগল। শেষ পর্যন্ত কালিপদও যখন বিদায় নিয়ে চ'লে গেল, ক্ষয়ের বিস্তৃতি তখন একেবারে সুসম্পূর্ণ হয়েছে।

ভবতোষকে জিজ্ঞাসা করলুম, 'রত্না কোথায়?'

'সাবিত্রীর সঙ্গে কথা কইছিল। ওর কাছেই হয়তো ব'সে আছে।'

'আমাদের সব কথা ওকে খুলে বল নি কেন?'

'সব কথা শোনবার মত কান ওর আজও তৈরি হয় নি। রত্না কেবল নৃত্য-শিল্পী, জীবন-শিল্পী নয়। সময় হ'লে সে সবই শুনতে পাবে।'

'তা হ'লে আমার আর কিছু বলবার নেই। তুমি ব'স, দেখি রত্না কি করছে।'—আমি উঠলুম। একবারে উঠে দাঁড়াতে পারলুম না। পা কাঁপছিল। ভবতোষ ধ'রে আমায় দাঁড় করিয়ে দিল। ভবতোষের হাতের ছোঁয়ায় আজও কোন বর্বরতার প্রমাণ পেলুম না।

ঘরের বাইরে এসে দেখি, অমিতাভ লাফাতে লাফাতে ডাইনিং-রুমের দিকে চ'লে যাচ্ছে। একটু আগেও যে সে এখানে দাঁড়িয়ে আমাদের কথাবার্তা শুনছিল তাতে আমার আর সন্দেহ রইল না। একটা পায়ের ক্ষিপ্রতা লক্ষ্য ক'রে অবাক হলুম খুবই।

তোকে খুঁজে পেলুম এসে আমার শোবার-ঘরে। আমার বিছানার ওপর লুটিয়ে প'ড়ে কাঁদছিলি তুই। সহসা ড্রেসিং-টেবিলের দিকে চেয়ে দেখি, বাবার ফোটোখানা সেখানে নেই। বিছানার কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম আমি। ফোটোখানার ওপর মুখ রেখে তুই চোখের জল ফেলছিলি।

তোকে বোধ হয় কাঁদবার সুযোগ দেবার জন্যেই ঘর থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে এলুম আমি।

আমি যে তোর বোন সেটা আর গোপন রইল না।"

॥ সপ্তদশ রাত্রি ॥

"তার পরে আরও ক'টা মাস কেটে গেছে।

তুই আর আমার সঙ্গে দেখা করতে আসিস নি। আসে নি ভবতোষও। তোরা আসবি ব'লে আমি আশাও করি নি। আমি যে তোর বড় বোন তেমন সত্য তুই সেদিন জানতে পারলি ব'লে আমি খুশীই হয়েছি। তোর চেয়ে নিকটতর আত্মীয় পৃথিবীতে আমার আর যে কেউ নেই তা বোধ হয় তুই বুঝতে পেরেছিলি সেদিন।

গত তিন মাসের মধ্যে বাড়ির বাইরে যেতে পারি নি। যাওয়ার ক্ষমতাও ছিল না। নিজের ঘরে শুয়ে শুয়ে সাবিত্রীর খবর নিই। মাঝে মাঝে জানলার ফাঁক দিয়ে নিশীথের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করি। কি করছে সে ? তুজন রোগীর পরিচর্যা করতে গিয়ে কার দিকে ও বেশী নজর দিচ্ছে তাও লক্ষ্য করি। ওর পক্ষপাতিত্ব আজও আমি ধরতে পারি নি। পরিবর্তন দেখছি না কিছুই। নিশীথ একটু গম্ভীর হয়েছে আগের চেয়ে বেশী।

একদিন তুপুরবেলা নিশীথ ব্যস্তভাবে ঘরে ঢুকল। বলল সে, 'দিদিমণি, সাবিত্রীর বড্ড বেশী কষ্ট হচ্ছে। ইন্‌জেকশনটা আমিই গিয়ে নিয়ে আসি।'

'না। অমিতাভ নিয়ে আসবে। টাকা আর প্রেস্‌ক্রিপশন তাকে দিয়ে দিয়েছি।'

'কিন্তু সে তো সাত দিন হয়ে গেল ! ডাক্তার বলেছেন নিয়মিত ইন্‌জেকশন না দিলে সাবিত্রী বাঁচবে না।'

'বাঁচবে রে নিশীথ, বাঁচবে। তা ছাড়া ও-ইন্‌জেকশন তোর কাছে কেউ বিক্রি করবে না।'

'কি জানি, ডাক্তারবাবু বললেন—পয়সা দিলেই পাওয়া যায়।'

'আমার চেয়ে কি ডাক্তারবাবুর কথা বড় হ'ল ?'

'না, তা নয়। তা হ'লে···বড্ড কষ্ট পাচ্ছে। দেখি, যাই।'

'যাচ্ছিস, নিশীথ? একটু ব'স্ না আমার কাছে। সাবিত্রীকে ভাল ক'রে তোলবার জন্যে তোর খুব আগ্রহ, না রে?'

'হ্যাঁ, দিদিমণি।'

'কেন? সুস্থ সাবিত্রীকে নিয়ে তুই কি করবি? আচ্ছা, যা, ডাক্তারবাবুকে ডেকে নিয়ে আয়। একটা ইন্‌জেকশন বোধ হয় আমার কাছে আছে।'

'আছে? দাও।'

'দিচ্ছি। ডাক্তারকে আগে ডেকে নিয়ে আয়।'

নিশীথ ছুটল ডাক্তার ডাকতে। লেক মার্কেটের কাছে কোথায় যেন বসেন এই ডাক্তারটি। প্রায় আধ ঘণ্টা বাদেই ডাক্তারকে নিয়ে ফিরে এল সে। আমি বললুম, 'হাত থেকে প'ড়ে ইন্‌জেকশনের শিশিটা ভেঙে গেছে। ডাক্তারবাবু কি তোর আর একটা যোগাড় করতে পারবেন না?'

সরল বিশ্বাসে নিশীথ ছুটল সাবিত্রীর ঘরে, ডাক্তারবাবুর কাছে। ফিরে এসে খানিকটা হতাশার সুরেই সে বলল, 'ডাক্তারবাবু বললেন যে, যোগাড় করতে পারবেন। তবে এ বেলায় আর হবে না, বিকেলে। এখন তাঁকে দূরে কোন্ জায়গায় রোগী দেখতে যেতে হবে।'

বললুম, 'বেশ তো, তাই ভাল। বিকেলেই ওঁকে আসতে বল্। একবেলার মধ্যে অসুখ আর এমন কি বাড়বে?'

'দিদিমণি, ডাক্তারবাবু বললেন—এ অসুখ খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে।'

'তা হ'লে সাবিত্রীর অসুখটা আমার ভেতরে ঢুকিয়ে দে। আমি তো তাড়াতাড়িই মরতে চাই। আমি ম'রে গেলে কারও কোনও ক্ষতি হবে না।'

'তোমার তো কোন অসুখ নেই, তুমি মরবে কেন, দিদিমণি?'

'তবুও আমি কেন মরছি?—সেই প্রশ্নই করছি তোদের সবার

কাছে। সাবিত্রীর ভাল হয়ে কাজ নেই, তোকে আমি নিষ্পাপ রাখতে চাই।'

নিশীথ কি বুঝল জানি না, কোন কিছু জানতে চাইল না। চ'লে গেল ঘর থেকে।

এমনই ক'রেই আরও দুটো মাস কেটে গেল। আমার খেয়াল-খুশিমত সাবিত্রীর চিকিৎসা চলতে লাগল। আমার হিসেবে সাবিত্রীর এতদিনে শেষ অবস্থায় পৌঁছনো উচিত ছিল। কিন্তু খবর নিয়ে জানলুম, সাবিত্রীর নিশ্বাস নেওয়ার কষ্ট একটু কমেছে। ঘরের জানলা-দরজা সব বন্ধ থাকলেও সাবিত্রী নাকি বলে—ঘরে আজ অনেক হাওয়া!

কোথা থেকে হাওয়া এল নিশীথ তা বলতে পারে না। সাবিত্রীর কষ্ট দেখলে সে কখনও আর ব্যস্তভাবে এসে ঘরে ঢোকে না আমার। আমি নিজে থেকে ইন্‌জেকশনের কথা না বললে, সে নিজে কিছু আর বলে না।

বিছানায় শুয়ে কেবল একটা কথা বুঝতে পেরেছি যে, নিশীথ সাবিত্রীকে ভালবাসে।

একদিন কি মনে ক'রে মাঝরাত্রিতে ঘরের বাইরে এলুম। কোন ঘরেই আলো নেই। মাঝরাত্রিতে থাকবার কথাও নয়। কেবল সাবিত্রীর ঘরেই আলো রয়েছে। ক্ষীণ আলো। ইলেক্‌ট্রিকের আলো ব'লে মনে হ'ল না। আমি পা টিপে টিপে এগিয়ে গেলুম ওদের ঘরের দিকে। খোলা জানলার মধ্যে দিয়ে উঁকি দিলুম। সাবিত্রী ঘুমচ্ছে। গভীর ঘুম। ওর মাথার ওপরের দিকে মেঝেতে ব'সে নিশীথ যেন কি করছিল। ডান দিকে স'রে গেলুম আমি। ওখান থেকে একটা প্রদীপ দেখতে পেলুম। প্রদীপটা জ্বলছে। নিশীথ সোজা হয়ে ব'সে চোখ বন্ধ ক'রে রেখেছে। নিশীথ ধ্যান করছে নাকি? পুজো করবে না ব'লেই তো সে এসেছিল আমার কাছে মানুষের সেবা করতে। কিন্তু ওর সামনে যেন একটা ফোটো রয়েছে ব'লে মনে হ'ল আমার।

কার ফোটো কিছুই বুঝতে পারলুম না। সরল মানুষ নিশীথ। হয়তো কি খেয়াল হয়েছে, রাত জেগে জেগে সাবিত্রীর ফোটোই পুজো করছে সে। অমিতাভ সাবিত্রীর যা ফোটো তুলেছে তার সংখ্যাও বড় কম নয়।

রাত আমিও জাগি, ঘুমই না। আমার মুখে নিদ্রাহীনতার চিহ্ন যে-কেউ দেখলেই চিনতে পারে। কিন্তু নিশীথের মুখে নিদ্রাহীনতার ছাপ কই? নিশীথ কি নিদ্রাকে জয় করল নাকি?

একদিন ওকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলুম, 'কাল কি ডাক্তারবাবু আসেন নি?'

'না।'

'আমি এক বাক্স ইন্‌জেকশন কিনিয়ে রেখেছি। এ মাসটা নিয়মিতভাবে ইন্‌জেকশন যেন দেওয়া হয়। এই নে—'

'তোমার কাছেই থাক্, দিদিমণি। পরে নেব।'

'সে কি রে? বোধ হয় কুড়ি দিন আগে শেষ ইন্‌জেকশন পড়েছে! আর কত পরে নিবি?'

'এখন সাবিত্রী একটু ভাল আছে। ঘরের মধ্যে পায়চারি করছে।'

'বলিস কি? ইন্‌জেকশনগুলো তবে কাজ করেছে খুব। প্রথম অবস্থায় চিকিৎসা হ'লে আজকাল টি. বি. রোগে কেউ মরে না।'

ঘরটা গুছতে গুছতে নিশীথ বলল, 'বোধ হয় তাই। তুমি তো ওর প্রথম অবস্থা থেকেই চিকিৎসা শুরু করেছ, নইলে কি হ'ত বলা যায় না। তুমি একটু উঠে ব'স, বিছানাটা ঠিক ক'রে দিই—'

'উঠছি। কিন্তু সাবিত্রী কি সম্পূর্ণভাবে আরোগ্য হয়ে গেছে?'

'সে তো তুমি ওর বুকের ছবি তুললেই বুঝতে পারবে। বাইরে থেকে এ রোগের কতটুকুই বা দেখা যায়!'

'হ্যাঁ, তুই ঠিকই বলেছিস। বাইরে থেকে কিছুই বোঝা যায় না। সাবিত্রীর খিদে হচ্ছে কেমন?'

'আজ ক'দিন থেকে খুবই খিদে হচ্ছে। দিনরাত কেবল খেতে চায়।'

'ও, তাই না কি? বাইরে থেকে তো ব্যাপারটা ভালই মনে হচ্ছে।'

'বাইরে থেকে ভালই মনে হচ্ছে সত্যি, কিন্তু এ তো ভেতরের রোগ। কবে ওর বুকের ছবি তোলাবে, দিদিমণি?'

'আমাদের দুজনারটা একসঙ্গেই তোলাব। আমারও বোধ হয় হয়ে এল।'

'কি যে বল তুমি! নাও, এবার একটু উঠে ব'স।'

'তুই উঠিয়ে না দিলে উঠব কি ক'রে?'

নিশীথ সত্যি সত্যি আমায় উঠিয়ে বসিয়ে দিল। নিশীথের মুখে কেবল আজ সরলতাই লক্ষ্য করলুম না। কি রকম একটা অদ্ভুত ধরনের তন্ময়তাও দেখলুম। আন্তর সম্পদে ওর তন্ময়তা যেন বিশেষ এক ধর্মের রূপ নিয়েছে। আমার আর কোন সন্দেহই রইল না যে, নিশীথ সাবিত্রীকে ভালবাসে।

আমার চেনা-জগতে এ ভালবাসার কোন পূর্বপরিচয় ছিল না। নিশীথকে জিজ্ঞাসা করলুম, 'সাবিত্রীকে কোন দৈব ওষুধ খাওয়াচ্ছিস নাকি?'

'দৈব ওষুধ! সে কোথায় পাওয়া যায়? এসব ব্যারাম বড় সাংঘাতিক, দিদিমণি। ডাক্তারের অনুমতি ছাড়া কোন কিছুই খাওয়ানো চলে না।'

'তা ঠিক। বাইরে কে এল রে?'

দরজার কাছে গিয়ে নিশীথ বলল, 'অমিতাভবাবু। ডাকব এখানে?'

'একটু দাঁড়া। ওই চাদরটা দিয়ে আমায় ঢেকে দে।'

অমিতাভ এল। ক্রাচটা চেয়ারের গায়ে ঠেকিয়ে রেখে সে বসল সোজা হয়ে। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'এতদিন কোথায় ছিলে? তোমার ছবি আঁকবার জিনিসপত্র সব আমার এখানে প'ড়ে রইল। ছবি আঁকা ছেড়ে দিলে নাকি?'

'না। এবার একটু নিশ্চিন্ত হয়ে বসব ছবি আঁকতে। তোমার বসবার-ঘরটা একটু আজ গুছিয়ে নেব। সাবিত্রীকে দেখে এলুম।'

'কি দেখলে?'

'হাঁটাহাঁটি করছে।...তোমার অঙ্ক বোধ হয় সব ভুল হয়ে গেল।'

'তার মানে?'

'সাবিত্রীর উন্নতি হতে পারে তা বোধ হয় তুমি ভাব নি।'

'তুমি কি বলতে চাও, অমিতাভ?'

এক হাত দিয়ে অমিতাভ একটা সিগারেট ধরাল। তারপর সে বলল, 'অস্তিবাদীর সামনে কোন ভবিষ্যৎ থাকতে পারে না। শূন্যতার মহাসাগরের মধ্যে তুমি একটা সুখের দ্বীপ তৈরি করছিলে। প্রকৃতপক্ষে, সুখের মহাসাগরের মধ্যে অস্তিবাদীরা শূন্যতার দ্বীপ ছাড়া আর কোন কিছুই দেখতে পায় না।'

'সুখের দ্বীপটা আমার কোথায় দেখলে তুমি?'

পেছন দিকে একবার চেয়ে নিয়ে অমিতাভ জবাব দিল, 'নিশীথ-সমুদ্রের মধ্যে সাবিত্রীর টি. বি. রোগটা ছিল সুখের দ্বীপ। সেটা এখন ধ'সে পড়ছে। ধ'সে পড়ছে নিশীথ-সমুদ্রের মধ্যেই। সাবিত্রীর টি. বি. আছে জেনেই তুমি নিশীথকে ওর সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলে। নিশীথকে গ্রাস করবার আশা তুমি করেছিলে। কিন্তু আজ দেখছ, তোমার হজমশক্তি একেবারে নিঃশেষ হয়ে গেছে। অস্তিবাদীর মহৎ গুণ হচ্ছে যে, সে কখনও সত্য গোপন করে না।'

'অমিতাভ—'

'জয়া—'

'এর পরে তোমার আর এখানে থাকা চলে না।'

'তা হ'লে যাচ্ছি।'—ক্রাচটা ফস ক'রে টেনে নিয়ে অমিতাভ উঠে দাঁড়াল। আমার দিকে ঝুঁকে কিছু বলতে যাচ্ছিল, না, কোন কিছু

করতে যাচ্ছিল, বুঝতে পারলুম না। আমি চাদরটা আমার মাথা অবধি টেনে দিলুম।

অমিতাভ চ'লে গেছে তাও অনেক দিন হ'ল। একেবারে একলা প'ড়ে গেছি লেক প্লেসের ফ্ল্যাটে। দিনরাত কি করছে নিশীথ জানি না। সাবিত্রী ক্রমশই স্বাভাবিক স্বাস্থ্য ফিরে পাচ্ছে। আমার সারা জীবনের অঙ্কের মধ্যে যেন একটা নয়, একাধিক ভুল বেরিয়ে পড়বার উপক্রম হ'ল! মাঝে মাঝে বড্ড অসহায় বোধ করি। ঝরনা তার স্বাধীনতা অর্জন করেছিল, আমি কী অর্জন করলুম? বীরেশবাবু এস্‌থেটিক অভিজ্ঞতার বাইরে আর কোন সত্যের সন্ধান পান নি। বিশুদ্ধ সৌন্দর্য ব'লে কী এক বস্তু নিয়ে তিনি মেতে ছিলেন মৃত্যুর শেষ দিন পর্যন্ত। আমি কী নিয়ে শেষ দিন পর্যন্ত বাঁচব? তুই তো তোর নৃত্য-শিল্পের বাইরে অন্য কোন সত্তার সম্মুখীন হওয়ার প্রয়োজন বোধ করিস নি। আমার সামনে কী রইল? নিশীথও বোধ হয় কোন এক আশ্চর্য লোকের নতুন হাওয়ায় নিশ্বাস নিচ্ছে। ভালবাসার হাওয়া ব'লে সন্দেহ হচ্ছে আমার। কোন্‌টা সত্যি কোন্‌টা মিথ্যে বুঝতে পারছি না। ঝরনা এবং বীরেশবাবুর শেষ আমি দেখলুম। তাতে কোন কিছু পাওয়ার সৌভাগ্য ছিল না। অমিতাভর মুঠোও যে খুব শক্ত তাও আমার মনে হয় না আজ। এখন ভবতোষ কিছু পেল কি না জানবার বড় আগ্রহ হয়।

তার পরে একদিন রাত্রি দশটার সময়ে সেই সর্বনেশে টেলিফোন পেলাম ভবতোষের কাছ থেকে। নিশীথ এসে খবর দিল, 'দিদিমণি, শিগগির এস, ভবতোষবাবু ডাকছেন। এস, আমি ধরছি।'

নিশীথ ধ'রে নিয়ে এসে আমায় বসিয়ে দিল টেলিফোনের সামনে। রিসিভারটা আমার কানের কাছে তুলে ধ'রে রাখল নিশীথই। ও-পাশ থেকে ভবতোষের গলা শুনতে পেলুম, 'কে? হ্যালো—জয়া?'

'হ্যাঁ, আমি—আমিই। কি হয়েছে বললে? না, ভবতোষ—তুমি কি আমার সঙ্গে—হ্যালো? ভবতোষ—'

'আজকে রত্না গিয়েছিল টালিগঞ্জের কলোনিতে চ্যারিটি শো দেখাতে। পাকা রঙ্গমঞ্চ নয়, হ্যালো, ছেলেরা অতি কষ্টে একটা স্টেজ-মতো খাড়া করেছিল। শো যখন প্রায় শেষ হয়ে আসছিল, তখন কি ক'রে যেন স্টেজে আগুন লেগে যায়। রত্না দৌড়ে চ'লে গেল ভেতরের দিকে। সেইটেই ভুল করল ও।'—এই পর্যন্ত ব'লে ভবতোষ থেমে গেল।

ব্যস্ত হয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'ভবতোষ, থামলে কেন? রত্না ভাল আছে তো? হ্যালো, জবাব দাও—জবাব দিচ্ছ না কেন? আমার বোন ভাল আছে তো?'

'আছে, ভাল আছে সে। কিন্তু মুখটা বোধ হয় পুড়ে গেছে। হ্যালো, জয়া!'—ও-পাশ থেকে ভবতোষ এবার বার বার 'হ্যালো' 'হ্যালো' ব'লে ডাকতে লাগল। নিশীথের হাত থেকে রিসিভারটা নিয়ে আমি ওকে বললুম, 'নিশীথ, খানিকটা ব্র্যাণ্ডি নিয়ে আয় তো।...এই যে আমি কথা বলছি ভবতোষ, হ্যালো, তুমি তখন কোথায় ছিলে?'

'রত্নার নাচ দেখছিলুম।'

'রত্নার নাচ দেখছিলে?'

'হ্যাঁ, এই প্রথম আমি ওর নাচ দেখতে গিয়েছিলাম! ইয়োরোপে দেখি নি, মধ্যপ্রাচ্যে দেখি নি, ভারতবর্ষেও দেখি নি। আজ টালিগঞ্জের উদ্বাস্তু কলোনিতে গিয়েছিলুম। আমার ড্রাইভারটা আমার সঙ্গে সঙ্গে জীবন বিপন্ন করেছিল ব'লে দুজনে আমরা কোন রকমে রত্নাকে ভেতর থেকে বার ক'রে আনতে পেরেছিলাম। নইলে—'

'ভবতোষ, তোমার কোন ক্ষতি হয় নি তো? জবাব দিচ্ছ না যে?'

'সামান্য—আমি এই মাত্র বাড়ি ফিরে এলুম।'

'রত্না কোথায়?'

'হাসপাতালে।'

'সেখানেই ও থাকবে না কি? ভবতোষ, এবার তো তোমার জীবনে সত্যিকারের সংকট এল, ক্রাইসিস। কি করবে? পরিত্যাগ করবে নাকি ওকে? জবাব দিচ্ছ না যে? পরিত্যাগ করবার মত সংসাহস তোমার নেই। তুমি ধর্ম মানো, তাই ওকে সামনে বসিয়ে রেখে পোড়ামুখের বীভৎসতা উপভোগ করবে সারাজীবন। আমি কখন যাব ওকে দেখতে?'

'আমি তোমায় খবর দেব। অন্তত পনেরো দিনের আগে তো নয়ই।'

'কিন্তু রোজ আমায় খবর দেবে তো?'

'দেব। যাও, তুমি এবার শুয়ে পড় গে যাও।'

'ভবতোষ—না, থাক্। পরে কথা হবে।'

টেলিফোন কেটে দিয়ে নিশীথকে সব খবরই বললাম। আমার নিজের সারা শরীরই কাঁপতে লাগল। আহা, তুই যেন কী কষ্টই না পাচ্ছিস রে! আমি ভাবলুম, আমার সমস্ত জীবনের জ্বালাও এর কাছে কিছু না।

রোজ রাত্রেই টেলিফোন ক'রে ভবতোষ আমায় তোর খবর সব জানাত। একটু একটু ক'রে ঘা সব শুকিয়ে আসছে। তবে মুখের ব্যাণ্ডেজ খুলতে এখন অনেক দিন বাকী। তা হোক, জীবনটা যে তুই ফিরে পেয়েছিস তাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। নিশীথকে দু-চার দিন হাসপাতালে পাঠিয়েছিলুম। একদিন ফিরে এসে সে বলল, 'বড্ড বেশী রকমভাবে পুড়ে গেছে মুখটা। সবাই বলাবলি করছিলেন, মুখ দেখে রত্নাদিকে আর কেউ চিনতে পারবে না।'

আমি বললুম, 'অন্য কারও চেনবার দরকার নেই, ভবতোষবাবু চিনতে পারলেই হ'ল।'

যেদিন ভবতোষের কাছ থেকে টেলিফোন পেলাম—তুই বাড়ি ফিরে এসেছিস, সেদিন ডাক্তার সেন আমায় দেখতে এসেছিলেন।

আমার দ্বিতীয় চিঠিতে বোধ হয় সে কথা তোকে জানিয়েছিলাম। ডাক্তার সেনকে অনুরোধ করলাম, সাবিত্রীর নতুন একটা এক্স-রে ফোটো নেবার জন্যে। কাল আমি সাবিত্রীকে পাঠাব ডাক্তার সেনের এক বন্ধুর এক্স-রে ক্লিনিকে। কি ক'রে সাবিত্রী ভাল হ'ল তার কারণটা জানতে পারলে আমার জীবন-জিজ্ঞাসার জটিলতা খানিকটা সহজ হয়ে আসবে। কিন্তু তার আগে আমি সুনিশ্চিতভাবে জেনে নিতে চাই যে, সাবিত্রীর বুকে আর বিন্দুমাত্র দাগ নেই।

নিশীথ এই মাত্র ফিরে এসে বলল, 'দিদিমণি, সাবিত্রীকে নিয়ে লেকের দিকটাতে একটু বেড়াতে গিয়েছিলাম।'

'লেক প্লেসে থাকিস, লেকের দিকে বেড়াতে যাওয়া ভালই। কিন্তু লেকটা যত কাছে হোক, সাবিত্রী এতটা পথ হাঁটল কি ক'রে?'

'এই তো ফিরে এল, একটুও হাঁপায় নি পর্যন্ত।'

'ট্যাক্সি ক'রে নিয়ে গিয়েছিলি বুঝি?'

'হেঁটে গিয়েছিলুম আমরা। হেঁটেই এলুম। লেকের দিকের খোলার ঘরগুলো দেখে সাবিত্রী বলল, ওখানে নিশ্চয়ই রিফিউজীরা থাকে। সাবিত্রী কি ক'রে বলল জান?'

'না। কি ক'রে বলল রে?'

'ঘরগুলো অত ভাঙা ব'লে।'

'ভা-রি চালাক মেয়ে তো!'

'ভা-রি।'

'হ্যাঁ রে নিশীথ, একবার ওর গায়ে হাত দিয়ে দেখ্ তো।'

'দেখেছি, দিদিমণি। গা একেবারে ঠাণ্ডা।'

নিশীথের কথা শুনে আমার বিবেচনাবোধও সব ঠাণ্ডা হয়ে আসছিল।

পরের দিন ঠিক করলুম, তোকে একবার দেখতে যাব। আমার কথা শুনে নিশীথ তো ভয়ে অস্থির। ওর অস্থিরতাকে আমল দিলুম না।

তোকে দেখবার জন্যে মনটা আমার ছটফট করছিল অনেকদিন থেকে। নিশীথ ট্যাক্সি ডেকে নিয়ে এল। ওকে সঙ্গে নিয়েই আমি রওনা হলুম। তোরা রডন স্ট্রীটের বাড়ি বদলে চ'লে এসেছিলি গোখেল রোডের দিকে। বাড়িটা খুঁজে বার করতে সময় লাগল একটু।

বেলা বোধ হয় তখন চারটেই হবে। গোটা বাড়িটা নিস্তব্ধ। কোথাও পাতা-নড়ার আওয়াজ পর্যন্ত নেই। রণবীর ব'সে ছিল বাইরের ফটকে। আমরা ভেতরে এলুম। নিশীথ ব'সে রইল বারান্দায়।

একজন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান নার্স দেখলুম হাতে একটা চায়ের পেয়ালা নিয়ে ল্যাণ্ডিংয়ের ডান পাশ দিয়ে চ'লে যাচ্ছে। তোর বোধ হয় চা খাওয়ার সময় হ'ল। আমাকে দেখে নার্সটি এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কি মিসেস ঘোষকে দেখতে এসেছেন?'

'হ্যাঁ, আমি মিসেস ঘোষের বড় বোন।'

নার্স বলল, 'উনি এমনিতে সুস্থই আছেন। মুখের ব্যাণ্ডেজ কাল হাসপাতাল থেকে বদলে দেওয়া হয়েছে।'

'ঘা সব শুকয় নি এখনও?'

'শুকিয়ে গেছে। কিন্তু সহসা মুখটা উনি দেখতে পেলে ভয় পেতে পারেন ব'লে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা আছে। মিসেস ঘোষ বোধ হয় তা টেরও পেয়েছেন। সকাল থেকে শুধু একটা আয়নার খোঁজ করছেন তিনি। মিস্টার ঘোষ এ বাড়িতে কোন আয়না রাখেন নি। আপনি যেন ওঁকে আয়না দেবেন না। আপনার এই হ্যাণ্ডব্যাগে নিশ্চয়ই আয়না আছে?'

'আছে।'

'তা হ'লে হ্যাণ্ডব্যাগটা এখানেই রেখে যান।'

তাই রাখলুম।

একটা ছোট ঘর পার হয়ে তোর ঘরে যেতে হয়। দূর থেকেই

আমি দেখলুম, মুখের ব্যাণ্ডেজটা তুই প্রায় অর্ধেকটা খুলে ফেলেছিস। কোথা থেকে একটা ছোট্ট আয়না যোগাড় ক'রে তাতে মুখ দেখছিলি তুই। জোরে জোরে পা ফেলবার ক্ষমতা ছিল না আমার। ধীরে ধীরে হেঁটে ঘরটা পার হচ্ছিলুম। হঠাৎ শুনি, তুই ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলি। তারপর তোশকের তলা থেকে একটা ছুরি বার করলি তুই। 'প্রেমের প্রতিশোধ' নাচ দেখাবার সময় এই ছুরিটাই তোর হাতে দেখেছিলাম আমি। ভয়ে মুখ আমার শুকিয়ে গেছে, যেন দম পর্যন্ত ফেলতে পারছি না। আমি দেখলুম, আত্মহত্যার জন্মে তুই বদ্ধপরিকর। কোন্ এক দিকে হাত তুলে বুঝি প্রণামও করলি একবার। তার পর সেই চকচকে ছুরিটা সত্যি-সত্যি বুকের ওপরে তুলে ধরলি। আমি এবার চেঁচিয়ে উঠলুম, 'রত্না, রত্না—নার্স—নিশীথ, শিগগির আয়।' বলতে বলতে আমি পৌঁছে গেলুম তোর হাত পর্যন্ত। আমার অবশিষ্ট শক্তিটুকু সব কেন্দ্রীভূত হয়ে গেল ডান হাতের আঙুলগুলোতে। তোদের ভগবান সেদিন তোকে রক্ষা করতে পারতেন না।

আমার চিৎকার শুনে নার্স এল, রণবীর সিং এল, এল নিশীথও। ছুরিটা সরিয়ে নিয়ে গেল রণবীর। নার্স তাড়াতাড়ি তোর মুখের ব্যাণ্ডেজটা বেঁধে দিল। আয়নাটা সরিয়ে নিয়ে গেল নার্সই।

আমার নিজের শক্তি ক্রমে ক্রমে ফিরে আসতে লাগল। আমি সবাইকে বললুম, 'তোমরা এবার সব বাইরে যাও।'

তুই কাঁদছিলি। ব্যাণ্ডেজ সব ভিজে গেল। একটু বাদে তুই বলতে লাগলি—'কেন তুমি আমায় বাধা দিলে, জয়াদি? এ মুখ নিয়ে কেমন ক'রে আমি বেঁচে থাকব? আমি আর নাচতে পারব না ব'লে ভবতোষ এবার কত খুশী হবে। ভবতোষকে কেন আমি খুশী করব, জয়াদি? সেদিন এমনি একটা দুর্ঘটনা ঘটবে জেনেই বোধ হয় ভবতোষ আমার নাচ দেখতে গিয়েছিল। এই প্রথম, এই শেষ!' হু-হু ক'রে কাঁদতে লাগলি তুই।

এই সময় ভবতোষ এসে দাঁড়িয়ে ছিল তোর মাথার ওপরের দরজার পাশে। তুই ওকে দেখিস নি, আমি দেখেছিলাম। আমি এবার উঠলুম। তুই জিজ্ঞাসা করলি, 'আবার কবে আসবে, জয়াদি? তুমি এখানে থাক না।'

'আবার আসব আমি, রত্না।'

এবার আমি যাওয়ার জন্যে সত্যিই ব্যস্ত হয়ে উঠলুম। প্রতিটি মুহূর্তের ওজন যেন ক্রমশই ভারী হয়ে উঠতে লাগল। আমি বুঝতে পারলুম, ছটো জীবনের মধ্যে এবার মিলনের পথ তৈরি হ'ল। আজ নিশ্চয়ই অস্বীকার করতে পারবি না যে, পথটা তৈরি ক'রে দিয়েছিলুম আমি—আমি জয়া বসু। বোধ হয় মিনিট পাঁচেক পরে তুই আমায় বললি—'জান, মা আমায় আজও একবার দেখতে আসেন নি? ধর্ম বদলেছি ব'লে আমি কি জন্তু ব'নে গেছি নাকি? জন্তুর প্রতি কি মানুষের ভালবাসা থাকে না? তুমি কিছু বলছ না কেন, জয়াদি?'

'রত্না, নিজেকে আর নষ্ট করবার চেষ্টা করিস নে।'

'তুমি নিজে কি আজ বিশ বছর ধ'রে নিজেকে তিলে তিলে হত্যা করছ না, জয়াদি?'

'আমায় ক্ষমা কর্, রত্না—ক্ষমা কর্, বোন।'

'আমি তোমায় ক্ষমা করব, জয়াদি? আমরাই তো তোমার কাছে ক্ষমা চাইব। তোমাদের কাছ থেকে আমরাই তো সব ছিনিয়ে নিয়েছি ...বাবাকে তোমরা পাও নি। জয়াদি...ভবতোষকেও তুমি পেলে না।'

'ছিঃ, রত্না, এ সব কথা বলতে নেই, ভাই। ভবতোষকে ছুঃখ দিস না।'

'কিন্তু তোমার ছুঃখ? ভবতোষ বলে, আমি জীবন-শিল্পী নই। বোধ হয় ঠিকই বলে। জয়াদি, ভবতোষের ভেতরটা যে একবার দেখতে পেয়েছে সে ভবতোষকে তো ভালবাসবেই। তোমার ভালবাসা মিথ্যে হয় নি।'

ভবতোষের পাশ কাটিয়ে আমি চ'লে এলুম ঘরের বাইরে। কথা বলার চেষ্টা করি নি আমি। চেষ্টা করল না ভবতোষও। আমি নিরুত্তরে বেরিয়ে গেলাম ব'লে খুশী হ'ল ভবতোষ। এখন কেবল সাবিত্রী সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হতে পারলে আমার পরাজয় সুসম্পূর্ণ হবে। কলকাতার সবগুলো সীমান্তে শান্তির নিশান উড়ল। বোধ হয় উড়ল। নিশীথকে ট্যাক্সিতে তুলে বললুম, 'চল্, একবার বড়মামার বাড়ি হয়ে আসি।'

হরিশ মুখার্জি রোডে এসে পরিবর্তন লক্ষ্য করলুম। নামীনাথ নীচেই ছিল। বুড়ো হয়ে গেছে। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'কি রে, এত তাড়াতাড়ি বুড়ো হয়ে গেলি কেন?' প্রশ্নটা মনঃপূত হ'ল না নামীনাথের। সে আমার দিকে আঙুল তুলে বলল, 'নিজের চেহারাটা কি আয়নায় দেখ নি, জয়াদিদি?'

'আমার ও-ঘরটাতে এখন কে থাকে?'

'নন্তুদাদা।'

'নন্তুদা ফিরেছে নাকি?'

'হ্যাঁ। সে তো প্রায় বছর হয়ে এল।'

'আমায় তোরা একটা খবর পর্যন্ত দিস নি? সে কোথায়?'

'এখনও বাড়ি ফেরে নি।'

'মামার খবর কি?'

'তিনি ওপরেই আছেন। শরীরে আর কিছু নেই। তবে চোখে একটু একটু দেখতে পান।'

'বলিস কি? ওষুধ পেলেন কোথায়? কোন দৈব ওষুধ না কি?'

'না। বিলেত থেকে কে একজন বড় ডাক্তার এসেছিলেন, তিনি চোখ কেটে দিয়ে গেছেন।'

'বাঃ, বেশ। সবই তো ভাল খবর। মামীমা কোথায়? তিনি কি বাড়ি নেই? পুজোর ঘর বন্ধ দেখছি যে?'

'তাঁর ফিরতে রাত হবে। ঠাকুরের আজ কি একটা উৎসব আছে দক্ষিণেশ্বরে। তুমি ওপরে যাও, চা নিয়ে যাচ্ছি। আর কি খাবে?'

'আমার শরীর তো ভাল নেই, অন্য কিছু খাওয়া চলবে না।'

'শরীরের আর দোষ কি, যা সব কাণ্ড ক'রে বেড়াচ্ছ!'

'কি কাণ্ড রে?'

নামীনাথ জবাব দিল না, কেবল পেছন ফিরে নিশীথকে একবার দেখে নিল। বুঝলুম, বড়মামার কানেও তা হ'লে অনেক কথা এসে

কিন্তু আমাকে দেখে বড়মামা হাত বাড়িয়ে টেনে নিয়ে বললেন, 'অসভ্য মেয়ে, আমাকে একেবারে ভুলে গেছিস?'

'ভুলি নি, মামা। অনেক রকমের বাধাবিপত্তির মধ্যে বাস করতে হয়েছে, আসতে পারি নি। কেমন আছ তোমরা?'

বুঝলুম, প্রশ্নটা আমার অবান্তর হ'ল। এঁরা সবাই ভাল আছেন। জগৎ-জোড়া হতাশার মধ্যে বড়মামা একদিন ডুবে গিয়েছিলেন। এখন দেখছি হতাশার সমুদ্র সাঁতরে ডাঙায় এসে উঠেছেন। লাইব্রেরি-ঘরের পরিচ্ছন্নতাও লক্ষ্য করলুম। এমন ক'রে সব সাজিয়ে গুছিয়ে রাখল কে? নন্তুদা বিয়ে করেছে না কি? প্রশ্ন করতে ভয় পেলুম।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'কোন কিছু নতুন লেখা লিখছ নাকি মামা?'

'তুই চ'লে গেলি, বিদ্যাচর্চার শেষও হ'ল। বহুদিন লিখি নি। লিখলে বিকোতও না। বিংশ শতাব্দী তো এখনও মাঝপথে আসে নি। কিন্তু এরই মধ্যে এত বেশী মিথ্যের জঞ্জাল স্তূপীকৃত হয়ে উঠেছে যে, ইতিহাস লেখা যাচ্ছে না। দেখ্ জয়া, আমার মনে হয় আজ থেকে দুশো বছর পরে যাঁরা এই শতাব্দীর ইতিহাস লিখতে চাইবেন

তাঁদের গবেষণার কাজ হবে অত্যন্ত দুরূহ। প্রতি পদে পদে তাঁদের মিথ্যের সম্মুখীন হতে হবে। মাহেন-জো-দারোর ইতিহাস লিখতে আমাদের তেমন কষ্ট পেতে হয় নি।'

'আমার তো আর কিছুই করবার নেই, বলবারও নেই, মামা। যাক, তোমরা ভাল আছ দেখে খুশী হয়েছি। হাজার রকমের ঝড়-ঝাপটাতেও হিন্দুর জীবন ভেঙে পড়ে না। ভারতবর্ষের ইতিহাসের এ একটা মহৎ সত্য। ছোটমামার খবর কি?'

'অমিত মন্ত্রী হওয়ার কিছুদিন আগে সে চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেছে। এখানে আজকাল সে প্রায়ই আসে। ওর আসা-যাওয়ার পথ তো তুই প্রথম খুলে দিয়েছিলি। কোথায় যেন একটা ফ্ল্যাট ভাড়া ক'রে একা একা থাকে।'

'কি করছেন তিনি?'

'বিদ্যার দ্বারা অবিদ্যা দূর করছে অপূর্ব।'

'ও, তা হ'লে ছোটমামাও দেখছি মহৎ কাজই পেয়ে গেছেন। তাঁর সঙ্গেও অনেকদিন আমার দেখা হয় নি। ভাল লাগল চারদিকের খবর শুনে। সেদিন কোথায় যেন শুনছিলুম, তোমার জন্যে কি একটা সংবর্ধনা-সভা হয়েছিল? সত্যি নাকি?'

'হ্যাঁ।'

'ভাগ্য ভাল, মরবার আগে খানিকটা স্বীকৃতি পেলে। দেশের লোকেদের কাছে স্বীকৃতি পাওয়া কম কথা নয়।'

'জানিস জয়া, সেই সংবর্ধনা সভায় গিয়ে দেখি সব নতুন মুখ, কাউকে চিনি না। আমি ঐতিহাসিক হিসেবেই বলছি, কাউকে চিনি না। তাঁদের মধ্যে নন্তুরা কেউ নেই।'

বড়মামা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন।

খানিকটা সময় কেটে যেতেই আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'নন্তুদা কি করছে?'

'ভবানীপুরের দিকে একটা মনিহারী দোকান ক'রে দিয়েছি।'

আমি উঠে পড়লুম। একটু ব্যস্তভাবেই বললুম, 'আজ চলি।'

'তোর কথা তো কিছু বললি না, জয়া?'

'কথা কিছু নেই, ভালই আছি। অন্য একদিন আসব।'

'হ্যাঁ, আসিস। বউমার সঙ্গে তো দেখা হ'ল না। তোর মামীমার সঙ্গে সে-ও দক্ষিণেশ্বর গেছে।'

'নন্তুদা বিয়ে করেছে না কি?'

'হ্যাঁ।'

'বড় ভাল মেয়ে। ধর্মকর্মে এই বয়সেই অসীম একাগ্রতা। এসে একদিন দেখা ক'রে যাস। আসবি তো?'

'অ্যাঁ?—হ্যাঁ। আসব, নিশ্চয়ই আসব।'

অদৃশ্য ঝরনার প্রতি একটা নমস্কার নিবেদন ক'রে বেরিয়ে এলাম হরিশ মুখার্জি রোড থেকে। ট্যাক্সি নিলুম আবার। নিশীথকে বললুম, 'সওয়া ছটায় ডাক্তার সেনের ওখানে যেতে হবে। রিপোর্টটা দেখে আসি চল্।'

ডাক্তার সেন আমাকে দেখে অবাক হয়ে গেলেন। রিপোর্ট দেখতে আমি নিজেই চ'লে আসব, তিনি তা ভাবতে পারেন নি। তিনি তাই জিজ্ঞাসা করলেন, 'এই শরীর নিয়ে আপনার আসবার দরকার কি ছিল?'

'দরকার ছিল, ডক্টর সেন। আপনি কি বুঝতে পারছেন না, নিশীথ আর সাবিত্রী দুজনে মিলে আপনার বিজ্ঞানকে অস্বীকার করছে? এখন বলুন, এই দ্বিতীয় পরীক্ষায় দাগের বিস্তৃতি কতটা ধরা পড়ল?'

'কোন দাগই নেই, মিস বোস। টি. বি. আরোগ্য হয়েছে।'

একটা কনকনে ব্যথা বিদ্যুতের মত যেন আমার মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে এল। আবার এসে ট্যাক্সিতে উঠলুম। নিশীথ জিজ্ঞাসা করল, 'কি হ'ল দিদিমণি? সাবিত্রী ভাল আছে তো?'

'আছে। স্টেশনে যেতে হবে এবার। টিকিট কাটতে হবে।'

টিকিট কেটে লেক প্লেসে ফিরে এলুম। কলকাতার সবগুলো সীমান্তে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। হিন্দু-ভারতের শান্তি যেন অবিনশ্বর!

কাল রওনা হয়ে যাব কার্শিয়ংয়ে। জগদীশবাবু আমার জন্তে একটা বাড়ি কিনে রেখেছিলেন সেখানে। নিশীথকে বললুম সব গোছগাছ ক'রে নিতে। নিশীথ একটা চিঠি দিয়ে গেল আমাকে—আজকের ডাকে এসেছে চিঠিখানা।

চিঠিখানা খুললুম। টাইপ-করা চিঠি। বাড়ির মালিক আর জগদীশবাবু নেই। অন্য এক ঠিকানায় ভাড়া পৌঁছে দেবার আদেশ দিয়েছেন নতুন বাড়িওয়ালা।

বাইরের দিকে বারান্দায় এসে দাঁড়ালুম আমি। পায়চারি করতে লাগলুম। নিশীথকে ডেকে একবার কেবল জিজ্ঞাসা করলুম, 'সাবিত্রী ভাল হ'ল কি ক'রে?'

'ভগবানের দয়ায়।'

'বাজে কথা বলছিস, নিশীথ। কোনও দৈব ওষুধ খাইয়েছিলি নাকি?'

'শপথ ক'রে বলছি, তোমার ইন্‌জেকশন ছাড়া অন্য কোন ওষুধের নাম আমি জানি না। আমায় বিশ্বাস করছ না, দিদিমণি?'

'তোকে অবিশ্বাস করতে পারলে বেঁচে যেতুম। কিন্তু অবিশ্বাস করতে পারছি কই? সাবিত্রী বাঁচে তা তো আমি চাই নি।'

'সাবিত্রী বাঁচে তাই তো তুমি চেয়েছ।'

'তুই নিজে কি চেয়েছিলি, নিশীথ?'

'আমি সাবিত্রীকে ভালবাসতে চেয়েছিলাম, দিদিমণি।'

অস্বীকার করতে পারলুম না আমি। অস্বীকার করার উপায় ছিল না। সাবিত্রীর চরমতম কষ্টের সময় নিশীথ ছুটে এসেছে আমার কাছে। অনুরোধ করেছে—'দিদিমণি, ওষুধ দাও ওকে। দম আটকে

যাচ্ছে।' ওষুধ আমি ওকে দিই নি। চরমতম কষ্টের অভিজ্ঞতা কেবল আমারই একচেটিয়া হবে কেন, সাবিত্রীও তার অংশ নিক। হতাশ হয়ে নিশীথ ফিরে গেছে আমার ঘর থেকে। আমার দৃষ্টি ওর পিছু পিছু ছুটেছে। আমি দেখেছি, নিশীথ ভেঙে পড়ে নি। দুর্বলতাকে জয় করল। তন্ময় হয়ে কি যেন ভাবতে লাগল ও। দিনের পর দিন তন্ময় হয়ে কার পেছনে ছুটল নিশীথ? বোধ হয় সবচেয়ে বড় ওষুধের দোকানটা খুঁজে বেড়াচ্ছিল সে। দোকানটা কি খুঁজে পেল ও?

রাত গভীর হয়ে এসেছে। আমার তিনতলার বারান্দা থেকে লেক প্লেসের গোটা রাস্তাটাই দেখা যাচ্ছে। কাল এই সময়ে আমি কার্শিয়াংয়ের পথে।

রত্না, আজকের নির্জনতা এক নতুন বিস্ময়। আমার দিকে কেউ নেই। কাউকে আমি চাইও নি। কিন্তু তোদের অশান্তি ছিল আমার নিত্যসঙ্গী। বড়মামার ব্যর্থতা আমার শক্তি যুগিয়েছে। ছোটমামার উঁচু মাথা নীচু হতেও দেখলাম। তাঁর মিথ্যে জগতটা আমারই চোখের সামনে ভস্মীভূত হ'ল। কী উল্লাসেই না সেই ভস্ম আমি সংগ্রহ ক'রে রেখেছিলাম! যেদিন তাঁকে চেক কেটে টাকা দিয়েছিলাম, সেদিন তাঁর বিপদের কথা ভেবে অস্থির হয়ে উঠি নি। আমি—কেবল আমিই যে তাঁকে রক্ষা করবার ক্ষমতা রাখি, সেই প্রত্যয় নিয়েই আমি ছুটে গিয়েছিলাম তাঁর আলিপুরের বাড়িতে।

রত্না, তোর অশান্তির মধ্যেও আমার শান্তির বিশল্যকরণী লুকনো ছিল। আমার গোপন সুখের এতগুলো উপকরণ কোথায় যেন সব মিলিয়ে গেল আজ। সবগুলো সীমান্তেই দেখে এলুম নতুন ভবিষ্যতের বীজ বপন করা হচ্ছে। কেবল আমার নিজের সীমান্তটাই সমাধির শান্তি দিয়ে সমাচ্ছন্ন। আমার গোপন সুখের মূল কেউ দেখতে

পায় নি। দেখতে পেয়েছিল কেবল ভবতোষ—তোর স্বামী, ভবতোষ ঘোষ।

আজও আমার বিদ্রোহের পরিসমাপ্তি ঘটল না। এ বিদ্রোহের শুরুটা জানিস? আমার মায়ের দেহটা যেদিন কেষ্টনগরের শ্মশানে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল, সেদিন আমি বাড়ি ফিরে গিয়েছিলাম বিদ্রোহের আগুন সঙ্গে নিয়ে। কেষ্টনগরের শ্মশান নিবে গিয়েছে বহুদিন আগে, আমার শ্মশান আজও নিবল না।

ভবতোষ আমার শ্মশান-বন্ধু। ও ছাড়া দুটো শ্মশান কেউ দেখতে পায় নি। আমি আশা করেছিলুম, সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে আমি সাধনাও করেছিলুম যে, তোদের দুজনের মধ্যে অশান্তি চিরস্থায়ী হোক। নইলে আমার বাঁচবার কোন পথ নেই।

পথ রইল না।

রাত শেষ হয়ে আসবার কথা। কিন্তু অন্ধকার যেন আরও বেশী গভীর হয়ে আসছে। রাস্তার আলোগুলোতেও বুঝি আর আলো নেই। সারা কলকাতা অন্ধকারে নিমজ্জিত হ'ল। সামনের দিকে চেয়ে দেখি, শূন্যতার আয়তন ক্রমশ বেড়েই যাচ্ছে। নিশীথ কই?

শূন্যতার বৃহত্তম মহাসাগরের মাঝখানে কেবল ক্ষুদ্রতম একটা দ্বীপ সগর্বে মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। দ্বীপটি কি ভালবাসার?

আমায় তোরা ক্ষমা করিস, রত্না। ইতি—"

॥ শূন্যতার সমাধি ॥

আজ তিন দিন হ'ল চিঠি লেখা শেষ করেছেন মিস জয়া বসু। শেষ করবার পরে তিনটে দিন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিলেন তিনি। মস্ত বড় কাজ তাঁর শেষ হয়েছে। জীবনের সবচেয়ে বড় কর্তব্য কাজটি যে মৃত্যুর পূর্বে শেষ ক'রে যেতে পারবেন তেমন নিশ্চয়তা তিন দিন আগেও তাঁর ছিল না। তিন দিন আগে তাঁর শরীরের অবস্থা এত খারাপ হয়ে পড়েছিল যে তিনি ভেবেছিলেন, রত্নাকে বুঝি সব কথা বলা হ'ল না।

আজ বেশ বেলাতেই ঘুম ভাঙল কুমারী জয়া বসুর। মনটা হাল্কা লাগছে। খুবই হাল্কা। ঘুম ভাঙবার পরে হঠাৎ তিনি নিজের কাছেই প্রশ্ন করলেন, রত্নার কাছে চিঠি লেখবার প্রয়োজন ছিল কি ?

জীবনের মেয়াদ তাঁর ফুরিয়ে এসেছে। ডাক্তার প্রধানের উপদেশ তিনি মনোযোগ দিয়ে শোনেন বটে, কিন্তু বিশ্বাস করেন না। ঘড়ির দিকে চেয়ে জয়া বসু হাসবার চেষ্টা করলেন একবার। সময় ফুরিয়ে এল। ডাক্তার প্রধানের চিকিৎসা-বিজ্ঞান তাঁর আয়ুর সীমান্তে এসে সাদা নিশান্ উড়িয়েছে। জীবনের শেষ-মুহূর্তটিকে বিলম্বিত করবার সাধ্য নেই কারও। তবে তিনি সতেরো রাত্রি সময় খরচ ক'রে চিঠিখানা লিখলেন কার জন্যে ?

রত্নার জন্যে। জয়া বসু ম'রে যাচ্ছেন বটে, কিন্তু রত্নাকে তো বাঁচতে হবে। বোধ হয় চিঠিখানার মধ্যে বাঁচবার পথ তিনি তৈরি ক'রে রেখে গেলেন। শুধু বাঁচবারই, আর কিছু নয়। সেদিনের সেই মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার পরে রত্না নিশ্চয়ই পথটা দেখতে পাবে। টালিগঞ্জের রঙ্গমঞ্চে আগুন না লাগলে জীবনের রঙ্গমঞ্চটা সে দেখতে পেত না। এবার সে পৃথিবীর বৃহত্তম রঙ্গমঞ্চটা দেখছে। মানব-জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলো যে কত সহজে সেখানে পুড়ে ছাই হয়ে

যাচ্ছে তাও বোধ হয় দেখতে পাবে রত্না। পাওয়া উচিত। নইলে চিঠিখানা তিনি লিখলেন কেন ?

ঘড়ির দিকে পুনরায় দৃষ্টি ফেললেন জয়া বসু। এগারোটা বাজে। সকালের চা-ও তাঁর খাওয়া হয় নি। নিশীথ কিংবা সাবিত্রীকে তিনি দেখতে পেলেন না। চিঠির কাগজগুলো বিছানার ওপর প'ড়ে ছিল। জয়া বসু গুছিয়ে রাখলেন সব। গুছতে গিয়ে আবার তাঁর মনে পড়ল রত্নার কথা। রত্নার জন্যেই, শুধু রত্নার উপকারের জন্যেই চিঠিখানা তাঁকে লিখতে হ'ল। অহংকার করবার মত মানুষ যে এক পয়সার ঐশ্বর্য নিয়ে জন্মাতে পারে নি, তেমন বিশ্বাস ওর হয়েছে কি ? কথাটা ভাবতে ভাবতে তন্দ্রা এল জয়া বসুর।

সকালের দিকে ফাদার হেনরি এসেছিলেন জয়া বসুকে দেখবার জন্যে। সাবিত্রীর কাছে খবর পেলেন যে, মিস বোস তখনও ঘুমচ্ছেন। তিনি অপেক্ষা করতে পারলেন না। ক্যাসকের পকেট থেকে ঘড়ি বার ক'রে তিনি সময় দেখলেন। তারপর সাবিত্রীকে বললেন তিনি, "মিস বোসকে বলবেন, আমি পরে আবার আসব। কেমন আছেন তিনি ?"

"বুঝতে পারছি না। তিন দিন থেকে তো শুধু ঘুমচ্ছেন। ডাক্তার সাহেব তাঁর বুকের ফোটো নিয়ে গেছেন। তিনি কি আপনাকে কিছু বলেন নি ?"

"বলেছেন—বলেছেন—আচ্ছা, আমি পরে আবার আসব।"

এগারোটার একটু পরেই এলেন ডাক্তার প্রধান। তিনিও এসে শুনলেন, মিস বোস তখনও শয্যা ত্যাগ করেন নি, ঘুমচ্ছেন। চা খাওয়ার জন্যে সাবিত্রীকে ডাকেন নি। ব্যাগটা হাতে নিয়ে ডাক্তার প্রধান চ'লে এলেন বাড়ির ভিতরে। ঢুকে পড়লেন ড্রইং-রুমে। হাতের ব্যাগটা সাবিত্রী নিতে চাইল। মাথা নেড়ে তিনি বললেন, "এখানেই

একটু বসি। ঘুম থেকে তাঁকে তোলবার দরকার নেই। নিশীথকে দেখছি না যে?"

"তিনি একটু ব্যস্ত আছেন।"—বলল সাবিত্রী।

মেঝের ওপর ব্যাগটা নামিয়ে রেখে ডাক্তার প্রধান জিজ্ঞাসা করলেন, "ব্যস্ত? তাকে তো আমি পরশু দিনও দেখতে পাই নি? বাইরে কোথাও গেছে নাকি?"

"না। বাড়িতেই আছেন।"

"বেশ বেশ, আমি বসছি।"

"আপনি কি চা খাবেন?"

"খাব। ধন্যবাদ। কিন্তু মিস বোসকে একবার পরীক্ষা করা দরকার। মানে, এত বেলা অবধি ঘুমনো খুবই অস্বাভাবিক।"

"পরশু যে একটা ছবি তুললেন তার কি হ'ল?"—প্রশ্ন ক'রে ডাক্তার প্রধানের দিকে চেয়ে রইল সাবিত্রী। জবাব দিলেন না ডাক্তার প্রধান। তিনি শুধু বললেন, "মিস বোস উঠেছেন কি না একবার দেখে এলে ভাল হয়। চা খাওয়ার আমার দরকার নেই।"

"দু মিনিট লাগবে।"

"না, থাক্। স্যানাটরিয়াম থেকে বেরোবার আগে আমি চা খেয়েই বেরিয়েছি।"

ডাক্তার প্রধান বসে রইলেন ড্রইং-রুমে। সাবিত্রী পা টিপে টিপে এসে দাঁড়াল জয়া বসুর ঘরের সামনে। দরজাটা ভেজানো ছিল। বাইরে দাঁড়িয়েই সে নীচু স্বরে ডাকল, "দিদিমণি, দিদিমণি—"

"কে রে? সাবিত্রী?"

"হ্যাঁ, আমি দিদিমণি।"

"ভেতরে আয়।"

ভেতরে এসে সাবিত্রী জিজ্ঞাসা করল, "আজ কেমন আছ?"

"ভাল নেই।"

"কেন? কি হয়েছে?"—সাবিত্রী এগিয়ে এল জয়া বসুর কাছে। বুকের ওপর থেকে লেপটা আলগা ক'রে তুলে ধ'রে জয়া বসু বললেন, "ছুটো দিকই প'চে গেছে। এখানে আর কিছু নেই। কি ক'রে যে বেঁচে রয়েছি তাই ভাবছি। হ্যাঁ রে সাবিত্রী, নিশীথ কোথায় রে? অনেক দিন থেকে ওকে দেখতে পাচ্ছি নে! ও কি বাড়ি নেই?"

"আছেন। ডেকে দেব?"

"না, থাক্। সাবিত্রী—"

"দিদিমণি—"

জয়া বসু চেয়েছিলেন সাবিত্রীর মুখের দিকে। পাহাড়ের হাওয়ায় ওর স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়েছে। পনেরো দিন আগেও সাবিত্রীকে দেখে বলা যেত যে, সে অসুস্থ। আজকে ওর সুস্থতা সারা দেহে ছড়িয়ে পড়েছে। মিস জয়া বসু জিজ্ঞাসা করলেন, "এখানে এসে শরীরটা তোর ভাল হয়েছে তো রে?"

"হ্যাঁ, দিদিমণি। আমার কোন অসুখ নেই।"

"এত তাড়াতাড়ি সেরে উঠলি কি ক'রে?"

"উনি বলেন, পাহাড়ের জল আর হাওয়া খুব ভাল।"

"এই বয়সে শুধু জল আর হাওয়া খেয়ে কেউ স্বাস্থ্য এত ভাল করতে পারে না। সাবিত্রী, তোদের শোবার-ঘরের চাল দিয়ে নাকি জল পড়ে?"

"হ্যাঁ, পরশু রাত্রে তো বিছানাটা ভিজে গিয়েছিল।"

"সারা রাত তা হ'লে কি করলি?"

জবাব দিল না সাবিত্রী। মেয়েমানুষ ব'লেই সাবিত্রী জয়া বসুর মনের কথাটা বুঝতে পারল। আজকাল সে অনেক কথাই বুঝতে পারে। নিশীথের চলাফেরার দিকেও নজর রাখে সে। মাঝ-রাত্রিতে সেদিন নিশীথ দরজা খুলে বাইরে বেরুচ্ছিল। বিছানায় শুয়ে সাবিত্রী জিজ্ঞাসা করেছিল, "কোথায় যাচ্ছ?"

"দিদিমণিকে একটু দেখে আসি।"

"কেন ?"

"মনে হ'ল, দিদিমণি আমায় ডাকছেন।"

"তোমার যাওয়ার দরকার নেই। আমি যাচ্ছি।" বিছানা থেকে নেমে এসেছিল সাবিত্রী। ওর কথা শুনে নিশীথ সেদিন খুবই অবাক হয়েছিল বটে, কিন্তু মাঝ-রাত্রিতে জয়া বসুর ঘরে সাবিত্রী ওকে যেতে দেয় নি।

পাশ ফিরে শুয়ে জয়া বসু বললেন, "ঘরের চালটা একটু মেরামত ক'রে নিলেই তো হয়। নিশীথটা বুঝি আজকাল নেশাখোরের মত ঘুময় ?"

এবারও কোন জবাব দিল না সাবিত্রী। মাথা নীচু ক'রে দাঁড়িয়ে রইল সে।

জয়া বসু ধীরে ধীরে বলতে লাগলেন, "আমি তো চললুম। লোভ করবার মত সময়ও আমার নেই। এই ঘরটাই তোরা ব্যবহার করিস। আমার সঙ্গে সঙ্গে বিছানাটাও ওরা পুড়িয়ে দেবে। সাবিত্রী, এই বাড়িটা আমি নিশীথের নামে লিখে দিয়েছি। জানিস তুই ?"

"না। দিদিমণি, তুমি ভাল হয়ে উঠবে।"

"আমার কথা আমার চেয়ে বেশী আর কেউ জানে না। এমন কি তোদের ভগবান পর্যন্ত আমার মৃত্যুকে এক মিনিটের জন্যেও ঠেকিয়ে রাখতে পারবেন না। যাক্‌, এসব কথা তুই বুঝতে পারবি না। এই ঘরটাকে তোরা শোবার-ঘর করিস। আমার কথা মাঝে মাঝে মনে পড়বে কি ?"

"পড়বে, দিদিমণি।"

মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন জয়া বসু। হাসির অর্থ সাবিত্রী ঠিক বুঝতে পারে নি। জয়া বসু একটু পরেই বললেন, "বাঁ দিকটাতেই বড্ড বেশী কষ্ট পাচ্ছি। হ্যাঁ রে, আজ কি ডাক্তার সাহেব আসেন নি ?"

"এসেছেন। তিনি বাইরের ঘরে ব'সে আছেন।"

"এখানেই তাঁকে ডেকে নিয়ে আয়।"

একটু বাদেই ডাক্তার প্রধান এসে ঢুকলেন জয়া বসুর ঘরে। ব্যাগটা ফেলে রাখলেন টিপয়ের ওপরে। ঝুঁকে ব'সে জিজ্ঞাসা করলেন, "কেমন আছেন আজ?"

"ভাল নেই।"

"কি কি অসুবিধে হচ্ছে আমায় সব খুলে বলুন।"

হেসে ফেললেন জয়া বসু।

ডাক্তার প্রধান জিজ্ঞাসা করলেন, "হাসছেন যে?"

"বিদায় নেবার আগে একটু হাসি পেল।"—ডাক্তারের দিকে পাশ ফিরে শুয়ে জয়া বসুই বললেন, "অসুবিধেগুলোর সংখ্যা এত বেশী যে, একটা একটা ক'রে বলতে গেলে দম আমার ফুরিয়ে যাবে। আপনি ব্যস্ত হবেন না, ভাল ক'রে বসুন। চা খেয়েছেন আপনি?"

"এই তো স্যানাটরিয়াম থেকে খেয়ে এলুম।"—ডাক্তার প্রধান ব্যগ্রভাবে স্টেথেসকোপটা দু কানের মধ্যে গুঁজে দিয়ে বললেন, "আসুন, একটু পরীক্ষা ক'রে দেখি।"

"পরীক্ষা দেওয়ার মত আমার আর স্বাস্থ্য নেই।"

"আছে, আছে, মিস বোস। নিরাশ হবেন না।"

"জীবনে কোন আশাই আর আমার নেই। আমি শুধু উপস্থিত-মুহূর্তটির মধ্যে সীমাবদ্ধ।"

আশা না থাকলে যে জীবন থাকে না তেমন সব যুক্তি দেখাবার জন্যে ডাক্তার প্রধান ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। কিন্তু জয়া বসু তাঁকে কোন কথা বলবারই সুযোগ দিলেন না। জিজ্ঞাসা করলেন, "ডাক্তার প্রধান, আপনার স্যানাটরিয়ামটার কি হ'ল? মানে, আপনার টাকার অভাব কি মিটল?"

"না। ভগবানের দয়া ছাড়া এটা বোধ হয় টিকবেও না।"

জয়া বসু জিজ্ঞাসা করলেন, "গভর্মেণ্টের কাছে টাকার সাহায্য চান না কেন? এত বড় ব্যাপারে ভগবানের ওপর নির্ভর করা কি ঠিক?"

"তবুও নির্ভর করতে হয়, মিস বোস।"—কানের ফুটো থেকে স্টেথেসকোপের দুটো প্রান্ত টেনে বার ক'রে ডাক্তার প্রধানই আবার বললেন, "ভগবানের দয়া না থাকলে জগতের কোন কিছুই টেকে না। মানুষের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ।"

"আমার দ্বারা আপনার হয়তো খানিকটা উপকার হতে পারে। ভাবছি, আপনার স্যানাটরিয়ামে আমি উঠে যাব। আমি টাকা দিয়েই থাকব। ও কি, উঠছেন না কি?"

"না।"—ডাক্তার প্রধান উল্টো দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে ঘড়িতে সময় দেখে নিয়ে বললেন, "আজ একটু তাড়াতাড়ি ফিরব। একজন রোগীর অবস্থা খুব ভাল নয়। কাল সারারাত সে চেঁচিয়েছে। আজও তার কষ্ট কিছু কমে নি। মিস বোস, এখানে ব'সে ব'সেই আমি যেন স্যানাটরিয়ামের আর্তনাদ শুনতে পাচ্ছি।"

ক্লান্ত সুরে জয়া বসু বললেন, "শুধু স্যানাটরিয়াম থেকে নয়, আর্তনাদ আসছে প্রতিটি জীবন থেকেই। ডাক্তার প্রধান—"

"বলুন।"

জয়া বসু মনের কথা সব গুছিয়ে নিচ্ছিলেন। কথাগুলো তাঁকে সংগ্রহ ক'রে আনতে হচ্ছে বহু দূর থেকে। অভিজ্ঞতার ব্রহ্মাণ্ডটি তাঁর ছোট নয়। একটু পরেই তিনি বলতে লাগলেন, "একজন মাতাল শুঁড়িখানায় মদ খেয়ে বুঁদ হয়ে আছে। আর অন্য একজন মানুষ বিলেতে দশ নম্বর ডাউনিং স্ট্রীটে রাজনীতির তাড়ি পান করছেন দিন-রাত। এদের দুজনের মধ্যে কোন পার্থক্য আপনি দেখতে পাচ্ছেন কি?"

ডাক্তার প্রধান একটু ভেবে নিয়ে জবাব দিলেন, "পাচ্ছি।"

"আমি পাচ্ছি না। মানবজীবনের পরিণতির কথা যদি ভাবেন

তা হ'লে দেখবেন, দুজনের মধ্যে সত্যিই কোন পার্থক্য নেই। বরং শুঁড়িখানার নির্জনতায় মাতালটির শান্তি অনেক বেশী। এমন কি আপনার যে স্যানাটরিয়ামটি, যার জন্যে সারাটা জীবন আপনি হা-হুতাশ ক'রে কাটিয়ে দিলেন, তারও পরিণতি হবে শূন্যতা। যে আর্তনাদ আপনি এখানে ব'সে শুনতে পাচ্ছেন তা তো সেই শূন্যতা-স্বীকৃতিরই সংগ্রাম। অস্তিবাদীর দৃষ্টিতে মানবজীবনের সবটুকু ফাঁকিই আজ ধরা পড়েছে। আপনিও তা ধরতে পারবেন যদি স্যানাটরিয়ামকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে ভগবানের দয়া প্রার্থনা না করেন। ডাক্তার প্রধান, কোন কিছু বাঁচিয়ে রাখবার ক্ষমতা ভগবানের নেই।"

"তবুও তাঁর দয়া ছাড়া একটা মুহূর্তও বাঁচতে পারছি না।"

"আমি পারছি।"—একটা বেশ বড় রকমের দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে জয়া বসু বললেন, "প্রায় তেত্রিশটা বছরই বেঁচে রইলুম।"

"শুধু নিশ্বাস নেওয়াকে আমি বাঁচা বলি নে। আপনার কোন দোষ নেই, মিস বোস। গোটা বিংশ শতাব্দীটাই বুঝি মরণের তপস্যা করছে।"

"এ কথা কেন বলছেন, ডাক্তার প্রধান? আপনি নিজেও তো বিংশ শতাব্দীরই মানুষ?"

প্রশ্ন শুনে ডাক্তার প্রধান বিব্রত বোধ করলেন না। যুক্তির জাল বোনবার জন্যে তিনি যেন আরও বেশী গম্ভীর হয়ে উঠলেন। তিনি বলতে লাগলেন, "মানুষ যখনই ভগবানের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে গেছে তখনই মরেছে।"

"কি রকম?"—জয়া বসুর উৎসাহ বাড়ল।

ডাক্তার প্রধান বলতে লাগলেন, "শিল্পী ভাবছেন, শিল্পই তাঁর ভগবান। রাজনীতিজ্ঞ ভাবছেন, ভগবানকে বাদ দিয়ে তিনি রাষ্ট্র গড়বেন। কবির কাছেও ভগবানের স্থানটি দখল করেছে তাঁর কবিতা। এমন কি আপনার জীবনদর্শনটি পর্যন্ত ভগবানের প্রতিদ্বন্দ্বী। মিস

বোস, কোন কিছুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে মানুষ যখন নিঃসন্দেহ হয় তখন তার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হবে তাকে ধ'রে রাখা। জীবনের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও এই কথাটি খাটে। ধ'রে রাখবার প্রবৃত্তি থেকে আসে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা। শাশ্বত জীবনের জন্যে যে মানুষ সাধনা করে তার প্রেরণা আসে ওই আকাঙ্ক্ষা থেকেই। কিন্তু আপনার বিশ্বাস, আপনার অস্তিত্ব শুধু আপনার নিজেরই। জগতের সব কিছু থেকে তা আলাদা এবং যোগাযোগশূন্য। একজন খেলোয়াড়ের পায়ের কাছে একটা চামড়ার ফুটবল যতটুকু করুণা পায়, আপনার অস্তিত্ব আপনার কাছে ততটুকু করুণাও পেল না। মিস বোস—"

জয়া বসু বাধা দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কি আমায় নতুন ধর্মে দীক্ষিত করবার চেষ্টা করছেন?"

"না।"

"তা হ'লে আমার এক্স-রে প্লেটে কি দেখলেন তাই বলুন। হাতে ওটা কি আপনার?"

"রিপোর্ট।"

"বলুন, ওতে কি আছে আমি শুনতে চাই। ভয় পাচ্ছেন না কি? প্রফেশনাল লোকদের আবার ভয় কি? অবস্থা আমার—"

কথাটা শেষ করলেন না জয়া বসু। বোধ হয় শেষ করতে পারলেন না। বুকের যন্ত্রণা ক্রমশই বাড়ছে। নিশ্বাস টানতে গিয়ে বুঝতে পারছেন, ঘরের মধ্যে হাওয়ার পরিমাণ কম। জয়া বসু ছটফট করতে লাগলেন। ডাক্তার প্রধান স্টেথেসকোপটা পুনরায় কানে লাগিয়ে এগিয়ে এলেন বিছানার কাছে। বললেন তিনি, "এদিকে একটু স'রে আসুন তো।"

"আমায় আপনি ক্ষমা করুন। ডাক্তার প্রধান, আপনাদের সবার কাছেই আমি কৃতজ্ঞ। অনেক তো করলেন—।" এই পর্যন্ত ব'লে জয়া বসু সহসা চিৎকার ক'রে উঠলেন, "নিশীথ—নিশীথ কোথায় গেল?"

ডাক্তার প্রধান উদ্বিগ্নভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, "খুব বেশী খারাপ বোধ করছেন কি ?"

"খুব বেশী—আজ তিন দিন থেকে নিশীথকে দেখছি না কেন ?"

জয়া বসুর চিৎকার শুনে সাবিত্রী ছুটে এল। এসে জিজ্ঞাসা করল, "কি হয়েছে, দিদিমণি ?"

ডাক্তার প্রধানই জবাব দিলেন, "না, ভয়ের কোন কারণ নেই। বড্ড বেশী কথা বলছিলেন কিনা।"

জয়া বসুর কাছে গিয়ে দাঁড়াল সাবিত্রী। একটু পরেই জয়া বসু সাবিত্রীর দিকে চেয়ে বললেন, "আমি একটু একা থাকতে চাই। হ্যাঁ রে, আমার কাছ থেকে নিশীথ পালিয়ে গেল কেন ?"

"ডেকে দেব ?"

"না, থাক্। ডাক্তার সাহেব কি চ'লে গেলেন ?"

"না, আমি আছি। কোন ভয় নেই, মিস বোস।"

"আপনি এবার যান। আমার চেয়েও কি খারাপ রোগী আপনার হাতে নেই ? তাদের কাছে আপনি যান, ডাক্তার প্রধান।"

"আপনাকে একটা ইনজেকশন দিয়ে তবে যাব।"—এই ব'লে তিনি ব্যাগটা খুললেন। প্রতিবাদ করলেন না জয়া বসু। হাসলেন একটু।

ইনজেকশন দেওয়ার আগে অমিতাভ এল। ক্রাচটা বিছানার সঙ্গে ঠেকিয়ে রেখে অমিতাভ ব'সে পড়ল জয়া বসুর পাশেই। জিজ্ঞাসা করল, "কেমন আছ ?"

"ভাল নেই। আমার চারদিকে শূন্যতার কী সমারোহ। অমিতাভ, দেখতে পাচ্ছ ?"—

"পাচ্ছি।"

"বোম্বে থেকে তোমার জাহাজ ছাড়বে কবে ?"

"আমি পরের জাহাজে রওনা হব।"

মুহূর্ত কয়েক চুপ ক'রে রইলেন জয়া বসু। তার পরে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "তবু যাবে? ভারতবর্ষকে ভালবাসতে পারলে না? অমিতাভ—"

"বল।"

"ফরাসী দেশে ফিরে গিয়ে স্বাধীন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কি বলবে?"

"বলব, ভারতবর্ষ কোনদিনও পরাধীন ছিল না।"

দম ফুরিয়ে আসছিল জয়া বসুর। বোধ হয় একটু বাদেই অক্সিজেন দেওয়ার দরকার হবে। পুনরায় তিনি কথা বলবার চেষ্টা করতেই অমিতাভ বলল, "এখন থাক্, পরে শুনব। একটু বিশ্রাম ক'রে নাও।"

"পরে আর বলবার সময় পাওয়া যাবে না। অমিতাভ, তুমি কি গান্ধীজীকে দেখেছ?"

"দেখেছি।"

"গান্ধীজী আমাদের, ভারতবর্ষের তিনি বাপুজী। তাঁর সম্বন্ধে কি বলবে দেশে ফিরে?"

"বলব, তিনি সারা পৃথিবীর বাপুজী।"

ডাক্তার প্রধান ইনজেকশন দেবার জন্যে এগিয়ে এলেন বিছানার কাছে। তাঁর দিকে চেয়ে জয়া বসু বললেন, "যতটুকু সময় আর বেঁচে আছি আপনার কথা আমার মনে থাকবে। আপনি আমার উপকার করতে চাইছেন, তাও বুঝি। কিন্তু আজ ওটা থাক্।"

সিরিঞ্জটা হাতে নিয়ে ডাক্তার প্রধান স'রে গেলেন টিপয়ের দিকে।

মুহূর্তের জন্যে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন জয়া বসু। ঘুম ঠিক নয়, সংজ্ঞাশূন্যতা। অমিতাভ একটু ঝুঁকে বসল। হঠাৎ এক সময় জয়া বসু জিজ্ঞাসা করলেন, "অমিতাভ, সেদিন তুমি যেন কি চেয়েছিলে আমার কাছে?"

জবাব দিল না অমিতাভ সেন। তিনি নিজের মনেই বলতে লাগলেন, "আমার মুখোশটা তুমি ভিক্ষা চেয়েছিলে। ভবতোষও নাকি

আমার মুখোশটা দেখতে পেয়েছিল। কিন্তু সে তো এমনি ক'রে আমার কাছে কোন কিছুই ভিক্ষে চায় নি? আশ্চর্য! অমিতাভ—"

"জয়া—"

হঠাৎ চোখের সামনে মধ্যপ্রাচ্যের একটা চিত্র ভেসে উঠল। বধ্যভূমির চিত্র। প্রায় দু হাজার বছরের পুরনো একটা পেরেক লম্বা হয়ে এগিয়েও এল জয়া বসুর বুক পর্যন্ত। তাঁর পচা ফুসফুসে বিঁধে গেল পেরেকের মুখ।

"খুব কি বেশী যন্ত্রণা হচ্ছে, জয়া?"

"যন্ত্রণা! কিচ্ছু না। দু দিকের সেই চোর দুটোর কথা ভাবছি। তুমি তো শিল্পী। চোর দুটোকে পেরেকের মুখ থেকে উদ্ধার করতে পার? আমি জানি, তুমি পারবে না। তোমার রক্তে রোমান কাথলিক মায়ের সংস্কার রয়েছে। তোমাদের সংস্কার পৃথিবীর কোন সংস্কারের সঙ্গেই মেলে না। কারণ—।" জয়া বসু শাড়ির আঁচল দিয়ে মুখ মুছলেন। কষ বেয়ে রক্ত পড়ছিল। অমিতাভ তার পকেট থেকে রুমাল বার ক'রে এগিয়ে ধরল জয়া বসুর দিকে। ওর কাটা হাতের দিকে চেয়ে জয়া বসু বললেন, "না, থাক্, ধন্যবাদ।" অসমাপ্ত আলোচনা শেষ করবার জন্যেই তিনি আবার বললেন, "কারণ তোমাদের সংস্কার হচ্ছে ইতিহাসের অংশ। সেই জন্যেই শুধু ভগ্‌মা ব'লে একে হেসে উড়িয়ে দিতে পারলুম না।"

"জয়া, ফাদার হেনরী এসেছেন তোমায় দেখতে।"—বলল অমিতাভ। এপাশ ফিরে জয়া বসু বললেন, "নমস্কার, ফাদার। আমি তো চললুম।"

"চিকিৎসা তো করতে দিলেন না।"

"ডাক্তার প্রধান কী চিকিৎসা করবেন? তিনি তো অ্যামেচার।"

"তবে?" ফাদার হেনরী মন্তব্যটির মর্মার্থ ঠিক বুঝতে পারেন নি। তাঁকে বুঝিয়ে দেবার জন্যেই যেন জয়া বসু সরল ভাষায় বললেন,

"চিকিৎসা তো সব আপনাদের হাতে।···নিশীথ—নিশীথ কোথায় গেল ? ওকে কেন দেখতে পাচ্ছি না ?"

বুকের তলা থেকে তাঁর রক্ত ঠেলে উঠছিল। উঠলও।

কুমারী জয়া বসু এবার থেমে থেমে বলতে লাগলেন, "চিকিৎসা আরম্ভ করুন, ফাদার। প্রতিবাদের ভাষাও আমার লুপ্ত হ'ল।"

ফাদার হেনরী গম্ভীর সুরে বললেন, "চিকিৎসার দায়িত্ব নিশীথের।"

"তবে আপনি এখানে আসেন কেন ?"

"স্বধর্মীর সংখ্যা বাড়াতে নিশ্চয়ই নয়।"

"আমায় ক্ষমা করবেন, ফাদার। অমিতাভ—"

"জয়া—"

"এখন কটা বেজেছে ?"

"একটা, বেলা একটা।"

"উঃ! মনে হচ্ছে রাত যেন কত !!"

ঝিমিয়ে পড়ছিলেন কুমারী জয়া বসু। সাবিত্রী বিছানাটা তাঁর পরিষ্কার ক'রে দিল। অপরিষ্কার চাদরটা আলগা ভাবে টেনে বার ক'রে নিল সে। সাবিত্রীকে সাহায্য করল অমিতাভ সেন।

চেতনা ফিরে এল জয়া বসুর। সাবিত্রীকে সামনে দেখতে পেয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "কে ? সাবিত্রী ? নিশীথকে একবার ডাক্ না দেখি। সে কি আমার কাছে আর কাজ করে না ? কে এল রে ?"

"কই, কেউ না।"

ডাক্তার প্রধান এগিয়ে এসে জয়া বসুর হাতটা তুলে নিলেন নিজের হাতে। নাড়ির অস্তিত্ব পরীক্ষা করতে লাগলেন তিনি। জয়া বসু বললেন, "আপনার ওপরেই এখন সবচেয়ে বড় দায়িত্ব রইল। আমার মৃত্যু ঘোষণা করবার ক্ষমতা আর কারও নেই। অমিতাভ—"

"জয়া—"

"হঠাৎ এমন সময়ে গির্জা থেকে ঘণ্টা বাজার আওয়াজ আসছে কেন? কেউ মরল না কি?"

জবাব দিল সাবিত্রী, "গির্জা থেকে নয়, দিদিমণি। উনি ঘণ্টা বাজাচ্ছেন।"

"কেন?"

"উনি পুজো করছেন।"

জয়া বসুর নিস্তেজ চোখেও প্রতিবাদের ভঙ্গি। তিক্ততার সুরে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "এ কদিন নিশীথ তা হ'লে পুতুলপুজো করছিল?"

খুব আগ্রহের সুরে জবাব দিল সাবিত্রী, "হ্যাঁ, দিদিমণি।"

"বিশ্বাসঘাতক!"—গর্জন ক'রে ওঠবার চেষ্টা করলেন জয়া বসু: "বিশ্বাসঘাতক! ওর তো শুধু মানুষের সেবা করার কথা ছিল। বেইমান! নিজের ধর্ম হারিয়ে ফেলেছে নিশীথ। অমিতাভ—"

"জয়া!"

"বাইরে থেকে কে ডাকছে? কেউ এল নাকি?"

"টেলিগ্রাম-পিওন।"

"কার টেলিগ্রাম এল? কোথা থেকে এল? আবার কোন্ দিকে কার বিপদ ঘটল, অমিতাভ?"

"ফাদার হেনরী গেছেন দেখতে। তুমি হাঁপিয়ে পড়েছ। আর কথা ব'লো না, জয়া।"

একটা টেলিগ্রাম হাতে নিয়ে ফাদার হেনরী এসে ঘরে ঢুকলেন। মাথাটা এক দিকে হেলিয়ে দিয়ে জয়া বসু জিজ্ঞাসা করলেন, "ও কার টেলিগ্রাম, ফাদার?"

"ভবতোষের।"

"ওরা ভাল আছে তো?"

"হ্যাঁ। ওরা আজই এসে এখানে পৌঁছবে। এতক্ষণে পৌঁছনো উচিত ছিল। বোধ হয় ট্রেন আজ খুবই লেট ক'রে আসছে।"

"তা হ'লে!"—শাড়ির আঁচল দিয়ে মুখ মুছে জয়া বসু বললেন, "ওদের কেন ডাকতে গেলেন, ফাদার? ওরা আ-মা-র কে?"

চোখ বুজলেন জয়া বসু। নিশীথ এসে দাঁড়াল তাঁর বিছানার কাছে। হাতে ওর একটা শ্বেত পাথরের গেলাস। সবাই নিশীথকে দেখছিলেন। প্রত্যেকের চোখে বিস্ময়! ফাদার হেনরী শুধু মৃদু মৃদু হাসছিলেন। ডাক্তার প্রধান গেলাসের ওপরে একটু ঝুঁকে দাঁড়ালেন। গেলাস-ভর্তি জল। জলের ওপরে গোটা কয়েক ফুলের পাপড়ি ভাসছে।

বিছানার সঙ্গে ঘেঁষে দাঁড়িয়ে নিশীথ ডাকল, "দিদিমণি, দিদিমণি—"

"কে?"—চোখ খুললেন জয়া বসু: "কে? ও, পুরুত ঠাকুর! এবার আর জিততে পারলি নে। আমি সাবিত্রী নই। স'রে যা এখান থেকে।"

নিশীথ এক ইঞ্চিও সরল না। অনুনয়ের সুরে সে বলল, "একটু চরণামৃত এনেছি। ঠাকুরের আশীর্বাদ।"

"তুই নিজে সবটা খেয়ে ফেল্।"

"তোমারই যে খাওয়া দরকার।"

"ছিঃ! নিশীথ, তুই না আমার সেবা করতে এসেছিলি?"

"তাঁর আশীর্বাদ এনেছি তোমারই সেবার জন্যে।"

"আমি এবার চললুম, আমাকে ধ'রে রাখবার আর কারও সাধ্য নেই।"

নিশীথ তবু গেলাসটা জয়া বসুর মুখের কাছে নিয়ে বলল, "দিদিমণি, নতুন জন্মের শুরুতে তাঁর আশীর্বাদ চাই। একটু হাঁ কর তো।"

জয়া বসু ক্ষীণসুরে ডাকলেন, "ডাক্তার প্রধান—"

"বলুন।"

"লোকটাকে এখান থেকে বার ক'রে দিন। ও বাইরে না গেলে আমি কিছুতেই মরব না।"

ডাক্তার প্রধান নিশীথকে বললেন, "বাইরে গিয়ে দাঁড়াও। রোগীর পক্ষে উত্তেজনা এখন মারাত্মক।"

নিশীথ গেল না। যাওয়ার জন্যে চেষ্টাও করল না সে। গেলাসটা জয়া বসুর ঠোঁটের ওপরে তুলে ধ'রে অপেক্ষা করতে লাগল। ডাক্তার প্রধান নিশীথকে ধমকে উঠলেন: "বাইরে গিয়ে তোমায় দাঁড়াতেই হবে।"

অসহায়ভাবে নিশীথ চেয়ে রইল ভাসমান পাপড়িগুলোর দিকে। গেলাসের জল টলমল করছে। ডাক্তার প্রধান এবার ওকে নিজেই ঠেলতে ঠেলতে ঘরের বাইরে নিয়ে এলেন। এসে বললেন, "এইখানে তুমি দাঁড়াও।"

তারপর ঘণ্টা দুই আর জয়া বসুর সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। ডাক্তার প্রধান তাঁর হাতের নাড়ি টিপে দাঁড়িয়ে রইলেন চুপ ক'রে। মাঝে মাঝে ইশারায় ঘোষণা করতে লাগলেন: মিস বোস এখনও বেঁচে আছেন।

দু ঘণ্টা বাদে আর একবার বুকের তলা থেকে রক্ত উঠে এল। জয়া বসু অস্ফুট স্বরে বললেন, "এখনও তা হ'লে বেঁচে আছি! এত বেশী অসুখ না হ'লে বুঝতেই পারতুম না যে, জীবনের মেয়াদ এত বেশী। অমিতাভ—"

"জয়া!"—অমিতাভ সেন এরই মধ্যে একটু দূরে স'রে গিয়েছিল। সে ভেবেছিল, জয়া বসুর জ্ঞান আর ফিরে আসবে না। সে আবার এসে বিছানার ওপর ব'সে পড়ল। ক্রাচটা ঠেকিয়ে রাখল টিপয়ের গায়ে। জিজ্ঞাসা করল, "একটু ভাল বোধ করছ কি?"

"হ্যাঁ। ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। ঘুমের মধ্যে কি দেখলুম জান?"

"না।"

"শুনবে, অমিতাভ?"

"বল।"

কুমারী জয়া বসু শ্রান্ত সুরে বলতে লাগলেন, "দেখলুম, সর্বব্যাপী শূন্যতার সমুদ্রে শুধু একটা দ্বীপ—কেবল একটা সত্য ভেসে উঠল। 'আমি' ছাড়া সত্যের দ্বিতীয় রূপ কিছু দেখতে পেলুম না। শুধু 'আমি'। কন্‌ক্রিট 'আই'। সানন্দচিত্তে আমায় এবার বিদায় দাও, অমিতাভ। বড্ড কষ্ট পাচ্ছি।"

নিশীথ তার গেলাসটা হাতে নিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকতে যাচ্ছিল। ঢুকেই পড়েছিল। কিন্তু পৌঁছতে পারল না। ডাক্তার প্রধান এসে দরজা আগলে দাঁড়ালেন। নিশীথ তার গলার সুর যথাসাধ্য নীচু এবং মোলায়েম ক'রে বলল, "আমায় যেতে দিন।"

"না।"

"এক ফোঁটা—মাত্র এক ফোঁটা চরণামৃত দিদিমণির মুখে দেব। এর পরে আর সময় পাওয়া যাবে না, ডাক্তার সাহেব।"

ডাক্তার প্রধান বললেন, "উনি এসব বিশ্বাস করেন না। তা ছাড়া, রোগীর অবস্থা খুব খারাপ। জলটা যে তাঁর মুখে দিতে চাও, গরম করেছিলে জল? করলেও আমরা তো কেউ দেখি নি। নিশীথ, রোগীর জীবন নিয়ে খেলা করবার সময় এখন নয়।"

ডাক্তার প্রধানের পাশ কাটিয়ে নিশীথ বলল, "আপনি বুঝতে পারবেন না, ডাক্তার সাহেব। এ যে ঠাকুরের আশীর্বাদ, এ যে তাঁর চরণ-ধোয়া জল। আমায় রাস্তা দিন—"

রাস্তা দিলেন না ডাক্তার প্রধান।

জয়া বসু এবার সত্যি সত্যি চেতনা হারাতে লাগলেন। ইশারা ক'রে তিনি ডাক্তার প্রধানকে কাছে ডাকলেন। বললেন, "আপনার ফী দেওয়া হয় নি। ওই সুটকেসটার মধ্যে টাকা আছে। অনেক টাকা। 'আমি' ছাড়া এত টাকা কেউ আপনাকে দিতে পারত না। ভবিষ্যতেও পারবে না।"

নিশীথ এবার ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। দ্রুতপায়ে হেঁটে এসে

পৌঁছে গেল বিছানার কাছে। ডাক্তার প্রধান নিশীথের পথ আগলে দাঁড়াবার চেষ্টা করলেন। পারলেন না। ফাদার হেনরী দুজনের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়ে বললেন, "ডক্টর, নিশীথকে যেতে দাও।"

"কিন্তু ফাদার, মিস বোসের চেতনা এখন অত্যন্ত ক্ষীণ। তাঁর পূর্বমতের পরিবর্তন হয়েছে কি না আমরা কেউ তা জানি না।"

"আমরা জানি না বটে, কিন্তু নিশীথ জানে।"

"ফাদার, আমি তবু বলছি, মিস বোসের ওপরে আমরা জবরদস্তি করছি। তিনি প্রতিবাদ করতে পারছেন না। তাঁর একটুও যদি ক্ষমতা থাকত, তিনি কিছুতেই তাঁর মুখে গেলাসের জল ঢালতে দিতেন না। ফাদার—"

"পরীক্ষা ক'রে দেখাই যাক না, ডক্টর।"—এই ব'লে ফাদার হেনরী নিশীথকে জয়া বসুর পাশে দাঁড় করিয়ে দিলেন। মুহূর্তের জন্যে চোখ খুললেন জয়া বসু। মনে হ'ল, ঠোঁট দুটো তাঁর একটু ন'ড়ে উঠল। জিবের আগাটা বেরিয়েও এল বাইরের দিকে। গেলাসটা কাত ক'রে নিশীথ তিন-চার ফোঁটা চরণামৃত ঢেলে দিল তাঁর জিবের ওপরে। জয়া বসু বললেন, "বড্ড তেষ্টা পেয়েছিল রে, নিশীথ।"

তার পর আর তিনি কথা বললেন না।

ফাদার হেনরী এসে দাঁড়ালেন বাইরের বারান্দায়। পাহাড়ের তলা থেকে কুয়াশা উঠে আসছে ওপর দিকে। তিনি দেখলেন, অমিতাভ সেন ক্রাচে ভর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে নেমে যাচ্ছে নীচে। ভবতোষ আর রত্নাও ওপরে উঠে আসছিল ওই পথ দিয়েই। ফাদার হেনরী দেখলেন, অমিতাভ কারও সঙ্গেই কথা বলল না। তারপর আর কিছুই দেখলেন না তিনি।

চারদিকে ঘন কুয়াশা।